দরদী শরৎচন্দ্র

দরদী শরৎচন্দ্র

মণীন্দ্র চক্রবর্তী

বসুধারা প্রকাশনী
৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

ভূমিকা

যা থেকে আমরা আনন্দ পাই তার একটা সঠিক মূর্তি জানবার জন্যে আমাদের আগ্রহ হয়, তাই লেখা ছাড়া লেখকের জীবনীও পাঠকের অনুসন্ধিৎসার বিষয় হয়ে ওঠে। লেখক যদি নিজেই নিজের কথা লিখে রেখে জানান, তাহলে সবদিক থেকেই ব্যাপারটি সহজ হয়ে যায়। কিন্তু কম লেখকই এ কাজটি ক'রে থাকেন—শরৎচন্দ্রও এঁদেরই একজন। অবশ্য, আজকের দিনে আর এ কথা বলা চলে না, কারণ, আজ লেখকদের আত্মজীবনীর বন্যায় বাংলা-সাহিত্য প্রায় ভেসে যাবার উপক্রম করেছে।

এমন এক সময় ছিল যখন শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বাংলার সাধারণ পাঠকশ্রেণীর কোন ধারণা ছিল না। এর প্রধান কারণ, বাংলা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আকস্মিক আবির্ভাব। কোন প্রস্তুতি নেই, কোন সঙ্কেত নেই, একেবারে 'এ লেখা রবীন্দ্রনাথের না হয়ে যায় না' ব'লে যে বিভ্রম তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, তার হদিস যে কি, তা বাঙালী পাঠকের প্রথমটা জানবার সুযেগে হয়নি।...একদিন এর কিছুটা নিরসন হ'ল।

এ ব্যাপারে আর একটি বস্তু যা প্রধান অন্তরায় হয়েছে, তা হচ্ছে তাঁর স্বভাব। একান্তভাবে তিনি আত্মপ্রচারের বিরোধী ছিলেন—এমন কি বলা যায়, আত্মগোপন করাই ছিল তাঁর স্বভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই মনে হয়, শেক্সপীয়রের জীবনের যেমন একটি বৃহৎ অংশ তাঁর জীবনীকারদের জ্ঞানের বাইরে থেকে গেছে, শরৎচন্দ্রের জীবনীকারদেরও এই অভাব চিরদিন অনুভব করতে হবে।

আজ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যা আমরা মোটামুটি জানতে পেরেছি তা হচ্ছে—তাঁর দেবানন্দপুরের জীবন, ভাগলপুরের জীবন, মজঃফরপুরের জীবন, ব্রহ্মবাসের জীবন, কলিকাতার জীবন ও সামতাবেড়ের জীবন। কিন্তু এদের বাইরে তাঁর যে বিরাট ভবঘুরে জীবন—যাকে বলা যায় তাঁর স্বাভাবিক জীবন, যা শিল্পীর জীবন, এখনও পর্যন্ত তার কোন হদিস আমরা পাইনি। শরৎচন্দ্র নিজে যে কোনদিন কারুর সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন তা আমার মনে হয় না।

এ কাজ শুধু তাঁরাই পারেন যাঁরা ঘটনাচক্রে এই জীবনের সাক্ষী থেকে গেছেন—কিন্তু তাঁরা কে, বা কোথায়—কে তার সংবাদ জানে! জন্‌সনের ভাগ্য ভালো ছিল, তাই তিনি বস্‌ওয়েল-কে পেয়েছিলেন। ভাবি, শরৎচন্দ্রেরও যদি একজন বস্‌ওয়েল থাকতেন!

বর্তমানে একটা সুরাহা হয়েছে এই যে—নানা সূত্রে, নানা আলোচনা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের একটা খসড়া চিত্র আমরা পেয়েছি, এবং কতকগুলি জীবনী-গ্রন্থও এই মাল-মশলাগুলির উপর ভিত্তি ক'রে প্রকাশিত হয়েছে। মণীন্দ্র চক্রবর্তী লিখিত এই গ্রন্থখানিকে শরৎচন্দ্রের জীবনী-গ্রন্থগুলির মধ্যে সাম্প্রতিক স্থান দেওয়া যায়। এই গ্রন্থখানির প্রধান গুণ হচ্চে, এর ঘটনা-সংস্থাপন। শরৎচন্দ্রের জীবনের ঘটনাগুলি একসূত্রে গ্রথিত করতে তিনি যে ঘটনাগুলিকে বেছে নিয়েছেন, একদিকে সেগুলি যেমন কোন বিতর্কের অবকাশ রাখে না, তেমনি তাদের এমনি একটি পারম্পর্য রক্ষিত হয়েছে যা শরৎচন্দ্রের জীবনের ক্রমবিকাশে বিশেষ সহায়তা করেছে। এর উপর লেখকের ভাষার সরসতা ও প্রকাশের সাবলীলতা গ্রন্থখানিকে পরম সুখপাঠ্য উপন্যাসের মতোই উপভোগ্য করেছে। জীবনীও যে রস-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে, 'দরদী শরৎচন্দ্র' প'ড়ে এমন মন্তব্য করা অসঙ্গত হবে ব'লে মনে হয় না।

কিন্তু গ্রন্থে উল্লিখিত দুটি বস্তু সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে। একটি হচ্ছে, হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিবাহ; আর একটি হচ্ছে, শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর প্রথম যৌবনের রচনা 'শুভদা' উপন্যাস।

হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিবাহ ব্যাপারটি গ্রন্থে যে-ভাবে উল্লিখিত হয়েছে, তাতে দোষ কিছু নেই। কিন্তু তবুও এ ব্যাপারটির মধ্যে কোথায় যেন একটা ফাঁক ছিল, এমনি একটা মনোভাব তাঁদের মধ্যে স্থান না পেলে, পরবর্তী কালে (শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে) সামতাবেড়েয় বৈষ্ণবমতে তাঁরা কণ্ঠীবদল ক'রে নূতন ক'রে বিবাহের বিধি পালন করতেন না। এ সম্বন্ধে শরৎ-চন্দ্রের নিজের মুখে সবিস্তারে যা শুনেছি তা বলার কোন প্রয়োজন মনে করি না ব'লেই শুধু ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করলুম।

আর 'শুভদা' সম্পর্কে আমার সঙ্গে তাঁর যে নাটকীয় ঘটনা ঘটেছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ না দিয়ে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, 'শুভদা'র পাণ্ডুলিপি শোনবার জন্যে আমার পীড়াপীড়িতে তিনি শেষ পর্যন্ত আমাকে পড়তে দিতে রাজী হয়ে আমাকে সামতাবেড়ে যাবার জন্যে একটি দিন নির্দেশ ক'রে দেন। নির্দিষ্ট দিনে আমি যখন উপস্থিত হলুম, তখন তিনি অতি বিমর্ষভাবে বললেন, অবিনাশ, সব শেষ হয়ে গেছে! তিনি এমনিভাবে কথাগুলি বললেন যেন আমি তাঁর কোন রুগ্ন পুত্রকে দেখতে গেছি, যার মৃত্যু-সংবাদটা তিনি আমাকে শোনালেন। এই ব'লেই তিনি পাশের ঘর থেকে একটা বিস্কুটের টিনে খানিকটা কাগজ-পোড়া এনে আমাকে বললেন, পাছে তুমি অবিশ্বাস কর, তাই 'শুভদা'র পাণ্ডুলিপির পোড়ার ছাই তোমার জন্যে রেখে দিয়েছি। এর পর আমার আর কি বলবার থাকতে পারে! কিন্তু এই ব্যাপারটি যে মিথ্যা তা এখন বেশ বোঝা গেছে। কিন্তু প্রশ্ন এই, কেন 'শুভদা' তিনি তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশ করেননি, আর কেনই বা এ পাণ্ডুলিপি তিনি কারুকে পড়তে দিতে চাননি? তাঁর নিজের মুখেই শুনেছি হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের (গুরুদাস কোং) শত অনুরোধেও তিনি এ পাণ্ডুলিপি তাঁকে দেখাননি। কেন? কিসের জন্যে 'শুভদা' সম্পর্কে তাঁর এ মনোভাব ছিল?—শরৎচন্দ্রের ভবিষৎ জীবনীকারদের নিকট থেকে এ প্রশ্নের উত্তরের আশায় রইলুম।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল

আমার কথা

শরৎচন্দ্রের জীবন বহু রহস্যজালে আবৃত ব'লেই হয়তো তাঁর সঠিক জীবনীগ্রন্থ অদ্যাবধি রচিত হয়নি। যে ক'খানা প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলিও তথ্যমূলক কিনা সন্দেহ।

আমার এই 'দরদী শরৎচন্দ্র'ও সম্পূর্ণ জীবনকাহিনী নয়; শরৎচন্দ্রের জীবনের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে যা রূপায়িত হলো, তার সত্যতা বিচারের ভার সহৃদয় সমালোচক ও পাঠকদের ওপর।

১৯৫০ সালের গোড়ার দিকের কথা। স্বর্গীয় সাহিত্যিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন 'শরৎ-পরিচয়' নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থের রচনা সুরু করেছেন। সেই সময়ে আমি তাঁকে শরৎচন্দ্রের একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ রচনা করা যায় কিনা জিজ্ঞেস করি। তদুত্তরে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি যে-সব মন্তব্য করেছিলেন তা মনঃপূত না হওয়ায়, নিজেই আমি সে-চেষ্টায় অবতীর্ণ হই। অবশ্য তাঁর ভাসা-ভাসা কিছু নির্দেশ যে এই গ্রন্থ-রচনার প্রথম প্রেরণা দান করেছিল, তা আজ অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছি। অতঃপর গ্রন্থাদি সংগ্রহ করি এবং শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি সংগ্রহ করবার চেষ্টা করি। দীর্ঘদিনের চেষ্টায় এবং সর্বোপরি বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়িবর্গের উৎসাহ-দানে আজ তা সমাপ্ত এবং প্রকাশিতব্য বলে বিবেচিত।

'বসুধারা প্রকাশনী'র পক্ষে শ্রীজয়ন্ত বসু ও তাঁর পিতা শ্রদ্ধেয় শ্রীত্রিদিবেশ বসু মহাশয়দ্বয় 'দরদী শরৎচন্দ্র' প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমার মতো নবীন ও অখ্যাত লেখককে সত্যই উৎসাহিত করলেন। তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গ্রন্থ-রচনায় এবং তথ্যাদি সংগ্রহে যাঁরা আমাকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের কাছেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। এই প্রসঙ্গে—হিরণ্ময়ী দেবী

(শরৎচন্দ্রের সহধর্মিণী), অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল (শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের অন্যতম বন্ধু), স্বর্গীয় হরিদাস চট্টোপাধ্যায় (গুরুদাস অ্যাণ্ড সন্স-এর স্বত্বাধিকারী), সুহাসিনী দেবী (শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর মেজো জা), রাণুবালা দেবী (অনিলা দেবীর মেজো দেওর-ঝি), শরৎচন্দ্রের বাজে-শিবপুরের সঙ্গী ও বন্ধু অনুরূপ চট্টোপাধ্যায়, রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গী শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, সম্পর্কীয় মাতুল মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র সৌম্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র রবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সম্পর্কীয় ভাগিনেয় রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র অমলকুমার চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সনৎকুমার গুপ্ত ও বন্ধুবর সুসাহিত্যিক অধ্যাপক বিশ্বেশ্বর নন্দী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

শরৎচন্দ্রের অন্যতম বন্ধু শ্রদ্ধেয় শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় আমার এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ প্রদর্শন করেছেন।

সর্বশেষে, যে-সব পুস্তক ও সাময়িকপত্রের সাহায্য নিয়েছি, সে-সবের রচয়িতা ও সম্পাদকগণকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

কলিকাতা | বিনীত
২৭শে কার্তিক, ১৩৬৫ | গ্রন্থকার

স্বর্গতা মা'কে—

শরৎচন্দ্র

মা ডাকলেন ছেলেকে। সাড়া না পেয়ে এবার ডাকলেন আদরের সুরে—ন্যাড়া, ও ন্যাড়া, খাবি আয় বাবা! তবুও ছেলের সাড়া পেলেন না মা। এবার বিরক্তি প্রকাশ করেই ন্যাড়ার মাকে রান্নাঘর ছেড়ে নিজের ঘরে আসতে হলো। না, এ-ঘরে নেই তো! তবে গেল কোথায়? জানলা দিয়ে গোয়ালঘরের দিকে একবার তাকালেন। তারপর সোজা তাঁর চোখের দৃষ্টিটুকু যতদূর যায়।... ছেলে এই দুপুরে গেল কোথায়? চিন্তা হবারই কথা। এইতো একটু আগেই সে ছিল। ক্ষুন্ন মনেই ন্যাড়ার মাকে এবার আসতে হলো স্বামীর নির্জন ঘরটিতে। স্বামী যে তাঁর কেমন তিনি খুবই জানতেন। রেগে তাই বললেন—হ্যাঁগা, নিজে তো বেশ খেয়েদেয়ে এখন ঐ ছাইপাঁশ নভেলগুলো পড়ছো! আর ওদিকে ছেলেটা না খেয়ে পাড়ায় টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেদিকে কি খেয়াল আছে?

মুখ থেকে বইখানা সরিয়ে নিয়ে চিন্তিত মুখেই বলে ওঠেন ন্যাড়ার বাবা—সে কি গো! ন্যাড়া এখনো বাড়ী ফেরেনি?

—না গো, না। বাড়ী ফেরবার ছেলে তোমার? ও হতভাগা খালি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে। বলি, একটু শাসন পর্যন্ত করবে না, তা ছেলে অমন বাউণ্ডুলে হবে না তো কি? যাও, উঠে দেখে এসো।

ন্যাড়ার বাবা এবার বিছানা ছেড়ে উঠে হাসিমুখে বললেন—যাবে আর কোথায় ভুবন! দেখ, ও হয়তো ঐ রায়েদের আম-বাগানে ফড়িং ধরছে। বৃষ্টির জলে ভিজে হতভাগা একটা অসুখ না বাধিয়ে বসে।— ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন ন্যাড়ার বাবা।

সত্যি-সত্যিই তাই। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে থেমে গেছে। মেঘের দল আকাশে আর দেখা যায় না। এমন সময় ন্যাড়াকে রায়েদের আমবাগানে ভিজে গাছপালার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। হাতে তার ছোট্ট একটি কাঠের বাক্সো। দুষ্টু ন্যাড়া সত্যি-সত্যিই একটা সুন্দর ফড়িং ধরে ফেলে। কিন্তু একটা পাখা যায় তার ভেঙে। মন খারাপ হয়ে যায় ন্যাড়ার। একটা অসহায় জীবকে সে মেরে ফেললো! অথচ বাঁচাবার সে কোন পথ খুঁজে পায় না। এমনিভাবে কিছুক্ষণ কেটে যায়। এমন সময় একটু দূর থেকে কে যেন তার নাম ধরে ডেকে ওঠে—ন্যাড়া, ও ন্যাড়া! …একটু পরেই সে দেখতে পায় তার বাবাকে। কিছু বলতেও পারে না। শুধু অসহায় করুণ মুখখানি বাবার দিকে তুলে ধরে। ন্যাড়ার বেদনাক্লিষ্ট মুখখানির দিকে তাকিয়ে বাবা একটু অবাক হয়ে গেলেন। কাছে এসে বললেন—কি হয়েছে রে তোর? চোখে জল কেন?

ন্যাড়ার মুখে কোন কথা নেই। শুধু হাতটা বাড়িয়ে দেয় তার বাবার দিকে। বাবা এইবার সব লক্ষ্য করে মৃদু হেসে বলে উঠলেন—ও, ফড়িং ধরেছিস বুঝি?

তবুও ন্যাড়ার মুখ দিয়ে কথা সরে না। ছেলের যে কী দুখ্যু, বাবা এবার বুঝলেন। তাই ছেলের হাত থেকে ফড়িংটা তুলে নিয়ে মাটির উপর রেখে বললেন—ও আপনা থেকেই সেরে যাবে। বাড়ী চল্।

—না, যাবো না। আগে বল, ও ঠিক সেরে যাবে?

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ। কাল সকালে এসে দেখবি, ও আর এখানে নেই। আয়—

এতক্ষণ পরে পিতার কথায় ন্যাড়ার বিশ্বাস হয়। ও তাই বাবার

সঙ্গেই বাড়ী ফিরে চলে। পথ চলতে চলতে হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ে একটু। একবার সে তাকিয়ে নেয় মৃত ফড়িংটার দিকে।

দেখতে পেয়ে বাবা বলে উঠলেন—আবার কি হলো রে?

ন্যাড়ার কাজল-কালো চক্ষু দুটি থেকে একরাশ নোনা জল ঝরে পড়ে। কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলে—আমি একটাও ফড়িং বাক্সে রাখবো না। সব উড়িয়ে দেবো।

যেমন কথা তেমনি কাজ। তার কতদিনের এমনি পরিশ্রমে ধরা ফড়িংগুলো কাঠের বাক্সোটা খুলে সব উড়িয়ে দিল। ছেলের এমন দরদী মন দেখে সস্নেহে কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখের জলটুকু মুছিয়ে দিয়ে বাবা বললেন—বোকা ছেলে, সামান্য একটা ফড়িঙের জন্যে কি কাঁদতে আছে রে? আয়, বাড়ী আয়।

সেদিনের সেই দুষ্টু ছেলেটি হলো আমাদের দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১২৮৩ সালের (১৮৭৬ খ্রীঃ) ৩১শে ভাদ্র হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়। এ গ্রামের ঐতিহাসিক একটি খ্যাতিও আছে। ভারতচন্দ্র দেবানন্দপুর সম্বন্ধে বলেছেন—

"দেবের আনন্দ ধাম দেবানন্দপুর গ্রাম
তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুনসী।
ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায়
হয়ে মোর কৃপাদায় পড়াইল পারসী॥"

এই গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-গৃহে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় (ওরফে নাটু) হালিশহরের বিখ্যাত গাঙ্গুলী পরিবারের কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যমা কন্যা

ভুবনমোহিনী দেবীকে বিবাহ করেন। (কার্যোপলক্ষে গাঙ্গুলী পরিবারকে ভাগলপুরে স্থায়ী বসবাস করতে হয়।) দরিদ্রের সন্তান মতিলাল। তখনকার নিয়মানুযায়ী তাঁর বাল্যেই বিবাহ হয়, শ্বশুর-বাড়ীতে থেকে ভাগলপুরের স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাস করেন। তিনি একাধারে ছিলেন শিল্পী এবং সুলেখক। ভাগ্যবিড়ম্বনায় সামান্য এক সেরেস্তায় কাজ করলেও, গল্প কবিতা লিখতে তাঁর মন সব সময় উন্মুখ হয়ে থাকতো; অথচ অভাবের সংসারে বাস করে তিনি কোন কিছুই লিখে শেষ করে যেতে পারেননি।

শরৎচন্দ্র নিজের মুখে তাঁর পিতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—"আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোটগল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক,—এককথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনোটাই শেষ করতে পারেননি।"

এই দারিদ্র্যের জন্যই শরৎচন্দ্রের পিতার শিল্পী-জীবন বিকশিত হয়নি। সংসার তাঁর বড়ই ছিল। মা, স্ত্রী, চারিটি ছেলেমেয়ে এবং নিজে। তা ছাড়া গৃহপালিত পশুর মধ্যে দুটি গরু। সামান্য আয়ে সংসার চালাতে গিয়ে মতিলালকে অনেক সময় কর্জ করতে হতো। যার জন্য প্রতিবেশীরা তাঁকে অনেক কথাই শোনাতেন। বংশের প্রথম ছেলে হিসেবে শরৎচন্দ্র যেমন ঠাকুরমার স্নেহ পেতেন, তেমনি পেতেন মা-বাবার কাছেও। তা ছাড়া মতিলালবাবু জানতেন তাঁর ছেলের স্বভাব কেমন; স্বভাব বলতে তিনি বুঝতেন ন্যাড়া বড় অভিমানী। কেউ যদি ভৎর্সনা করে, ন্যাড়ার চোখের জলের হিসেব থাকতো না। সেই জন্যেই ছেলের মন বুঝতে চাইতেন মতিলাল। যে ছেলের ঘরের মধ্যেই ঠাঁই হয় সারাদিনের পর—কোথায় কোন্ নদীর ধারে ডিঙি বাওয়া, কার আমবাগানে আম চুরি,—এই সব অভিযোগ মতিলাল

প্রায়ই শুনতেন। অথচ ছেলের গায়ে হাত তুলতে তাঁর সাহস হতো না। কখনো ভুলিয়ে ছেলেকে নিজের ঘরে টেনে এনে কাগজের নৌকো আর লাটাই-ঘুড়ি তৈরি করে শান্ত করতে চেষ্টা করতেন। বালক শরৎচন্দ্র পিতার এই নিত্য নূতন নানা খেলনা তৈরির দিকে আকৃষ্ট হতো। সেদিন আর বাড়ী পালানোর ইচ্ছা বালক শরৎচন্দ্রের মনেই হতো না। এমনি করেই দিন চলে। অথচ বালক শরৎচন্দ্রের লেখাপড়ার কোন নামগন্ধই পাওয়া যায় না। এইতো সেদিন মতিলাল গ্রামের পিয়ারী পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি করে দিয়ে এলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের পাঠশালায় না যাবার হেতুটা কী, মতিলাল ঠিক বুঝতে পারেন না। অথচ স্ত্রী ভুবনমোহিনীর অনেক বাক্য-যন্ত্রণা শুনতে হতো। ভালমানুষ মতিলাল তবুও কিছু বলতে পারতেন না। শুধু বালক শরৎকে ডেকে বুঝিয়ে বলতেন—ন্যাড়া, পাঠশালায় যাস না কেন?

বালক শরৎচন্দ্র একরাশ মাথার চুল ঝেঁকে নিয়ে বলে—ভাল লাগে না যে।

মতিলাল কোন ভর্ৎসনা না করে শান্ত সুরেই বলতেন—না পড়লে বড় হবি কি করে?

—পড়লে বুঝি বড় হওয়া যায়?

—হ্যাঁ রে, হ্যাঁ।

ভুবনমোহিনীর কানে এসব কথা যেত না, তা নয়। তাঁর মন যখন নিজের সংসার থেকে সেই ভাগলপুরের দিকে বাপের বাড়ীতে গিয়ে পড়তো তখন তিনি দেখতে পেতেন, সেখানে ছেলেমেয়েদের কেমন নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে রাখা হয়। তারা কেমন বই পড়ে। নিয়মিত স্কুলে যায়। আর এই ন্যাড়া, বংশের বড় ছেলে। তার উপর ভবিষ্যতে

সংসারের ভার। শরৎ বড় হোক, পাঁচজনের মতো হয়ে বংশের সে মুখ উজ্জ্বল করুক। এমনি কথা ভাবতে ভাবতে ভুবনমোহিনীর চোখে জল ভরে আসতো অনেক সময়।

অথচ যেদিন বালক শরৎচন্দ্র পিয়ারী পণ্ডিতের (পিয়ারী বন্দ্যোপাধ্যায়) পাঠশালায় যেত সেদিন একটা না একটা কাণ্ড বাধিয়ে তবে বাড়ী ফিরতো। পিয়ারী পণ্ডিতের ছেলে কাশীনাথ তার সমবয়সী বন্ধু। দুজনায় খুব ভাব ছিল। অথচ ন্যাড়া এখানে 'সর্দার পোড়ো' নামে অভিহিত। সেইজন্যই সকলেই শরৎচন্দ্রকে ভয় করতো। শুধু কি তাই? পিয়ারী পণ্ডিতের চোখে কি করে ধুলো দিয়ে পাঠশালা ফাঁকি দিতে হয় বালক শরৎচন্দ্র তা জানতো। আর এই পাঠশালায় তার সাথী হলো একটি মেয়ে। নাম তার পারু। শরৎচন্দ্রকে খুবই সে ভালবাসতো। আর শরৎচন্দ্রও ভালবাসতো এই পারুকে।

একদিনের ঘটনা। নিত্য নূতন ঘটনা থেকে এ একটু আলাদা ধরনের। সেদিন পাঠশালায় নূতন একটি ছেলে ভর্তি হয়েছে। ছেলেটি বেশ বড়লোকের ছেলে। তার নূতন বই শ্লেট দেখে বালক শরৎচন্দ্র দুষ্টুবুদ্ধি নিয়ে তার কাছে গিয়ে বসলো। সে পাঠশালায় একেবারে নতুন। হঠাৎ বালক শরৎচন্দ্র তন্দ্রাচ্ছন্ন পিয়ারী পণ্ডিতের দিকে একপলক দৃষ্টি মেলেই নূতন ছেলেটিকে বলে —বাঃ, বেশ নতুন বই। শ্লেটটা দেখতেও তেমনি। লিখতে পারিস?

ছেলেটির লেখায় হাত পাকা ছিল না। বললে—না, ভাল লিখতে জানি না।

—তবে দে, তোর লেখা লিখে দিই— ব'লেই বালক শরৎচন্দ্র সেই শ্লেটটির উপর কাঠ-খড়ি দিয়ে লিখে দিলে—"তুই একটা গাধা"। তারপর মুচকি হেসে ছেলেটির কাছ থেকে উঠে এসে নিজের জায়গায়

বসে নামতা মুখস্থ করতে লাগলো। পাঠশালায় এতক্ষণ চাপা হাসি ছিল, হ্যাড়া সর্দারের এই কীর্তি দেখে পাঠশালার সমস্ত পড়ুয়া হেসে ফেললো খিলখিল করে।

পারু বলে শরৎচন্দ্রকে—তুই বড় দুষ্টু, হ্যাড়া।

—তোর আমি কি করেছি যে দুষ্টু হলুম ?

—দেখছিস না ছেলেটা কেমন বোকার মতো দাগ টানছে। পারু আঙুল নির্দেশ করে বললে। বালক শরৎচন্দ্র আড়ে আড়ে তাকিয়ে বললে—পারু, একটা মজা করি। খবরদার বলরি না। ব'লে এমন একটা হাঁচি হাঁচলো যার ফলে পিয়ারী পণ্ডিতের তন্দ্রা গেল ভেঙে। গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন—কে হাঁচলো ? আর এতো হাঁচি কিসের ? কৈ রে, তোরা সব চুপ করে রইলি যে ? বল্ কে হেঁচেছে ?

পাঠশালার সমস্ত পড়ুয়াদের মুখে কোন কথা নেই। বেশ গম্ভীরভাবে পিয়ারী পণ্ডিত ডাকলেন—হ্যাড়া !

বালক শরৎচন্দ্র এতক্ষণ মাথা নিচু করে যেন নামতা মুখস্থ করছিল এমনি ভাবে বসে ছিল। বেগতিক দেখে পারুকে চুপি চুপি সমস্ত দোষ সেই নূতন ছেলেটির ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে বললে। পারু কিন্তু কিছুই বললে না। পিয়ারী পণ্ডিত দুষ্টু হ্যাড়ার মৌনভাব দেখে হাঁক দিয়ে উঠলেন—কৈ রে, শুনতে পাসনে ? এদিকে আয় হতভাগা !

বালক শরৎচন্দ্র পালাবার পথ না পেয়ে চুপটি করে পিয়ারী পণ্ডিতের কাছে এসে দাঁড়ালো।

পিয়ারী পণ্ডিত লকলকে বেতটা উঁচিয়ে বলে উঠলেন—কে হেঁচেছে বল্ ?

—জানি না, গুরুমশাই। আপনার পা ছুঁয়ে বলছি আমি হাঁচিনি।

—বটে ! তুই হাঁচিসনি ! আচ্ছা যা আঁক কষগে। পিয়ারী পণ্ডিত কথাটা বলে এবার নূতন ছেলেটিকে ডাকলেন—এই, এদিকে আয়। কী ছাঁদের আঁক কচ্ছিস দেখি।

ছেলেটি কাছে এলে পিয়ারী পণ্ডিত শ্লেটটি হাতে নিয়েই রেগে আগুন। চীৎকার করে বলে উঠলেন—দিনে দিনে হলো কি ? বলি, হ্যাঁ রে ছুঁচোমুখো—"তুই একটা গাধা" তার মানে কি রে উল্লুক ? কেন লিখেছিস জবাব দে।

ছেলেটি ভয়ে কাঁপতে থাকে। মাঝে মাঝে তার দৃষ্টি বালক শরৎচন্দ্রের দিকে।

পিয়ারী পণ্ডিত এবার বলে উঠলেন—বলি, ন্যাড়ার দিকে তাকাস কেন রে ? ওর দলে মিশেছিস বুঝি ?

ছেলেটি কোন জবাব দেয় না। কান মুলে দিলে ছেলেটি কেঁদে ফেললো। পারু এতক্ষণ সবই লক্ষ্য করছিল। অসহায় ছেলেটির দিকে তাকিয়ে থাকতে সে পারে না। বলে দিল সব কথা—গুরুমশাই, ও ন্যাড়ার কাজ।

কথাটা শোনামাত্রই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন পিয়ারী পণ্ডিত। লকলকে বেতটা নিয়ে যখন ন্যাড়ার দিকে আসবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন—ন্যাড়া সেই ফাঁকে একলাফে পাঠশালার বাইরে এসে ছুট দিয়ে রায়েদের সেই নির্জন আমবাগানে আশ্রয় নিলো। শরৎচন্দ্র জানে পারু এই আমবাগানেই আসবে। তখন সে শোধ নেবে এই বলে-দেওয়া অপরাধের জন্যে। নিজের মনেই ছুরি দিয়ে ছিপ তৈরি করতে সে বসে রায়েদের আমবাগানে বাঁশের বাঁখারি ভেঙে। সুন্দর সুন্দর বেড়া শরৎচন্দ্রের কাছে একের পর এক ছিপ তৈরি হতে চলেছে। মোটা আমগাছটার আড়ালে

এই ছিপ ছোলার আয়োজন চলে। ছিপ তৈরি করতে-করতে ভাবছিল শরৎচন্দ্র। ভাবছিল পোড়ারমুখী পারুর কথা। এমন অবাধ্য মেয়েকে সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না! অথচ বেলা গড়িয়ে চলে। পাঠশালার ছুটির ঘণ্টা একটু আগেই তার কানে এসেছে। তবুও পারুর সাক্ষাৎ নেই।

পড়ন্ত রোদটা তখন সরে গেছে। দূর থেকে এমনি সময় শুকনো পাতা মাড়ানোর শব্দ বালক শরৎচন্দ্রের কানে ভেসে আসে। দেখতে পায় পারুকে। অভিমান করে বসে থাকে বালক শরৎচন্দ্র। পারু বুঝতে পারে দুষ্টু ন্যাড়ার মনের ভাব। বাড়ী থেকে চুরি করে আনা আমের আচার দেখিয়ে ফিক্ করে হেসে বলে—ন্যাড়া, তুই তাহলে খাবি না?

বালক শরৎচন্দ্র কোন জবাব দেয় না।

—না খাস তো বয়েই গেল— ব'লে আপন মনেই পারু আচার খেতে শুরু করে।

তারপর একটু ঘুরে ফিরে ঠিক কাছে এসেই বলে—গুরুমশাই কি বলেছেন জানিস ন্যাড়া?

—কি বলেছে রে পারু? শরৎচন্দ্রের বুকটা এবার চমক খেয়ে ওঠে।

—বলেছেন—কাল পাঠশালায় গেলে আর আস্ত রাখবেন না। পারু ফিক্ করে হেসে বললে।

কথাটা শোনামাত্রই বালক শরৎচন্দ্র রাগে ক্ষোভে উঠে দাঁড়ায় ছিপ হাতে নিয়ে। চীৎকার করে বলে ওঠে—কেন তুই বলে দিলি? জবাব দে পারু!

সঙ্গে সঙ্গেই পারু জবাব দেয়—বা রে, তুই কেন নতুন ছেলেটিকে মার খাওয়ালি?

—বেশ করেছি।

—বেশ করেছি। একশো বার বলে দেব।

অবাধ্য পারুর কথা শোনামাত্রই বালক শরৎচন্দ্র পারুর পিঠের উপর ছিপের কয়েক ঘা বসিয়ে দেয়। সব আঘাতের একটা সীমা আছে। কিন্তু আজকের এই আঘাত পারুর চোখে এনে দিল অজস্র অশ্রুধারা। অশ্রু-বিজড়িত কণ্ঠে বলে ওঠে—ন্যাড়া, তুই আমায় মারলি!

বালক শরৎচন্দ্র অন্তরে তীব্র একটা ব্যথা অনুভব করে। শান্ত সুরে বলে—পারু, আমার সঙ্গে আর মিশিস্ না। জানিস তো আমি কতো দুষ্টু! বাড়ী যা।

—না, যাবো না।

বালক শরৎচন্দ্র মৃদু হেসে বলে—সন্ধ্যে হয়ে এলো যে।

—হোক।

—হোক কি রে! বাড়ীর কাউকে ভয় করিস না?

—মোটেই না।

—আমাকে।

—না—না—না। পারু কঠিন সুরে বলে উঠলো।

হো-হো করে বালক শরৎচন্দ্র হাসে। পারুও হাসে। দুজনার এই মিলন, কত কথা—কত আঘাত দেওয়া। অথচ সত্যি-সত্যিই পারু শরৎচন্দ্রকে মোটেই ভয় করতো না।

দেবানন্দপুরে রায়েদের আমবাগান আজও দেখতে পাওয়া যায়। অতীতের সেই আম্রকুঞ্জ একটি ডানপিটে ছেলে আর একটি মেয়ের স্মৃতি নিয়ে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরে এসে বালক শরৎচন্দ্রকে কখনো বই

নিয়ে পড়তে দেখা যেত না। মা ভর্ৎসনা করলে অভিমান করে ঘর ছাড়ে। তারপর কত রাত্রিতে আবার ঘরে ফেরে। সেইজন্য ভুবনমোহিনী বড় একটা কিছু বলতেন না। শুধু ঠাকুরমার কাছে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শুনতে তার ভাল লাগতো। কোনদিন পিতা অধিক রাত্রে যখন বাড়ী ফিরতেন তখন তাঁর লেখার ঘরে এসে বালক শরৎচন্দ্র পিতার পাশে এসে বসতো। আশ্চর্য হয়ে যেত পিতার সুন্দর সুন্দর হাতের লেখা দেখে। ভালও লাগতো বাবার এই সঙ্গ। মতিলালের ছেলের প্রতি দৃষ্টি পড়তো না যে তা নয়। তিনি অনেকদিন শরতের নানা প্রশ্ন শুনেছেন, কিন্তু জবাব দিয়েছেন অন্য সুরে। সেদিন একখানি মোটা খাতা উল্টিয়ে বাবাকে সে বললে —এটা কি বাবা ?

মতিলাল জবাব দেন মৃদু হেসে—লেখার খাতা রে, লেখার খাতা।

—তার মানে কি বাবা ?

—আগে বড় হ' তারপর ওসব বুঝবি।

বালক শরৎচন্দ্র ঘর ছাড়ে না। তেমনি ভাবেই বসে থাকে। মতিলাল এবার একটু রাগ করেই বলে উঠলেন—ন্যাড়া, গুরুমশায়ের পড়া করগে। সময় নষ্ট করতে নেই।

বালক শরৎচন্দ্র সেই যে গোঁ ধরে বসে আছে, মতিলালের সাধ্য কি তাকে বিদায় করে। বিরক্তি বোধ করলেও কিছু বলতে পারতেন না। সেদিন তাঁকে বলতে হয়েছিল—এটা কি জানিস ? নাটক।

—তার মানে কি বাবা ?— অবুঝ এক প্রশ্ন।

মতিলাল হেসে জবাব দেন—যাত্রা-থিয়েটার গ্রামে যখন হয় এই নাটক নিয়েই। যাত্রায় রাজা মন্ত্রী, রাম-রাবণের যুদ্ধ যে সব দেখিস এতে তাই লেখা থাকে।

বালক শরৎচন্দ্র কি বুঝলো সেই জানে। পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার এক প্রশ্ন—তুমি কেন যাত্রা কর না?

মতিলাল হেসেই জবাব দেন—যে লেখে, সে কি যাত্রা করে রে? আচ্ছা এবার যা, আমি লিখি।

এমনি নানা প্রশ্নের জবাব দিতে হতো মতিলালকে। এমনি করেই নিষ্কৃতি পেতেন। অভাবের সংসারের মধ্যে বাস করেও মতিলাল সব সময়েই চিন্তা করতেন শরতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। পাড়া-প্রতিবেশীরা এই ছেলের জন্য তাঁকে কম কথা শোনায় না। এমনি সব চিন্তারাশি তাঁর মনকে সব সময় আচ্ছন্ন করে রাখতো।

বালক শরৎচন্দ্রের নানা দুষ্টুমির মধ্যে মাছধরার বাতিক ছিল সবচেয়ে বেশী। সেই ভোর না হতেই বাড়ীর সমস্ত নিষেধ অগ্রাহ্য করে নদীতে মাছ ধরতে যেত। সেখানে রুই-কাতলার বদলে চুনো-পুঁটি ছোট ছোট মাছ। তাই ধরবার জন্য এমনি প্রবল নেশা ছিল। অথচ বাড়ী ফেরবার পথে বাগানের কচি-কচি শশা পেঁপে পেড়ে-পেড়ে গাছপালা নষ্ট করে দিয়েই তবে বাড়ী ফিরতো।

এমনি এক ঘটনার কথা।

পাড়া-প্রতিবেশী এক বৃদ্ধার সামান্য একটুকরো ফলের বাগান ছিল। এই সামান্য বাগানে চাষবাস করেই তার দিন চলতো। একদিন তার বেড়া ভেঙে বালক শরৎচন্দ্র দলবল নিয়ে ঢুকে সব-কিছুই তছনছ করে বেরিয়ে আসবার মুখেই ধরা পড়ে যায়। বৃদ্ধা শরৎচন্দ্রের মা'র কাছে এসে অভিযোগ জানিয়ে বলে—বৌঠান্, গরীব নাচারের ওপর এমনি অত্যাচার! তোমার ছেলের জ্বালায় তো গাঁয়ে বাস করা যায় না।

ভুবনমোহিনী সবই জানেন। তবু জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কি অনিষ্ট করেছে বাছা?

বৃদ্ধা জবাব দেয় চোখের জল ফেলে—সামান্য একখণ্ড জমি বৌঠান্,—দু-চারটে শশা গাছ পুঁতেছিলুম। ঐ বেচে তবে পেটের ক্ষিধে মেটাতুম। বৌঠান্, তোমার ছেলে একটাও গাছ আস্ত রাখেনি।

ভুবনমোহিনী খুব দুঃখ পেলেন। ছেলের দৌরাত্ম্য দিন দিন যেন বেড়েই চলেছে।

ডাকলেন ছেলেকে—শোরো, এদিকে আয়।

বালক শরৎচন্দ্র হাসিমুখে মা'র কাছটিতে এসে দাঁড়ালে, গম্ভীর স্বরে ভুবনমোহিনী বলে উঠলেন—গরীব নাচারের কেন তুই বাগান নষ্ট করিস্ জবাব দে শোরো?

বালক শরৎচন্দ্র ভয়শূন্য মনে জবাব দেয়—সামান্য দুটো ফল-পাকড় খেলে বুঝি গাছপালা নষ্ট হয়?

—হ্যাঁ, তাই হয়।— ছেলেকে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন ভুবন-মোহিনী। তারপর আঁচল থেকে কিছু পয়সা খুলে বৃদ্ধাটিকে দিয়ে তবে তিনি নিরস্ত হলেন। ছেলে যে কী তা জানতেন বলেই ভুবন-মোহিনীর এত দুখ্যু। তাই সেদিন খুব দুঃখ পেয়েই ছেলেকে কাছে ডেকে চোখের জল ফেলতে-ফেলতে বললেন—শোরো, তুই কি লেখাপড়া শিখবিনে বাবা?

—না। ছোট্ট এমনি এক কথা বালক শরৎচন্দ্রের মুখে।

—অমন কথা কি বলতে আছে রে?

—কেন? বললে কি হয়?

—লোকে যে মুখ্যু বলবে।

—বলুকগে।

ভুবনমোহিনী আর কোন কথাই বললেন না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তাঁকে সংসারের কাজের মধ্যে ভিড়তে হলো। এটা তো সংসার নয়, যেন ধোঁয়ার জগৎ। এ জগৎটি বড় অদ্ভুত। বড় কষ্ট দেয়। ভুবনমোহিনী মর্মে মর্মে তাই বুঝতেন।

সেদিন ছুটির দিন। সাত-সকালে মতিলাল বেরিয়েছিলেন কোন এক নূতন কাজের সন্ধানে। যাতে করে সংসারের আয় বাড়ে এমন একটা কাজ। বালক শরৎচন্দ্র উঠোনের এক কোণে বসে ঘুড়ি তৈরি করছিল। এমন সময় শুনতে পায় পাড়া-প্রতিবেশী নয়ান বাগদীর কণ্ঠস্বর। তার মাকে এসে বলছে—বৌঠান্, পাঁচটা টাকা ধার দাও দিকি। বসন্তপুরে গিয়ে ভাল একটা গাইগরু কিনে আনি। ভুবনমোহিনী একটু বিদ্রূপের সুর কেটে বললেন—হ্যাঁ রে, ও নয়ান, গরু তো কিনে আনবি, তা গরুর দুধ খাওয়াতে ভুলিসনে যেন।

নয়ান বাগদী একগাল হেসে বলে—কি যে বল বৌঠান্, নয়ানকে চিনতি পার না?

এই পাড়া-প্রতিবেশী নয়ান বাগদীকে ভুবনমোহিনী খুবই স্নেহের চোখে দেখতেন। কারণ লোকটার স্বভাব-চরিত্র খুব সুন্দর ছিল। যেমন চেহারা তেমনি লাঠি খেলতে সে জানতো। এদিকে বালক শরৎচন্দ্র শুনেছে বসন্তপুরে ভাল মাছধরার ছিপ পাওয়া যায়। সেই সুযোগে নয়ানদার সঙ্গে গেলে মন্দ হয় না। বালক শরৎচন্দ্র উৎফুল্ল মন নিয়ে নয়ান বাগদীকে বলে—আমি যাবো, নয়ান-দা?

—সে কি দা'ঠাকুর!—তুমি যাবে?

—হ্যাঁ—সত্যি যাবো।

—কি জন্যে যাবে সে কথা আগে বল দিকি?

কিশোর শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান—দেবানন্দপুর ['শিল্পী-সংস্থা'র সৌজন্যে
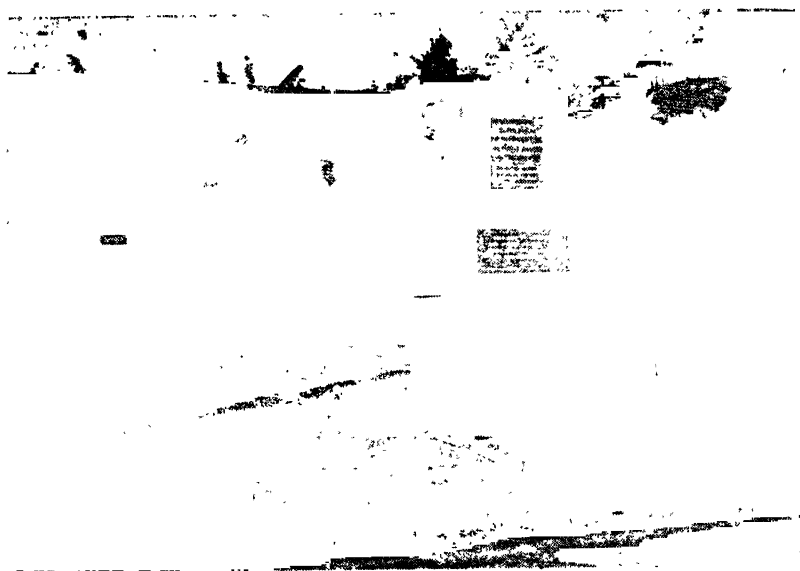
—ছিপ কিনতে।

ভুবনমোহিনী ছেলের কথা শুনে একটু অবাক হয়ে গেলেন। নয়ানকে তাই বলে উঠলেন—ও হতভাগার কথা শুনিসনে নয়ান, তুই যা।

টাকা নিয়ে নয়ানকে চলে যেতে দেখে বালক শরৎচন্দ্র নিঃশব্দে তার সঙ্গ নিল। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে অনেকখানি পথ অতিক্রম করবার পর পিছন ফিরে চাইতেই চমক খেয়ে ওঠে নয়ান বাগদী; তাকে দেখে বলে উঠলো—মা'র কথা শুনলে না দা'ঠাকুর? আমি না-বলে-কয়ে কিছুতেই নিয়ে যেতে পারিনে। বাড়ী চল।

রাগ করে নয়ান বাড়ী ফিরিয়ে আনে বালক শরৎচন্দ্রকে। তারপর ভুবনমোহিনীকে ডেকে বলে—বৌঠান্, যেতে আসতে ক্রোশ আষ্টিকের পথ। জোছনা রাত্তি, নিয়ে যেতে পারতুম—কিন্তু পথটা তেমন ভাল নয়। ভয় আছে গো, বড্ড ভয় আছে।

পথের যে কী ভয় ভুবনমোহিনী তা জানতেন। এসব অঞ্চলে ঠ্যাঙাড়েদের দল আছে। তাদের অত্যাচার যে কিরকম, তা ভাবতে গিয়ে ভুবনমোহিনী ভয় পান। বললেন ছেলেকে—না, কক্ষনো যেতে পাবিনে, শোরো।

নিরুপায় হয়ে বালক শরৎচন্দ্রকে অন্য ফন্দি আঁটতে হলো। নয়ান চলে গেলে, গামছাটা কাঁধে নিয়ে পুকুরে নেয়ে আসি বলে বাইরে বেরিয়ে আসে বালক শরৎচন্দ্র। তারপর নদীর ধার দিয়ে লুকিয়ে গ্রামের কাঁচা-রাস্তা পাকা-রাস্তায় যেখানে মিশে গেছে সেখানে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

একটু পরেই নয়ান এলো। শরৎচন্দ্রকে দেখতে পেয়ে সে অবাক হয়ে গেল। বললে—কেমন করে এলে দা'ঠাকুর?

—নেয়ে আসবার নাম ক'রে।

নয়ান বলে—যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে। চল দা'ঠাকুর, চল।

বসন্তপুরে নয়ান বাগদী তার পিসীর বাড়ীতে আসে। পিসীর অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল। সেখানে বালক শরৎচন্দ্রকে কলাপাতায় চিঁড়ে, গুড়, দুধ, কলা দিয়ে ফলার করালো। তার পর একটু জিরিয়ে পিসীমার কাছ থেকে গরু নিয়ে পিসীমাকে বললো—এই পাঁচটাকা রাখো। পিসীমা বললো—ও টাকা নেব না, তোর ছেলেদের বাতাসা কিনে দিস। তারপর বালক শরৎচন্দ্রের কথামতো বাড়ীর ছেলেদের তৈরী ছিপের তাড়া কাঁধে নিয়ে ফেরার পথে বেশ সন্ধ্যে হয়ে গেল। দু'পাশের ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ। নয়ান আর বালক শরৎচন্দ্র এই পথ দিয়েই চলছিল। হঠাৎ পঞ্চাশ-ষাট হাত দূরে বিশ্রী এক চীৎকার শুনতে পেল। তারপর লাঠির ধুপধাপ শব্দ। একটু পরেই সব নীরব হয়ে গেল। নয়ান কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভারী গলায় বললে—যাঃ, একটা লোককে মেরে ফেললে দা'ঠাকুর!

বালক শরৎচন্দ্র ভয়ে শিউরে ওঠে।

ধীরে ধীরে ওরা আবার এগুতে লাগলো। ভয়ে তখনও বালক শরৎচন্দ্রের বুক কাঁপছে। আরো খানিকটা আসবার পর নয়ান বললে—আজ বরাতে যা-হোক একটা আছে দা'ঠাকুর!

বালক শরৎচন্দ্র আরো ভয় পেয়ে বলে—কেন নয়ান-দা?

—দেখতে পাচ্ছনি দা'ঠাকুর, রাস্তার ওপর কি রয়েছে?

সত্যিই বালক শরৎচন্দ্র অন্ধকার রাস্তাটার ওপর একটা মানুষকে শুয়ে থাকতে দেখতে পেল।

নয়ান ত্রস্তপদে লোকটার কাছে এসে দেখতে পেল, সে এক বোষ্টম ভিখারী। তাকে ঠ্যাঙাড়ের দল মেরে ফেলে রেখে গেছে। তাই

দেখে নয়ান বাগদীর মেজাজ গরম হয়ে উঠলো। বালক শরৎচন্দ্রের হাতে গরুটা দিয়ে, ঠ্যাঙাড়েদের ফেলে দেওয়া বাঁশের পাবড়া একটা নিয়ে বললে—তুমি দা'ঠাকুর এখানে থাকো। আমি আসতিছি। তারপর নয়ান অন্ধকার ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঠ্যাঙাড়েদের লুকিয়ে থাকতে দেখে, সেই জঙ্গলটার মধ্যেই প্রবেশ করলে। একটু পরে চীৎকার করে বললে—এক ব্যাটাকে ধরেছি দা'ঠাকুর। বালক শরৎচন্দ্র শুভ সংবাদ শুনে আনন্দে অধীর হয়ে বলে—ওকে ধরে আনো, নয়ান-দা। আমি ওকে ঠেঙিয়ে মারবো।

সত্যি-সত্যিই নয়ান মারতে মারতে ধরে নিয়ে আসে এক ঠ্যাঙাড়েকে। ঠক্‌ঠক্ করে সে কাঁপছে আর কাঁদছে। বালক শরৎচন্দ্র ঠ্যাঙাড়েটার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে ভয়ে শিউরে উঠলো। তার চুন-কালি-মাখা মুখটা ভূতের মতোই যেন। নয়ান বললে—কই দা'ঠাকুর, একে কি করবে করো?

বালক শরৎচন্দ্র বলে—না নয়ান-দা, ওকে মেরো না, ছেড়ে দাও।

নয়ান বাগদী শেষ পর্যন্ত ঠ্যাঙাড়েটাকে ছেড়ে দিলে।

বাড়ী ফিরে এলে পর এই কাহিনী শুনে ভুবনমোহিনী শিউরে উঠলেন।

নয়ান বাগদীর কৃপায় সে-যাত্রায় শরৎচন্দ্রের প্রাণরক্ষা হয়েছিল।

এদিকে মতিলাল শরতের প্রতি নজর দিলেন। পিয়ারী পণ্ডিতের পাঠশালা থেকে শরৎকে ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয়ের নূতন স্থাপিত বাঙলা-স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। যদি শরৎ এবার কিছু লেখাপড়া শেখে। এই সময় আর্থিক অনটনে পারিবারিক জীবন

মতিলালের ভয়ানক অশান্তিময় হয়ে ওঠে। কোনদিকে কূলকিনারা না পেয়ে বালক শরৎচন্দ্রকে নিয়ে মতিলাল ডিহরিতে চাকরি খুঁজতে যান। কিন্তু সেখানেও সামান্য টাকায় কুলিয়ে ওঠে না। ফিরে আসতে বাধ্য হলেন।

সেই একই অবস্থা। কত আর তিনি ধার-দেনা করবেন! পাড়া-প্রতিবেশীদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে ভুবনমোহিনীর সঙ্গে জল্পনা-কল্পনা শুরু করে দিলেন। সকালে এক প্রতিবেশী কতই না অপমান করে গেলেন! সে-সব কথা ভাবতে গিয়ে মতিলালের বুক ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো। স্ত্রীকে বললেন—ভুবন, এ গাঁয়ে তো আর বাস করা যায় না। কি করা যায় বল তো?

ভুবনমোহিনী বললেন—এই লক্ষ্মীছাড়া ভিটেয় থেকে কিছুই হবে না। আমাকে নয় ভাগলপুরে পাঠিয়ে দাও।

মতিলাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন—সেই ব্যবস্থাই করতে হবে, ভুবন। ওখানে গেলে হয়তো আমার একটা ভাল কাজও জোগাড় হয়ে যাবে।

সত্যিকথা বলতে কি, ভাল একটা চাকরির জন্য মতিলাল কম চেষ্টা করেননি। কত দোরে ঘুরতে হয়েছিল এই চাকরির জন্য। কিন্তু লেখাপড়া জানলেও তাঁর মন্দভাগ্যে ভাল চাকরি কোনদিন জোটেনি।

অবশেষে ১৮৮৬ সালের এক শুভদিনে মতিলাল সস্ত্রীক ভাগলপুরে শ্বশুরবাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

॥ দুই ॥

মতিলালবাবুর শ্বশুরবাড়ী ভাগলপুরের গাঙ্গুলী পরিবারের খ্যাতি ছিল চারিদিকে। এই বংশে প্রায় সবাই উকিল ছিলেন। অনেকে ভাল চাকরিও করতেন। লক্ষ্মীশ্রী-উপছে-পড়া একান্নবর্তী সংসার। কর্তা ও তাঁর চার ভাই সকলেই দিক্‌পাল। বিরাট বাড়ী; বার-মহল, পূজামণ্ডপ,—দারোয়ান, দাসদাসী,—ঢালাও আড্ডাখানা। কোন দিকেই ত্রুটি ছিল না। মতিলাল এলেন এই সংসারে—স্ত্রী, জ্যেষ্ঠা কন্যা অনিলা, শরৎচন্দ্র, প্রভাসচন্দ্র আর প্রকাশচন্দ্র। কনিষ্ঠা কন্যা সুশীলা—ওরফে 'মুনিয়া'র ভাগলপুরেই জন্ম হয়। শ্বশুর কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাড়ীর কর্তা। মেয়ে-জামাই আসাতে খুবই খুশী হলেন তিনি। আর বংশের বড়-নাতি শরৎচন্দ্রকে পেয়ে বাড়ীর সবাই আরো খুশী। কেদারনাথ সোনাদানা দিয়ে আশীর্বাদ করে বড়-নাতি শরৎচন্দ্রকে ঘরে তুলে নিলেন। বালক শরৎচন্দ্র অবাক হয়ে মামার বাড়ীর কাণ্ডকারখানা ছাখে।

দেবানন্দপুর আর ভাগলপুরের প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। দেবানন্দপুরে বালক শরৎচন্দ্রের অন্তর কানায় কানায় ভরে উঠতো। এই বিরাট পরিবারের মধ্যে বালক শরৎচন্দ্র বড় হতে লাগলো, আর তার স্বেচ্ছাচারী মন হাঁপিয়ে উঠতে লাগলো মামার বাড়ীর কঠোর নিয়ম-কানুন দেখে।

একদিন কেদারনাথ কন্যা ভুবনমোহিনীকে ডেকে বললেন—ভুবন, শরৎ কি ইস্কুলে পড়ে?

পিতার কথার কী জবাব দেবেন ভুবনমোহিনী? বলতেও লজ্জা

লাগে। শরৎ তেমন কিছুই লেখাপড়া শেখেনি। তবুও মুখ ফুটে ভুবনমোহিনী বললেন—এবার ইস্কুলে দেওয়া হয়েছে।

কেদারনাথ গড়গড়ায় টান দিয়ে বললেন—বেশ। তবে কি জানিস মা, শরৎ হলো তোর সংসারে বড় ছেলে। ওকে মানুষ করা দরকার।···মতি কি করে এখন?

ভুবনমোহিনী লজ্জায় এতটুকু হয়ে যান। স্বামী যা কাজ করেন তাকে কাজ বলা চলে না। আমতা আমতা করেই বলতে হয়—সেই সেরেস্তার কাজ-ই করেন উনি।

কেদারনাথ আর কোন কথা বলেন না।

ভুবনমোহিনী নিঃশব্দে উঠে চলে যান। নিজের ক্ষুদ্র ঘরটির মধ্যে এসেই একটু অবাক হয়ে যান। স্বামী কেমন নিবিষ্ট মনেই নাটক-নভেল লিখে চলেছেন! ভুবনমোহিনী একটু বিরক্তি প্রকাশ করেই বলে উঠলেন—এখানে ওসব ছাইপাঁশ না লেখাই ভালো। মনে রেখো, এটা উকিল আর লেখাপড়া জানা লোকের বাড়ী।···বাবা কি বলছিলেন জানো?

—আমার কাজের কথা নিশ্চয়?

—সে কথা বললে তো বাঁচতুম; বললেন, তুমি কি করো।

মতিলাল সত্যিই লজ্জিত হয়ে পড়লেন। ভুবনমোহিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে তাঁর বড়ই কষ্ট হলো। এই বিরাট গাঙ্গুলী পরিবারের দিকে তাকালে তাঁর কত কথাই না মনে হয়। অতীতের দিকে তাকিয়ে মতিলাল ভাবতে থাকেন, একদিন তাঁর উচ্চবংশ দেখে এই কেদারনাথ তাঁর অভিভাবকদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করতে। কোথায় এক গরীব ব্রাহ্মণ-পরিবারের

এক নিষ্কর্মা পুত্রের সঙ্গে বিধাতার যোগাযোগ নিরূপিত হলো। এসব ভাবতেও আশ্চর্য লাগে মতিলালের।

ভাগলপুরে মাতুলালয়ে আসবার পর সেখানকার অভিভাবকেরা বালক শরৎচন্দ্রকে ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করে দিলেন। এখানে শরৎচন্দ্র পড়লো মহা মুশকিলে। অভিভাবকেরা জানেন যে শরৎ খুব ভাল ছেলে। সে-বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত। কিন্তু বালক শরৎচন্দ্র ক্লাসে অন্যান্য ছেলেদের চাইতে পিছিয়ে। গ্রামের পাঠশালায় বা স্কুলে যতটুকু লেখাপড়া হয়েছে তা ভাবতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বোকা বনে যেত এখানে। অথচ বালক শরৎচন্দ্রের একটা গুণ ছিল, সমবয়সী কি সহপাঠী এদের কাছে কোন ব্যাপারে পিছিয়ে পড়া বা অগৌরব সহ্য করা মোটেই ধাতে সইতো না। অল্পদিনের মধ্যেই সেই যে জিদ ধরে লেখাপড়া শুরু করলো, তার খ্যাতি হলো প্রচুর। দেবানন্দপুরের সেই পিয়ারী পণ্ডিতের 'ন্যাড়া সর্দার'কে এখানে ভাল ছেলে বলে শিক্ষকরা গ্রহণ করলেন। অথচ শরৎচন্দ্রের দুষ্টবুদ্ধি ছিল না যে তা নয়। এখানেও মাঝে মাঝে স্কুল পালাবার প্ল্যান চলতো। এই 'দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ে' যারা শরৎচন্দ্রের সমবয়সী তাদের মধ্যে হলো—মাতুল মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। অন্য সঙ্গী ছিল মাতুল যোগেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়; তারা বয়সে ছোট। এই স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন স্বয়ং কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বাড়ীর কর্তা হিসাবে ছেলেপুলেদের বিদ্যাশিক্ষার দিকে বেশী নজর দিতেন।

একদিন টিফিনের ঘণ্টা পড়লে স্কুলের একটি নির্জন ঘরে ডেকে যোগেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের কাছে প্রস্তাব করলে—সকাল সকাল কি করে বাড়ী পালানো যায় বলতে পারিস, ঠিক চারটের আগেই।

শরৎচন্দ্র বললে—এমন বোকা ছেলেও দেখিনি! ছুটি নিয়ে যা।

মহেন্দ্র হেসে বললে—হ্যাঁ, অক্ষয় পণ্ডিত ছুটি দেবার লোক বটে! ওঁর কাছে ছুটি চাওয়া মানে বেত খাওয়া।

তার কথা শুনে শরৎচন্দ্র মৃদু হেসেই বললে—তা আমি কি করবো! চল্ বাইরে যাই।

মণীন্দ্রনাথ বাধা দিয়ে বলে—শরৎ, তুই একটা মতলব খাটা, যাতে সবাই আমরা বাড়ীতে সকাল সকাল যেতে পারি। রোজ চারটে পর্যন্ত থাকা যায় না।

কিশোর শরৎচন্দ্র প্ল্যান দিতে ওস্তাদ। একটু ভেবে বন্ধুদের বললে—এক কাজ করা যাক। আপিসের ঘড়ি অক্ষয় পণ্ডিত সোমবার দিন দম দেন। তোরা যদি কোনগতিকে ঘড়ির বড় কাঁটাটা ঘুরিয়ে তিনটের সময় সাড়ে তিনটে করতে পারিস, তা হলে আমরা আধঘণ্টা আগেই ছুটি পাবো। কিন্তু সাবধান যোগেন, কেউ যেন টের না পায়; বুঝলি?

শরতের এই প্ল্যান শুনে সকলেই বাহবা দিতে লাগলো। কিন্তু মুশকিল হলো, অফিস-ঘরে কে আগে যাবে আর কে-ই বা এই কাজটা করবে।

যোগেন্দ্রনাথ বললে—আচ্ছা শরৎ, এক কাজ করা যাক, তিনটের সময় আপিস-ঘরে কেউ থাকে না। সকলেই ক্লাসে থাকে। আমরা ক'জনেই সেই সময় যাবো। কি বল্?

শরৎচন্দ্র বললে—তা মন্দ নয়। কিন্তু ঘড়ির নাগাল পাবি কি করে?

মহেন্দ্র বললে—আরে, আমাদের যোগীন খুব জোয়ান। যোগীন যদি আমায় কাঁধে করতে পারে, তা হলেই বাজিমাত।

সঙ্গে সঙ্গে সকল বন্ধু বাইরে বেরিয়ে এলো। ঠিক তিনটের সময় অফিস-ঘরে শরৎচন্দ্র দেখে এলো কেউ নেই। তারপরেই তাদের কাজ হাঁসিল হলো। সেদিনকার মতো স্কুলের ছুটিও হয়ে গেল।

বাড়ীতে সকলকে চারটের আগেই আসতে দেখে কেদারনাথ নিজেই বলে উঠলেন—হ্যাঁ রে, তোরা যে সকাল-সকাল এলি! ব্যাপার কি বল্ দেখি?

কারুর মুখে কোন কথা নেই। সবাই ভয়ে জড়সড়। শরৎচন্দ্র মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। কেদারনাথ বুঝতে পারলেন সব। এরা যে স্কুল ফাঁকি দেয় সে-কথা ভাবতে গিয়ে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। কিছু না বলেই কেদারনাথ ছুটলেন হেডমাস্টারের বাড়ী। অম্বিকা পণ্ডিত স্কুলের হেডমাস্টার। তাঁর বাড়ী গিয়ে কেদারনাথ দেখেন অম্বিকা পণ্ডিত তাঁর পকেট-ওয়াচটি মিলিয়ে দেখছেন। পিছনে কেদারনাথ। অম্বিকা পণ্ডিত দেখতে পেয়েই চমকে উঠলেন। কেদারনাথ-ই বলে উঠলেন—ব্যাপার কি বলুন তো, চারটে না বাজতেই ছুটি?

অম্বিকাবাবু বললেন—আমি নিজেই বুঝতে পারছি না, স্যার। ঘড়িটা কি শেষে—

—ঘড়ি যদি খারাপ হয়ে থাকে সারিয়ে নিন। ছেলেদের ভবিষ্যৎ তো নষ্ট করতে পারি না।

—আচ্ছা, কাল স্কুলে গিয়ে যা-হোক একটা ব্যবস্থা করবো।

কেদারনাথ ক্ষুণ্নমনেই বাড়ী ফিরলেন।

পরদিন হেডমাস্টার স্কুলে এসে অক্ষয় পণ্ডিতের কাছে কৈফিয়ত চাইলেন।

তিনি বললেন—আচ্ছা অক্ষয়, রোজ রোজ ঘড়ি বিগড়ে যায় কি করে? তুমি তো নিয়মিত দম দাও প্রতি সোমবারে। এখন সেক্রেটারিকে কী কৈফিয়ত দিই বল তো?

অক্ষয় পণ্ডিতের এতক্ষণ পরে হুঁশ হলো। তিনি নিজের পকেট-ঘড়িটা বের করে দেখলেন ঘড়ি ফাস্ট চলেছে। ব্যাপারটা যে কী, বুঝতে পারলেন তিনি। মূল কারণটার অনুসন্ধানের জন্য ওৎ পেতে রইলেন। ঠিক তিনটের সময় দেখতে পেলেন ছেলেদের ব্যাপারখানা। সঙ্গে-সঙ্গেই অক্ষয় পণ্ডিত—'তবে রে বদমায়েস!' ব'লে ঘরে ঢুকে হাতে-নাতে ধরলেন দুজনকে। তারপর কান ধরে ক্লাসে হাজির করলেন। ক্লাসের সমস্ত ছেলে অক্ষয় পণ্ডিতের মারমুখ দেখে ক্লাস ছেড়ে পালিয়ে গেল। কেবল শরৎচন্দ্র শান্ত ছেলেটির মতো অঙ্ক কষতে লাগলো। অক্ষয় পণ্ডিত এগিয়ে এলেন শরতের কাছে। বলে উঠলেন—তুই হচ্ছিস দলের সর্দার!

শরৎচন্দ্র জবাব দেয়—আপনার পা ছুঁয়ে বলছি মাস্টারমশাই, আমি কিছুই জানি না। আমি তো অঙ্ক কষছি, মাস্টারমশাই।

অক্ষয় পণ্ডিত কিছু বললেন না শরৎচন্দ্রকে। —আচ্ছা, তুই অঙ্ক কষ। কিন্তু বদমায়েস ছেলের দল গেল কোথায়? দাঁড়া সব মজা দেখাচ্ছি— ব'লে ক্লাস ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি।

এইসব ঘটনার কথা কেদারনাথের কর্ণগোচর হলে, তিনি স্বয়ং তাদের পড়াবার ভার নিলেন। চোখ মেলে রইলেন বাড়ীর ছেলেরা যেন নষ্ট না হয়। শরৎচন্দ্র এইবারেই হলো ভাল ছেলে। নিয়মিত বইপড়ায় আকৃষ্ট হলো তার মন।

এদিকে নিষ্কর্মা মতিলাল শ্বশুরবাড়ীতে বসে ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আর কোন চিন্তা করছেন না। শরৎ তাঁর ভাল পরিবেশের মধ্যেই

মানুষ হচ্ছে এই ভেবে ঘরে বসে ইংরেজি নভেলে নিজেকে ডুবিয়ে রাখলেন। মাঝে মাঝে তাঁর মুখ থেকে নানা কথাও বেরিয়ে আসতো—নাঃ, বাংলায় কি-সব ছাইপাঁশ বই লেখে! আচ্ছা, আমি নিজেই একখানা ভাল বই লিখবো।···একটু তামাক না খেলে আর নয়।···নাঃ, এই 'মিস্ট্রিজ অফ দি কোর্ট অফ লণ্ডন' বইখানিই ততক্ষণ পড়ি। আহা, যেমন বর্ণনা তেমন ঘটনা!

তারপর ইংরেজি নভেলের মধ্যে মতিলাল ডুবে গেলেন।

ভুবনমোহিনীর স্বামীর প্রতি সবসময় দৃষ্টি থাকতো। একদিন নিচের তলায় কাজে ব্যস্ত ছিলেন—স্বামীর সাড়া পেয়ে ছুটে এলেন; বললেন—কি? তামাক?

—হ্যাঁগো, হ্যাঁ।

ঘরের কোণেই তাম্রকূট-সেবনের সাজসরঞ্জাম থাকতো। ভুবনমোহিনী একটু পরেই স্বামীর হাতে হুঁকোটি তুলে দিয়ে বললেন—এই নাও, খাও।

মতিলাল হুঁকোতে হু'চারটে দম দিয়ে বললেন—হ্যাঁগা, একটা আলো-টালো দেবে না? সন্ধ্যে হয়ে এল যে।

ভুবনমোহিনী এবার বিরক্তি প্রকাশ করেই বললেন—সারাদিন তো এইসব পড়লে। যাওনা একটু বাইরে। ঘরে বসে না থেকে কি একটু কোথাও বেড়াতে নেই? যাও, বেড়িয়ে এসো। তারপর ন'কাকার কাছ থেকে নতুন 'ভারতী'খানা এনে দেবো। যাও—

মতিলাল এবার শান্তির নিশ্বাস ফেলতে পারলেন। বললেন—আচ্ছা, এনে রেখো। একটু বাইরেই যাই।

মাতুলালয়ে শরৎচন্দ্রের দিন কাটতো নানা গল্প আর রূপকথার মধ্যে। সন্ধ্যাবেলায় এই গল্পের আসর বসতো। একদিন সন্ধ্যাবেলায়

কুসুমকামিনী দেবী (শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয়া মাসিমা) প্রদীপের সুমুখে বসে 'কপালকুণ্ডলা' পড়ছিলেন। পাশে শরৎচন্দ্র, মণীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য বালকেরা নিবিষ্ট মনে শুনছে। শরৎচন্দ্র উপুড় হয়ে শুয়ে দু'কনুই-এর উপর ভর দিয়ে দু'হাতে মুখ রেখে 'কপালকুণ্ডলা'র ওপর চোখ মেলে থাকে। কুসুমকামিনী পড়ে চলেছেন—

"নবকুমারের কপালে স্বেদ নির্গমন হইতে লাগিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ যুবতীর এই কথা কাপালিকের কর্ণে গেল। সে কহিল—'কপালকুণ্ডলে!'

স্বর নবকুমারের কর্ণে মেঘগর্জনবৎ ধ্বনিত হইল। কিন্তু কপালকুণ্ডলা কোন উত্তর দিল না।

কাপালিক নবকুমারের হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মনুষ্যঘাতী করস্পর্শে নবকুমারের শোণিত ধমনী মধ্যে শতগুণ বেগে প্রবাহিত হইল। লুপ্ত সাহস পুনর্বার আসিল। কহিল, 'হস্ত ত্যাগ করুন।'

কাপালিক উত্তর করিল না। নবকুমার পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, 'আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছেন?'

কাপালিক কহিল, 'পূজার স্থানে।'

নবকুমার কহিল, 'কেন?'

কাপালিক কহিল, 'বধার্থ!' "

ঠিক এই সময় শরৎচন্দ্র বলে উঠলো—মাসিমা, ও মাসিমা, নবকুমারকে কাপালিক কেটে ফেলবে?

—কি করে বলি বল্ দেখি বাবা? পড়ে দেখি, শেষে কি আছে।— কুসুমকামিনী বললেন।

কিশোর শরৎচন্দ্র এবার উঠে বসলো। তারপর নিজের মন্তব্য প্রকাশ করে বললে—আমার মনে হয় কি জানো মাসিমা, কেটে ফেললেই তো গল্প শেষ হয়ে যাবে। ও কাটবে না, তুমি দেখে নিয়ো।

মণীন্দ্রনাথ বললে—কাটবে না তো কি ? ঠিক কাটবে।

শরৎ বলে—না, কখ্খনো নয়।

শরতের কথা শুনে মাসিমা মৃদু হেসে বললেন—জানি না, শরৎ এই বই যিনি লিখেছেন তাঁর নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কাঁঠাল-পাড়ায় আমার বাপের বাড়ীর কাছে তাঁর বাড়ী। আমি ছেলেবেলায় বিয়ের আগে তাঁদের বাড়ী বেড়াতে যেতুম। তাঁকে দূর থেকে দেখেছি। খুব সুন্দর চেহারা। আর কী বাবু লোক, তোকে কি বলবো রে শরৎ ! ওমা, তোরা এখনো এখানে বসে ! যা যা, পড়্গে শীগ্গির।

সেদিন কুসুমকামিনী নিজেই সচকিত হয়েছিলেন বলেই এ-বাড়ীর ছেলেরা নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে পেরেছিল। শরৎচন্দ্র, মণীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ছেলেরা যখন চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে প্রবেশ করে তখন দরদালানে কেদারনাথকে খাটের উপর ঘুমোতে দেখলে। ফরাস-বিছানায় ধপধপে সাদা চাদর পাতা—রেড়ির তেলের প্রদীপের চারিদিকে সবাই পড়তে বসে গেল। দেবেন্দ্রনাথের পড়ার অভ্যাস ছিল না। সে একখানি বই নিয়ে শুরু করলে—পি-এস-এ-এল-এম—পস্লাম।

মণীন্দ্রনাথ বলে উঠলো—দূর, পস্লাম কিরে ? বল্—পিসলাম।

এমন সময় সেই ঘরে উড়ে এলো দুটি চামচিকে। তাদের মাথার ওপর উড়তে দেখে সকলের হাত নিসপিস করতে লাগলো। বিশেষ করে শরৎচন্দ্র ও মাতুল মণীন্দ্রনাথের। মামা-ভাগনে বেরিয়ে এল বাইরে বাঁখারি সংগ্রহ করতে। বাঁখারি সংগ্রহ করে ঘরের ভিতর ঢুকবার সময় দেখে নিল কেদারনাথ সত্যিই ঘুমে মগ্ন কিনা। বুকে সাহস নিয়ে তারপর চামচিকে নিধনের পালা চললো। এদিকে দেবেন্দ্রনাথ পড়া বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু মজা হলো এই যে,

বাঁখারির আঘাতে রেড়ির তেলের প্রদীপ গেল উল্টিয়ে। সে এক বিশ্রী কাণ্ড। এই সুযোগে শরৎচন্দ্র ও মণীন্দ্রনাথ রান্নাঘরে খেতে চলে গেল। কিন্তু বেচারী দেবেনের তখনও নিদ্রাভঙ্গ হয়নি।

ছেলেপুলেদের গোলমাল শুনে কেদারনাথের নিদ্রা গেল ভেঙে। তিনি চীৎকার শুরু করলেন—মুশাই—মুশাই!

মুশাই এ-বাড়ীর হিন্দুস্থানী চাকর। সে ছুটে এল—'জী!'

—বাত্তি কেঁও বুত্ গিয়া?

মুশাই দেশলাই জ্বেলে দেখলো—না আছে মণি, না আছে শরৎ। শুধু দেবেন গভীর ঘুমে মগ্ন। মুশাই বললে—মণি, শরৎ খানেকো গিয়া। দেবীন বাত্তি গিরা দিয়া।

কেদারনাথ উঠে এসে দেখলেন সেই ফরসা চাদরের ওপর রেড়ির তেলের ঢেউ বইছে। তিনি রেগে বলে উঠলেন—মুশাই, চৌকো বাত্তি লাগাও। তারপর দেবেন্দ্রকে কানে ধরে তুলে বলে উঠলেন—লে যাও আস্তাবলমে।

বাড়ীর কর্তার সামনে বেচারী দেবেন আস্তাবলে চোখের জলে বুক ভাসাতে লাগলো।

শরৎচন্দ্রের এমনিভাবে মাতুলালয়ে দিন চলতে থাকে। ভুবনমোহিনী এবার সত্যিই বুঝলেন, এখানে থাকলেই শরৎ মানুষ হবে। দেবানন্দপুরের সেইসব বদ-ছেলের সঙ্গ আর হৈ-হুল্লোড় করে বেড়ানোর যে কী ফল হতো! ভুবনমোহিনী সত্যিই বুঝতে পারলেন শরতের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। স্বামীকে একদিন তাই বললেন ভুবনমোহিনী—শোরো আজকাল কী শান্ত হয়েছে! এতদিন পরে আমার হাড় জুড়োলো।

মতিলাল আনন্দের সুরেই বলে উঠলেন—ভাল ছেলের দলে

মিশলে খারাপ ছেলেও ভাল হয়, ভুবন। এখন বুঝতে পারছি শোরোকে আমরা কী চোখে দেখে এসেছি।

পুত্রের এই পরিবর্তন দেখে, ভুবনমোহিনীকে মাঝে মাঝে ভাল কিছু খাবার নিয়ে শরৎকে কাছে ডেকে উপদেশ দিতে দেখায় এ-বাড়ীর বউয়েরা ভুবনমোহিনীকে বলতো—দিদির যেন সব-তাতেই বাড়াবাড়ি! অমন কোলঘেঁষা করলে ছেলে গোল্লায় যায়।

ভুবনমোহিনী জবাব দেন—তোমরা না ছেলের মা? মা হয়ে ছেলেকে কাছে রাখলে কি গোল্লায় যায়, বউ? দেশে থাকতে শোরো আমার পাশটিতে কতটুকুই বা থাকতো! যতদিন ওর ঠাকুরমা বেঁচেছিলেন, তাঁর কোলঘেঁষা হয়েই থাকতো শোরো।

ভ্রাতৃবধূ ও অন্যান্য মেয়েরা ভুবনমোহিনীর এসব কথা শুনে আড়ালে হাসতো।

সত্যি-সত্যিই একদিন দেখা গেল শরৎচন্দ্র ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্থানীয় ইংরেজি স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হলো। শরৎচন্দ্রের স্কুল-জীবন আগের মতো ছিছি-র নয়। পড়াশুনায় অমনোযোগীও বলা যায় না। প্রথম বৎসর বার্ষিক পরীক্ষায় শরৎচন্দ্র শুধু প্রথমই হলো না, একেবারে ডবল প্রমোশন পেল। মাতুলালয়ের সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলেন। এমন কি, ভুবনমোহিনীর ভ্রাতা বিপ্রদাস একদিন বললেন—শরৎকে আমি উকিল বানিয়ে ছাড়বো, মেজদি।

ভুবনমোহিনী সন্তুষ্ট হয়ে সেদিন বলেছিলেন—খালি ভাবছি কি জানিস বিপিন?—ও যেন ওই উকিলই হয়। মঙ্গলময় যেন তাই করেন!

ভাগলপুরের মাতুলালয়ে খেলাধুলা আর দুষ্টুমি বুদ্ধির চেয়ে

শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্যচর্চার দিকে মন আকৃষ্ট হলো। তার মণিমামার (মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) স্বাস্থ্য ছিল সুন্দর। যার ফলে শরৎচন্দ্রও একটি স্বাস্থ্যচর্চার দল গড়ে ফেললো। এখানে তার অনেক সঙ্গী হলো। গাঙ্গুলী-বাড়ীর উত্তর দিকে অর্থাৎ গঙ্গার ঠিক ওপরেই একটা পোড়ো বাড়ী ছিল। লোকে বলতো ওটা ভূতের বাড়ী। শরৎচন্দ্র সেই ভূতের বাড়ীতেই কুস্তির আখড়া তৈরি করলো। প্যারালাল-বার না থাকায় আখড়াটি ঠিক মনের মতো হয়নি। অথচ প্যারালাল-বার পোঁতা কম কথা নয়। নিঃসম্বল ছেলের দল টাকা পাবে কোথায়? শেষে ছেলের দল শরৎচন্দ্রকে ঘিরে ধরলো। উপায়ের পথ খুঁজতে লাগলো শরৎচন্দ্র। শেষে কী ভেবে ছেলের দলকে নিয়ে হাজির হলো মণিমামার কাছে। প্যারালাল-বারের কথা শুনে মণিমামা একগাল হেসে বললে—প্যারালাল বার করা অত সহজ নয়। আগে ডন-বৈঠক দিতে শেখো, তারপর ঐসব।

শরৎচন্দ্র নাছোড়বান্দার মতোই বললে—বলো-না মণিমামা, প্যারালাল-বার কোথায় পাওয়া যায়?

মণিমামা কিছুই বললে না। অগত্যা কিশোর শরৎচন্দ্রকে অন্য বুদ্ধি খাটাতে হলো। আপাততঃ বাঁশ কেটে তা তৈরি করবে, পরে পয়সা জমিয়ে কিনবার ব্যবস্থা হবে। সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে শরৎচন্দ্র বেরিয়ে পড়লো দা হাতে নিয়ে। 'বার' পোঁতা হলে, ছেলেদের আনন্দের সীমা থাকলো না। নানা কায়দায় সকলেই দোল খেতে লাগলো।

শরৎচন্দ্রের এসব খেলার মধ্যে নিবিড় যোগ থাকলেও, মাঝে মাঝে

এই ভীড়ের মধ্যে থাকতে তার মন হাঁপিয়ে উঠতো। খেলতে খেলতে বা খেলা শেষ করে কোথায় যে উধাও হতো—বন্ধু-বান্ধবরা টেরই পেত না। দেখা হলে তারা প্রশ্ন করতো—হ্যাঁরে শরৎ, তুই কোথায় যাস রে?

শরৎচন্দ্র জবাব দিত মুচকি হেসে—আমার তপোবনে।

—সেটা আবার কি ভাই?

—তোরা কেউ বুঝবি না।

পাশ কাটিয়ে গেলেও, সমবয়সী মাতুল সুরেন্দ্রনাথ ছাড়বার পাত্র নয়। শরতের তপোবন বস্তুটি কী তা জানবার জন্য তার মন অধীর হয়ে থাকতো। একদিন সন্ধ্যেবেলায় শরতের ঘরে এসে সুরেন্দ্রনাথ বললে—আচ্ছা শরৎ, তোর তপোবন কোথায় রে?

শরৎ বলে—দেখবি আমার তপোবন?

—হ্যাঁ, বল্ না কোথায়?

—তবে কাল যাস আমার সঙ্গে, দেখাবো।

পরদিন কুস্তির আখড়া থেকে বেরিয়ে মামাকে সঙ্গে নিয়ে খানিকদূর পথ অগ্রসর হবার পর শরৎ বললে—না, থাক—তোমরা যদি ফাঁস করে দাও?

সুরেন্দ্রনাথ বললে—না, দেবো না। আমি দিব্যি করেই বলছি শরৎ।

শরৎচন্দ্রের এই তপোবন সম্বন্ধে মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় চমৎকার এক বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি 'শরৎ পরিচয়' গ্রন্থে বলেছেন ঃ ঘোষেদের পোড়োবাড়ীর উত্তর দিকটায় গঙ্গার পাড়ের উপর একখানি ঘর। তার পিছনে নিম গাছ আর কামরাঙা গাছের ঝাড়ে একখণ্ড জায়গাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। নিমের গুলঞ্চ আর

মদনের কাঁটা লতার গায়ে গায়ে সাদা তারার ফুলের মতো। জায়গাটি এমন করে রেখেছিল, তার মধ্যে মানুষ ঢুকতেও পারে না। শরৎচন্দ্র তার মধ্যে ঢুকে সঙ্গীকে ডাকলেন—সুরেন, আয়। সুরেন্দ্রনাথ কোন ইতস্ততঃ না করেই ঢুকে দেখতে পেল প্রশান্ত এক দৃশ্য। নিচে গঙ্গার স্রোত—ওপারে গঙ্গার নীলাভ ধোঁয়াটে ছবি। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে কী সুন্দরই না দেখাচ্ছিল!

সুরেন্দ্র বললে—ভারি সুন্দর জায়গা তোর!

শরৎ বললে—শুধু তাই বলে আমি আসি। এখানে বসে বড় বড় কথা ভাবি। সুরেন্দ্রনাথ একটু বিদ্রূপের সুর কেটেই বলে—সেইজন্যে বোধ হয় অঙ্কে একশো পাও?

—'দ্যুৎ'—ব'লে একটা হাসি হাসলো শরৎ।

ক্রমশঃ সন্ধ্যে হয়ে আসে। সুরেন্দ্রনাথ বললে—চল্, বাড়ী যাই।

একটু পরেই সন্ধ্যাদেবী তাঁর আচল বিছিয়ে নেমে এলেন। স্তব্ধ হয়ে এলো তপোবনের চারিপাশ। দূরে অর্থাৎ গঙ্গার সেই প্রশান্ত দৃশ্য ধোঁয়াটে হয়ে গেল। শরৎচন্দ্র সঙ্গী মামাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। তারপর বললে—সুরেন, এখানে কিন্তু একলা এসো না।

—কেন?

—ভয় আছে।

—কিসের? ভূতের ভয় বুঝি?

—তা নয়।

—তবে কিসের?

—বড় বড় সাপ আছে এখানে।

কিন্তু শরৎচন্দ্রকেই একবার সাপে কামড়ায়। মামাদের বাড়ীর

এক কোণে পিয়ারাগাছের গোড়ায় ইট ও কাঠের গাদার তলায় সাপের আড্ডা ছিল। এই সাপ ধরবার জন্য শরৎচন্দ্রের মন চঞ্চল হয়ে পড়ে। মামাদের বাড়ীতে পুরনো একটা বই ছিল। 'সংসার কোষ'। এই সংসার-কোষে সাপ-ধরার এক কৌশল লেখা ছিল। শরৎচন্দ্র তাই পড়ে উদ্ধার করলো, কি করে সাপ ধরতে হয়। এই ঘটনাটি ঘটে ঠিক দুপুরবেলায়। গাঙ্গুলী-বাড়ী তখন নিঝুম—হঠাৎ শরৎচন্দ্রের আর্তনাদে মণিমামা ছুটে এলো। সাপে কামড়াতে দেখতে পেয়ে নিজের পৈতে দিয়ে শরৎচন্দ্রের পা বেঁধে একেবারে বাড়ীর ভিতর-প্রাঙ্গণে নিয়ে এলে, বাড়ীতে হৈ-চৈ পড়ে গেল। বাইরের প্রাঙ্গণ জনাকীর্ণ। কেদারনাথ ছুটে এলেন তাঁর হরিণের বাঁটের ছুরি নিয়ে। ক্ষতস্থানে ছুরি চালিয়ে কেদারনাথ জিজ্ঞাসা করলেন—কী সাপ তা দেখেছিলি ?

শরৎ বলে—হুঁ, দেখেছি।

—কোথায় ছিল ?

—ঐ খাপরার তলায়। না জেনে পা দিয়ে ফেলেছিলুম।

মণীন্দ্রনাথ সাপ ধরার ব্যাপারটি আর প্রকাশ করলে না। কেদারনাথ আবার প্রশ্ন করলেন—তারপর কি করলি ?

—মণিমামা দেখতে পেয়ে পৈতে দিয়ে পা বেঁধে দিলে।

কেদারনাথ রাগে গরগর করছিলেন। বাড়ীর মেয়েদের দিয়ে খানিকটা নুন আর চিনি আনিয়ে প্রথমে শরৎকে নুন খেতে দিয়ে তিনি বললেন—এটা কি বল্ দেখি ?

—চিনি।

এবার চিনি হাতে দিয়ে কেদারনাথ বললেন—এটা কি এইবার বল্ দেখি ?

—নুন।— শরৎ বলে উঠলো।

শরৎচন্দ্রের এইরকম কথাবার্তা শুনে ভুবনমোহিনী হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন—ওগো বাবা গো! কি হবে গো! শোরো আমার চিনিকে নুন আর নুনকে চিনি বলছে। মা মনসা, দোহাই মা তোমার! শোরোকে ভাল করে দাও মা! তোমার পুজো দেব।

কেদারনাথ কন্যার রকম-সকম দেখে বললেন—কেন অমন করছিস ভুবন? বিষাক্ত সাপ হলে তোর ছেলে এতক্ষণ—ব'লে থামলেন তিনি। তারপর শরৎকে বললেন—সাপটা কেমন দেখতে রে?

—গায়ে চক্কোর ছিল। মস্তবড় সাপ।

—হুঁ, মিথ্যেকথা তোর।— কেদারনাথ ধমক দিয়ে বলে উঠলেন।

—মিথ্যেকথা নয় দাদু, সাপটা— ব'লে শরৎ থামলে।

মতিলাল অদূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই দুর্ঘটনা দেখে তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। চারিদিকে গুরুজন। তাঁরা হয়তো না থাকলে এতক্ষণ কান্নায় ভেঙে পড়তেন ভুবনমোহিনীর মতো।

তারপর রোজা ডেকে নানা চিকিৎসা করে শরৎচন্দ্রের বিষ নামানো হয়।

পায়ের ক্ষত নিয়ে শরৎচন্দ্র যেখানে খুশী বেড়াতে শুরু করলো। বাড়ীর কারও মানা সে শুনলো না। ভুবনমোহিনী অনেক বুঝিয়ে বললেন—শোরো, একটু সুস্থ হ' বাবা, তারপর যেখানে খুশী যাস।

মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরে শরৎ বলে—এইতো আমি ভাল হয়ে গেছি মা!

ভুবনমোহিনী সস্নেহে বললেন—তাই হ' বাবা! মা-মনসার আজ পুজো দিচ্ছি—কোথাও পালাসনে যেন।

—হুঁ— ব'লেই শরৎ উধাও হলো ঘোষেদের সেই পোড়ো-বাড়ীতে।

এই সময়ে মাতুলালয়ে শরৎচন্দ্র একদিন দেখতে পেল একটি মানুষকে। এই মানুষটি তাদেরই এক আত্মীয়। তিনি কলেজে পড়েন; ছুটির অবকাশে ভাগলপুরে বেড়াতে এসেছেন। তাঁর ছিল সঙ্গীতে অনুরাগ, কাব্যে আসক্তি। বাড়ীর সমস্ত মেয়েদের জড়ো করে রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' পড়িয়ে শোনাচ্ছিলেন সেদিন। শরৎ আড়ালে অবাক হয়ে শুনতে থাকে তাঁর ভাবমিশ্রিত কণ্ঠস্বর। কাব্যের মধ্যে যে এত আনন্দ, এত দুঃখ-বেদনার ইতিহাস লেখা থাকে, শরৎচন্দ্র এই প্রথম তার সাক্ষাৎ পেল। শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন—"কে কতটা বুঝলো জানিনে। কিন্তু পাছে দুর্বলতা প্রকাশ পায়, এই লজ্জায় তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এলাম। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে দ্বিতীয়বার পরিচয় ঘটলো; এবং বেশ মনে পড়ে, এইবার পেলাম তার সত্য পরিচয়। এরপর এ বাড়ীর কঠোর নিয়ম, সংযম আর ধাতে সইলো না। আবার ফিরতে হলো আমাদের সেই পুরনো পল্লীভবনে।"

ঠিক এই সময় ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের থাকার দিন ফুরিয়ে আসে। পিতা মতিলাল দেখতে পেলেন কর্তাদের মধ্যে বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে গোলযোগ বাধছে। শ্বশুরবাড়ীতে বেশিদিন থাকা যায় না। অনেক দিন কাটানো গেল। অবশেষে ভুবনমোহিনীকে ডেকে একদিন বললেন—ভুবন, এখানে আর থাকা যায় না—চল, দেশে ফিরে যাই।

মতিলালকে সেই ব্যবস্থাই করতে হলো।

কেদারনাথ মেয়ে-জামাইকে চলে যেতে দেখে খুব দুঃখ পেলেন।

যাবার সময় কন্যা ভুবনমোহিনীর হাতে কিছু অর্থ দিয়ে বললেন—ভালোভাবে থাকিস, মা! শরৎটার দিকে একটু নজর রাখিস। ছেলেটা যেন গোল্লায় না যায়।

এমনি করেই একদিন ভাগলপুরের মাতুলালয়ে শরৎচন্দ্রের দিনগুলি শেষ হলো।

॥ তিন ॥

১৮৮৯ সালে দেবানন্দপুরের সেই ন্যাড়া আবার ফিরে এলো সেই ছায়া-সুনিবিড় পল্লীগ্রামে। সেই পুরনো বন্ধুবান্ধব আবার এসে ভিড় করে দাঁড়ালো। ন্যাড়া ফিরে এসেছে, আনন্দের আর সীমা রইলো না তাদের। স্বগ্রামে ফিরে এসে মতিলাল শরৎচন্দ্রকে 'হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে' ভর্তি করে দিলেন। পুত্রের লেখাপড়া ও সংসারের দৈন্য ঘোচাতে চারিদিকে ছুটতে লাগলেন। ভাল চাকরি না হলেই নয়। এদিকে মাথার ওপর বিবাহযোগ্যা কন্যাও রয়েছে। ভাবনায় দিশাহারা হয়ে মতিলাল আরো অস্থির হয়ে উঠলেন। কপর্দক-শূন্য মতিলালকে আবার সেই সেরেস্তার কাজ নিতে হলো। আত্মভোলা মতিলাল—শরতের বিদ্যাশিক্ষা কতদূর যে এগিয়েছে সে দেখবার অবকাশ তাঁর ছিল না। শুধু শরৎ যে স্কুলে যায় এইটুকুই জানতেন। দু'ক্রোশ পথ হেঁটে দশ-বারোজন সঙ্গীকে নিয়ে স্কুলে পড়তে যেতে হতো। তা ছাড়া গ্রামে শরতের যাত্রা-থিয়েটার দেখার নেশা প্রবল হয়ে উঠলো। গ্রামের জমিদার নবগোপাল দত্ত মুন্সীর একমাত্র পুত্র অতুলচন্দ্র শরৎচন্দ্রকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি হুগলী কলেজে বি.এ. পাস ক'রে এম.এ. পড়বার জন্য

কোলকাতায় চলে আসেন। শরৎচন্দ্রকে মাঝে মাঝে কোলকাতায় এনে থিয়েটার দেখিয়ে বলতেন—ন্যাড়া, অভিনয়ের বিষয়-বস্তুটি গল্পের মতো করে লিখতে পারলে পুরস্কার দেব। শরৎচন্দ্র লিখে দিয়ে পুরস্কার আদায় করতো। অতুলচন্দ্র শরতের এমনি চিন্তাশীল মন দেখে অবাক হয়ে যেতেন।

শরৎ যে আবার একটা নূতন দল গড়ে তুলেছে এ কথা একদিন মতিলালের কানে এলো। এই সময় সদানন্দ নামে একটি ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় শরৎচন্দ্রের। ছেলেটি হলো তার প্রধান শিষ্য। সেও কম ডানপিটে ছেলে নয়। তার হাতে সবসময় থাকতো একটা ছোরা। সকলে তার বশ্যতা স্বীকার করতো অতি সহজেই। ভাগলপুরের শরৎ দেবানন্দপুরে 'দলপতি শরৎ' নামে পরিচিত হলো। এই সময় ছিপ নিয়ে মাছধরার নেশা না থাকলেও, সদানন্দের সঙ্গে জেলেডিঙিতে মাছ-চুরি করার নেশা প্রবল হয়ে ওঠে। অধিক রাত্রে সদানন্দ এসে ডাকতো। তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে নৈশ-অভিযানে চলে যেত দুজনায়। কোথায় কোন্ প্রতিবেশীর বাগানের ফল আত্মসাৎ ক'রে—দীঘির পাড়ে, আমবাগানের ধারে, উঁচু গড়ের আড়ালে একদল কিশোর ডাকাত পরম নিশ্চিন্তে লুণ্ঠিত ফলের স্বাদ গ্রহণ করতো। আবার কোন দুঃস্থ প্রতিবেশীর ইতিবৃত্ত শুনলে, সংগৃহীত ফল বিলিয়ে দিয়ে আসতো।

বদ-ছেলের দলে মিশে শরৎচন্দ্রের তামাক খাবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। নির্জন আড্ডায় বসে দলবল নিয়ে তামাক খাওয়া—তার সরঞ্জাম ছিল মজুত করা। এই তামাক খাবার জন্য বদ-ছেলে বলে তার নাম রটে গেল। ভুবনমোহিনীর দু'চোখে জল ভরে আসতো শরতের এই অধঃপতনের কথা শুনে। একদিন তিনি তার হদিস

পেলেন ; প্রতিবেশীদের কথা আদৌ অবিশ্বাস করতে পারলেন না ভুবনমোহিনী। পুত্রের জামাকাপড় কাচতে গিয়ে হাতে-নাতে সেদিন ধরে ফেললেন। শরৎ বাড়ী ফিরলে ভুবনমোহিনী ছেলের হাত ধরে ঘরের ভিতর নিয়ে এসে সব-কিছু দেখিয়ে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন —এসব ছাইপাঁশ খাস কেন শোরো ? জবাব দে ?

কোন কথার উত্তর দিতে পারে না শরৎ। বোবার মতো মুখে মায়ের দিকে ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে থাকে। ভুবনমোহিনী অস্থির হয়ে ছেলের দু'গালে চড় মেরে বলে উঠলেন—আজ তোকে উপোস করিয়ে রাখবো। কিছু খেতে পাবি না। মজা ছাখ্ শোরো— ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মতিলাল ভুবনমোহিনীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে ঘর থেকে বাইরে এসে বলে উঠলেন—এত গোলমাল কিসের ভুবন ?

ভুবনমোহিনী সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দেন—ঐ হাড়হাবাতে ছেলেটা ! এই বয়সে তামাক গাঁজা বিড়ি খাওয়া ! বাপ হয়ে চোখ মেলে একবার দেখবে না !—তার ছেলে অমন উচ্ছন্নে যাবেনা তো কি ?

মতিলাল বললেন স্ত্রীকে—শোরো কোথায় ?

—ঘরে গো, ঘরে।

—শোরো, এদিকে আয়— মতিলাল ডাক দেন ছেলেকে। সাড়া না পেয়ে ঘরে ঢুকে দেখলেন, শরৎ নেই। স্ত্রীকে ডেকে বললেন— ভুবন, শোরো তো এ-ঘরে নেই।

ভুবনমোহিনী রান্নাঘর ছেড়ে অবাক হয়ে ঘরে ঢুকলেন। এইতো ছিল, গেল কোথায় ?

স্বামীকে বললেন—যাবে আর কোথায়, ঐ সদার বাড়ীতে উঠেছে। বন্ধু বলতে তো ঐ সদা। শোরোর মাথা খেলে তো ঐ হতভাগা।

বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে শরৎচন্দ্র এই সদানন্দের বাড়ীতেই আশ্রয় নেয়। রাত তখন বেশ হয়েছে। সদানন্দের বাড়ীতে প্রবেশ করবার অসুবিধা নেই কোন। এখানে তাস-দাবার আসর বেশ জমতো। বাড়ীর লাগোয়া নারকেলগাছে মই লাগিয়ে শরৎ সদানন্দের বাড়ীর ছাদে উঠতো। তারপর সেই ছাদের একপাশে বাতি জ্বালিয়ে তাস-দাবা খেলে আর ঘন ঘন তামাক খেয়ে অধিক রাত্রে বাড়ী ফিরতো। অথচ ভুবনমোহিনী সদানন্দকে যেমন বদ-ছেলে বলে জানতো, তেমনি সদানন্দের অভিভাবকেরাও শরৎচন্দ্রকে বদ-ছেলে বলেই জানতো। সেইজন্য সদানন্দকে তার অভিভাবকেরা অনেক সময় নজরবন্দী করে রাখতো। দুষ্টু দুই বন্ধুই শেষ অবধি এই নজরবন্দী ভেঙে ফেললে এমনি এক মই লাগিয়ে।

পুত্রের অধঃপতন যেমন একদিকে প্রবল হয়ে উঠলো, তেমনি জ্যেষ্ঠা কন্যা অনিলার বিবাহের জন্য মতিলাল অস্থির ও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। সৎপাত্রে কন্যাদান করবার মতো তাঁর হাতে তেমন অর্থ ছিল না। শুধু বসতবাটী ছাড়া আর কিছুই তাঁর নেই। তাও বোধহয় বাঁধা দিয়ে কন্যার বিবাহ দিতে হবে। এই হলো মতিলালের এক মহা সমস্যা। কিন্তু বিধাতাপুরুষ তেমন নির্দয় নন। সৎপাত্র মতিলালের বরাতে জুটে গেল এক প্রতিবেশীর চেষ্টাতে।

কন্যা অনিলার রূপগুণ ছিল। যার জন্যে মতিলালের কন্যার বিবাহ পাকাপাকি হয়ে যায় এককথায়। তিনি ঐ পাত্রকে দেখতে বরানগরে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আসেন। কেদারনাথ ছিলেন অনিলা দেবীর স্বামী পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের বড় ভগ্নীপতি। পঞ্চাননবাবু কেদারবাবুর বাটীতে থেকে কোলকাতায় চাকরি করতেন। পঞ্চাননবাবুর পিতা তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে কেদারনাথ

পাত্রী দেখতে দেবানন্দপুরে যান এবং বিবাহের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করেন। অনিলা দেবীর যখন বিবাহ হয় তখন তাঁর বয়স ছিল ১২।১৩ এবং স্বামী পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের বয়স ছিল ২২ বছর। পঞ্চানন হুগলী জেলার গোবিন্দপুর গ্রামের এক জমিদার-পরিবারভুক্ত সন্তান ছিলেন। কন্যাদায়গ্রস্ত মতিলালকে শেষ পর্যন্ত দেনা করেই বিবাহ দিতে হয়। শ্বশুর কেদারনাথ তাঁর নাতনীর বিবাহে কিছু অলঙ্কার ও টাকা পাঠিয়ে দেন; মতিলাল কন্যাকে যৎসামান্যই দিতে পেরেছিলেন। একদিকে কন্যার বিবাহে ঋণ, অন্যদিকে পাড়া-প্রতিবেশীদের নানা কথা—শরতের নিত্যনূতন অপকর্মের জন্য,—চিন্তায় মতিলালের মানসিক জীবন বড়ই অশান্তিময় হয়ে ওঠে।

কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ভাগলপুর থেকে ভাটপাড়ায় এসেছিলেন তাঁর গুরুকে দেখতে। সেখানে এসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর আর ভাগলপুরে ফিরতে হলো না, তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন। ভুবনমোহিনীও পিতা কেদারনাথের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ (১৮৯২, ১লা জানুয়ারি) শুনে অসুস্থ হয়ে পড়েন। যার ফলে সংসারের রূপ বিভীষিকাময় হয়ে ওঠে।

শরৎচন্দ্র এবার সংসারের মধ্যে চক্ষু মেলে দেখলো—পিতার অনুনয়-বিনয় শুনতে পেল, তখন তার প্রাণে কেমন যেন একটা দোলা দিয়ে উঠলো। এই সংসারের মধ্যে শরতের কাব্যপ্রীতি জেগে উঠলো আরো বেশী করে। শরৎচন্দ্র তাঁর 'বাল্যস্মৃতি'তে লিখেছেন —"এই সময় বাবার দেরাজ থেকে বের করলাম 'হরিদাসের গুপ্তকথা' আর বেরুলো 'ভবানী পাঠক'। গুরুজনদের দোষ দিতে পারিনে। স্কুলের পাঠ্য তো নয়, ওগুলো বদ-ছেলের পাঠ্য পুস্তক।

তাই পড়বার ঠাঁই করে নিতে হলো আমাকে বাড়ীর গোয়ালঘরে। সেখানে আমি পড়ি, তারা শোনে।”

মাতার শোকবিহ্বল চিত্ত শরৎচন্দ্রকে ভাবিয়ে তুললো। এইসব ভুলে যেতে দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়তো সে অনেক দূরে। সংসারে ফিরে এলে আবার ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠতো তার প্রাণে।

এই সময় শরৎচন্দ্র ‘কাশীনাথ’ নামে একটি গল্প লেখে। গল্পটি তার অপরিণত বয়সের রচনা। হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের সহপাঠীদের কাছে গল্পটি শুনিয়ে শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করে—গল্পটির কী নামকরণ করা যায়? বন্ধুদের ইচ্ছায় শরৎচন্দ্র পিয়ারী পণ্ডিতের ছেলে কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামানুসারে গল্পটির নামকরণ করে ‘কাশীনাথ’। এই সময় শরৎচন্দ্রকে ভাগলপুরে আবার ফিরে যেতে হয়।

শরৎচন্দ্র সে সম্বন্ধে ‘বাল্যস্মৃতিতে’ লিখেছেন—“পিতার নিকট হইতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছুই পাইনি।...কিন্তু এখনো স্পষ্ট মনে আছে ছোটবেলায় তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। কেন তিনি এইগুলি শেষ করে যাননি—এই বলে কত দুঃখই না করেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কি হতে পারে ভাবতে-ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। তারপর একই স্কুলে বেশীদিন পড়লে বিদ্যে হয় না। মাস্টারমশাই স্নেহবশে একদিন ইঙ্গিত দিলেন। আবার ফিরতে হলো শহরে।”

শরৎচন্দ্র ১৮৯৩ ও ১৮৯৪ সনের প্রথমাংশে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করতো।

মতিলালকে ১৮৯৪ সালে সপরিবারে ফিরতে হয় ভাগলপুরের

শ্বশুরবাড়ীতে। এই সময় তাঁর ঋণের বোঝা অত্যধিক হয়ে পড়ে। বাড়ী-ঘর নীলামে উঠবার উপক্রম। তা ছাড়া শরৎচন্দ্রের অত্যাচারে সমস্ত দেবানন্দপুর অস্থির। তখন মতিলাল এই দুই সমস্যার মধ্যে পড়ে পুনরায় শ্বশুরালয় ভাগলপুরে আসতে বাধ্য হন।

॥ চার ॥

ভাগলপুরে ফিরে এসে শরৎচন্দ্র ১৮৯৪ সালেই তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হলো। যে-সব সহপাঠী এবং অনুরক্ত বন্ধুবান্ধব ছেড়ে যেতে হয়েছিল তারা আবার গুরু শরৎকে দলের মধ্যে পেল। ভাগলপুরের মাতুলালয়ের কঠিন আইনকানুন শরৎচন্দ্র অপছন্দ করলেও, এবার আর ভয় পাবার কিছু ছিল না। এ বাড়ীর নিয়ম ও শাসনকে কি করে ফাঁকি দিতে হয় তার শিক্ষা শরৎচন্দ্র আগেই পেয়েছিল।

ভাগলপুরে থাকতে এইসময় একটি ছেলের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। ছেলেটির নাম নীলা। সে এই পাড়ারই ছেলে। শরৎচন্দ্রকে সে খুবই ভালবাসতো। এ-বাড়ীর সকলের সঙ্গে তার আলাপ ছিল।

শরৎচন্দ্র মামার বাড়ীতে যে ঘরটিতে থাকতো, সেটা ঠাকুরঘরের একটেরে একখানা ছোট ঘর। ঘরটির মধ্যে দেবদারু-কাঠের শেল্ফ। শরৎচন্দ্রের বই থাকতো সেই শেল্ফে। দড়ির একটা খাট। বিছানার কোন শ্রী নেই—ময়লা চাদর, ছেঁড়া-ফাটা বালিশ ইত্যাদি। ভুবনমোহিনীর এ-ঘরটা বড়ই অপছন্দের ছিল। ছেলে তাঁর সারারাত্রি প্রদীপ জ্বেলে কি যে করে, ভুবনমোহিনী কোনমতেই তা বুঝতে পারতেন না। অথচ এই ঘরের মধ্যে একটি টেবিল,

একটি স্টোভ—আর রাত্রি-জাগরণের পাকা বন্দোবস্ত থাকতো কফির আর ধূম-উদ্‌গিরণের। শরৎচন্দ্র এইসময় প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। সারারাত্রি জেগে তাকে পড়তে হোত। আর এ-বাড়ীর ছেলে অর্থাৎ মাতুল সুরেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ আর অন্যান্য ছেলেদের অনেক সময় পড়া তৈরি করে দিতে হোত। ঠিক এইসময় শরৎচন্দ্রের বড়মামা ঠাকুরদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা প্রসাদীর কালাজ্বর হওয়ায়, তার সেবার ভার শরৎচন্দ্রকেই নিতে হয়। ক্লান্ত হয়ে অনেক সময় শেষ রাতটুকু নিজের ঘরে এসে নিদ্রায় কাটিয়ে দিতে হোত। এ ঘরে একটা পোষা বেঁজীও বাঁধা থাকতো। কারণ বাড়ীতে সাপের উৎপাত ছিল ভয়ানক। বিশেষ করে এই ঘরটির বাইরে যা আবর্জনা তাতে সাপ থাকার সম্ভাবনা খুবই ছিল। ভুবনমোহিনী শরৎচন্দ্রকে অনেকবার বলেছেন এ-ঘর ছাড়তে। শরৎচন্দ্র মায়ের কথায় আমলই দিত না।

একদিন রাত্রি-জাগরণের শেষদিকটায় শরৎচন্দ্র নিজের ঘরে এসে পরীক্ষার পড়া শেষ করে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে নীলা শরতের ঘরে এসে অবাক হয়ে যায়। শরৎকে এত বেলা অবধি কোনদিন ঘুমোতে দেখেনি। জানালার কাছে এসে অবাক বিস্ময়ে নীলা শরতের বিছানা আর গায়ের চাদরের দিকে লক্ষ্য করে ডাক দেয়—শরৎ, ও শরৎ!

তন্দ্রা-বিজড়িত কণ্ঠে বলে ওঠে শরৎ—কেন রে নীলা?

—তুই কি রক্তবমি করেছিস?

—হ্যাৎ, কি যে তুই বলিস্! এখন যা, একটু ঘুমোই।

শরতের এই তাচ্ছিল্য নীলার সহ্য হলো না। বললে—তুই উঠে ছাখ।

শরৎ নীলার কথায় তবুও আমল দিল না। চুপ করেই শুয়ে রইলো।

নীলা আবার বলে ওঠে—তুই কি রে শরৎ! গায়ের চাদরখানা রক্তে ভেসে গেছে। উঠে ছ্যাখ্ না একবার।

রক্তের কথা শুনে শরৎচন্দ্র ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো। তারপর বললো—একি রে! এ তো রক্তবমি নয়। এ বেঁজী-বেটার কাজ। নিশ্চয় ইঁদুর মেরেছে— ব'লে গায়ের চাদরটা ফেলে দিয়ে বেঁজীটাকে বাইরে বেঁধে রাখতে গেল শরৎ।

একটু পরে ঘরে ফিরে এলে, নীলা অবাক হয়ে বললে—মস্ত ফাঁড়া গেছে। তোর বেঁজীটা একটা গোখরো মেরেছে। ঐ ছ্যাখ্।

উভয়ে ভয়ে আড়ষ্ট। নীলা শরৎকে বললে—হ্যাঁ রে, তোর কি কোন ভয় নেই? এমনি ভাবে মরবি তুই?

—মরবো কেন? তা হলে তামাক সাজবে কে?— ব'লে মুচকি হাসলো শরৎ।

এই নীলা ছেলেটি অসম্ভব রকমের তামাক খেত। শরৎচন্দ্র আর নীলা এই নির্জন ঘরটির মধ্যে বসে তাম্রকূট সেবন করতো। নীলার একটি গুণ ছিল—শরৎকে সাহায্য করা। বাড়ী থেকে আখরোট, কিসমিস, বিস্কুট প্রভৃতি এনে শরৎকে সে দিত।

তারপর সেই সাপ-মারার ঘটনায় বাড়ীর মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে গেল; মুশাই চাকর সাপটিকে বাইরে নিয়ে যাবার পর ভুবনমোহিনী ছেলের ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। ছেলেকে এমনিভাবে একা ফেলে রাখতে তাঁর সাহসে আর কুলালো না। বললেন—এ ঘরে তোর থেকে কাজ নেই, শোরো।

—কেন মা?

—আবার কথা বলছিস! হ্যাঁরে শোরো, তোর জন্যে কি আমি পাগল হব?

শরৎ মুচকি হাসলো। ভুবনমোহিনী ক্ষুণ্ণমনেই ঘর ছাড়লেন।

একটু পরেই মনসার প্রসাদ নিয়ে ভুবনমোহিনী ফিরে এলেন। তারপর টেবিলের ওপর প্রসাদটুকু রেখে বললেন—শোরো, খাস বাবা!

শরৎ প্রসাদের বহর দেখে হেসে বললে—ঐটুকু!

—ঐটুকু কি রে? অমন কথা বললে পাপ হয়।

ঝাঁকড়া-চুলের মাথাটি নাড়া দিয়ে শরৎ জবাব দেয়—না, তা হবে না—বাড়ীর সব কত পায়, আর আমাদের বেলায় অতটুকু!

ভুবনমোহিনী বুঝতে পারলেন ছেলের কথা। বললেন—ও, তুই নীলার কথা বলছিস? আচ্ছা, সে এলে বাড়ীর মধ্যে তাকে পাঠিয়ে দিস।

মৃদু হেসে ঘর ছেড়ে চলে যান ভুবনমোহিনী। তারপর স্বামীকে বুঝিয়ে বললেন সব কথা। মতিলাল তখন আহার করতে বসেছিলেন। মনসার প্রসাদটি পাতের নিকট থাকতে দেখে মতিলাল বললেন—ভুবন, এটা কি গা?

—মনসার প্রসাদ।— বললেন ভুবনমোহিনী।

—ওটা শোরোকে দেওয়া উচিত ছিল।

ঠিক এই সময় শরতের আগমন। মতিলাল ছেলেকে দেখতে পেয়ে বললেন—শোরো, এদিকে আয়।

শরৎচন্দ্র সেদিনের আর ছোট্ট ছেলেটি নয়। পিতার কাছে স্বচ্ছন্দে সে এসে দাঁড়ালো। মতিলাল বললেন—তুই ও-ঘর ছাড়্। আজ থেকে আমার কাছে থাকবি—বুঝলি?

পিতার আদেশ শুনে শরৎচন্দ্র অবাক হয়ে গেল। ঐ নির্জন ঘরটি ছেড়ে বাড়ীর মধ্যে না-আসাই ভাল। এ বাড়ীর মধ্যে বড্ড গোলমাল। এখানে প্রবেশ করলেই তার মন হাঁফিয়ে ওঠে। নাঃ, কোনমতেই তা সহ্য হবে না।

ভুবনমোহিনী ছেলেকে নীরব থাকতে দেখে বললেন—কি রে? শুনলি সব?

—আচ্ছা মা, কেন তোমরা আমাকে জ্বালাতন করছো?—শরৎ বলে উঠলো।

পুত্রের মুখে এতবড় একটা কথা শুনে মতিলাল অবাক হয়ে বললেন—তুই যা ভাল বুঝিস তাই কোর্‌গে।

শরৎচন্দ্র এতক্ষণ পরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো যেন। মনের আনন্দে আবার সে ফিরে এলো সেই ঘরটিতে।

নীলা যে কখন এই ঘরটির মধ্যে উপস্থিত হয়েছে, শরৎচন্দ্র তা জানতে পারেনি। পরে সে দেখতে পেল নীলাকে। কাঠের টেবিলের আড়ালে বসে সে লুকিয়ে প্রসাদ খাচ্ছে। শরৎচন্দ্র তা দেখে হেসে বললে—আর লুকিয়ে প্রসাদ খেতে হবে না। উঠে পড়্, নীলা।

নীলা মৃদু হেসে উঠে পড়লো। তারপর কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে-আনা টাইমপিস ঘড়িটা টেবিলের উপর রেখে সে বললে—এইটা তোকে দিলাম, শরৎ। পরীক্ষার পড়া তোর—বুঝলি?

শরৎ সঙ্গে সঙ্গেই বলে ওঠে—ওটা কোথায় পেলি রে নীলা?

—চুরি করে এনেছি।

—চুরি করে এনেছিস! বাড়ীতে খোঁজ পড়লে কি করবি?

—ভাববে, চোরে চুরি করে নিয়ে গেছে।

—আর আমি যদি চোরটাকে ধরিয়ে দি'— শরৎ হেসে বললে।

—যাঃ, তোর সঙ্গে আর কথা কইবো না!— মুখ আড়াল করে দাঁড়িয়ে রইলো নীলা।

শরৎচন্দ্র বিছানার উপর বসে বললে—হ্যাঁরে নীলা, আমাকে তুই খুব ভালবাসিস না রে?

—বা রে! একজন একজনকে ভালবাসলে বুঝি দোষ হয়?

—আর তোর সঙ্গে আমার ভাব কেন জানিস?

—বা রে, আমি জানবো কি করে!

—তুই তামাক খাস ব'লে।— এক গাল হেসে বলে উঠলো শরৎচন্দ্র।

নীলা এতটুকু লজ্জা বোধ করলো না। সে বললে—তোর ঘরটা নিরিবিলি, তাই মজা করে তামাক খাই। বাড়ীতে দাদার জ্বালায় তামাক খাবার কি জো আছে?

—গুরুজনদের খুব ভয় করিস বল্?

—তুই করিস না?

—না, মোটেই নয়।

—আমিও না।— তারপর বললে—ছেলেমানুষ হয়ে তুই কাউকে ভয় করিস না? বলিস কি রে নীলা!

—শয়তান, তুই আমাকে ছেলেমানুষ বলে লজ্জা দিচ্ছিস? তোর সঙ্গে আড়ি—আড়ি! তোর ঘরে কখ্খনো আসবো না।

নীলা ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

এই নীলা ছেলেটি ভাল গান গাইতে পারতো। তার একটা ছোট পিয়ানো ছিল। শরৎচন্দ্রকে সেই পিয়ানোটি বাজাতে দেয়। দুজনে বাইরের ঘরটিতে সুরসাধনায় মত্ত থাকতো।

দেখতে দেখতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার সময় হয়ে এলো। শরৎচন্দ্রের টেস্ট-পরীক্ষার যেদিন খবর বেরুলো, নীলার আনন্দের সীমা রইলো না। সেদিন সে তাকে উপহার দিয়েছিল আখরোট আর কিসমিস। শরৎ-চন্দ্র খুশীমনেই তা গ্রহণ করেছিল। এদিকে ভুবনমোহিনী বাবা-তারকনাথকে চুল মানত করলেন—শরৎ ভালভাবেই যেন পাস করে। এই সময়ে তিনি মহা মুশকিলে পড়লেন শরতের পরীক্ষার ফী জোগাড় করতে। আজ যদি তাঁর পিতা কেদারনাথ বেঁচে থাকতেন তাহলে এই সামান্য টাকা তিনিই দিয়ে দিতে পারতেন। ভ্রাতা বিপ্রদাসকে ভুবনমোহিনী মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলেন না।

এই গাঙ্গুলী পরিবার তখন পৃথক হয়ে পড়েছে। দুই ভাই তাঁর—ঠাকুরদাস গঙ্গোপাধ্যায় ও বিপ্রদাস গঙ্গোপাধ্যায়। একদিন তিনি ভ্রাতা বিপ্রদাসকে চর্বচোষ্য খাইয়ে বললেন—বিপিন, শোরো পাস করেছে।

বিপ্রদাস আহার করতে করতে বললেন—টেস্টে পাস হলে কি হবে মেজদি? ওকে ভাল করে পড়ায় মন দিতে বলো।

—বলছিল, ফী জমা দিতে হবে। টাকা তো অনেক লাগবে। কি করি বল্ তো বিপিন?

—কত মেজদি?

—আমি তা জানিনে। শোরোকে ডেকে আনছি।

—বিপ্রদাস বাধা দিয়ে বললেন—থাক, আমি জেনে নেবো।

বিপ্রদাসের মুখের কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে ভুবনমোহিনী স্বামীর কাছে এসে সব কথা জানালেন। বললেন—বিপিন সব ব্যবস্থা করবে। তুমি কার কাছেই বা হাত পাতবে বল?

ঋণগ্রস্ত মতিলাল একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারলেন। স্ত্রীকে

তাই বললেন—ভুবন, ভগবানের দয়ায় শোরো-টা পাস করতে পারলে বাঁচি! একটা চাকরি না হলে সংসার চলে না।

ভুবনমোহিনী জবাব দেন—বাবা তারকনাথের কাছে চুল মানত করেছি। শোরো পাস করলে বাবার শ্রীচরণে পুজো দিয়ে আসবো।

মতিলাল চুপ করে রইলেন। কি বলবেন তিনি? পরের বাড়ীতে এমনি করে থাকতে ভালো লাগে না। চক্ষুলজ্জা বলতে তাঁর যেন কিছুই নেই!

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় বিপ্রদাস শরতের ঘরে গেলেন—শরৎচন্দ্র তখন একটা অঙ্ক কষছিল। বিপ্রদাস এসে বললেন—তোর ফী কত রে?

—কুড়ি টাকা।

—টাকা কবে জমা দিতে হবে?

—পরশু।

পরদিন সকালে বিপ্রদাস খঞ্জরপুরে চললেন। ভাগনেটির ফী জোগাড় করতে। বিপ্রদাস সবে সরকারী দপ্তরে কাজে ঢুকেছেন—তাঁর হাতে তখন এমন অর্থ ছিল না যে, ঘর থেকে ফী-টা দিয়ে দেন। বাঙালীটোলা থেকে খঞ্জরপুর মাইল দেড়েকের পথ। সেইখানেই গুলজারিলালের বাড়ী। গুলজারিলালকে সবাই চেনে। সে ছিল ভাগলপুরের শাইলক্। চড়া সুদে টাকা তার কাছে পাওয়া যায়। গুলজারিলাল তাঁকে পূর্ব থেকেই চিনতো। সুদের অঙ্ক যে তার কী, বিপ্রদাস তা অবশ্য জানতেন। তবু বললেন—আজকাল কত সুদ নিচ্ছেন গুলজারিলালবাবু?

গুলজারিলাল বললে—সুদ যা লোকে দেয় তাই। তা আপনার টাকার দরকার থাকে তো, কাগজে-কলমে সই দিয়ে নিয়ে যান।

বিপ্রদাস আর কোনো কথা না ব'লে হ্যাণ্ডনোটে সই করে টাকা নিয়ে এলেন। অতি অল্প বেতনে বৃহৎ পরিবার পালনের সামর্থ্য তাঁর ছিল না। যাই হোক, গুলজারিলালের টাকার জোর ছিল ব'লেই শরৎচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষার ফী জমা দিতে পেরেছিল। তা না হলে, শরৎচন্দ্রের লেখাপড়ায় যবনিকা হয়তো সেইখানেই পড়তো। দেখতে-দেখতে পরীক্ষা শেষ হলো। তারপর এলো দীর্ঘ অবকাশ। এই অবকাশের মধ্যেই শরৎচন্দ্রের প্রথম সাহিত্যচর্চা শুরু হলো। মাথা-ভর্তি লম্বা লম্বা চুল রেখে সেই নির্জন ঘরটিতে গল্পলেখায় আর ঘন ঘন তামাক খাওয়ায় তার দিন কাটতে লাগলো। বন্ধুরা অনেক-সময় তাকে বিদ্রূপ করতো; বলতো—তুই কি রবিঠাকুর হবি নাকি?

রবিঠাকুর হবার ইচ্ছা ছিল বলেই শরৎচন্দ্র সেদিন বলেছিল—হব বইকি। তোরা দেখবি আমি একদিন রবিঠাকুরের মতো হই কিনা।

এমনি করেই তার প্রথম রচনা লেখা শুরু হয়—'বাসা'। পরে অবশ্য সে-লেখা মনঃপূত না হওয়ায় সে তা নিজেই ছিঁড়ে ফেলেছিল।

এণ্ট্রান্স পাসের খবর বেরুলো। দেখা গেল, দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে শরৎচন্দ্র। বয়স তখন আঠারো (তবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে ১৫ বছর ৩ মাস বয়স লেখা আছে)। সকলের আনন্দের আর সীমা রইলো না। একদিন ভুবনমোহিনী শরৎচন্দ্রকে নিয়ে বাবা তারকনাথের কাছে গিয়ে মানত-পুজো দিয়ে শরতের মাথা মুড়িয়ে ফিরলেন ভাগলপুরে।

শরৎচন্দ্র যে পরিবারে মানুষ হচ্ছিল, সে পরিবারে উকিল হওয়াটাই মানব-জীবনের অন্যতম সৌভাগ্য হিসেবে গণ্য করা হতো। তাঁদের

লক্ষ্মীলাভের জন্যই সরস্বতীর আরাধনা। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শরৎচন্দ্র তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজে এফ.এ. ক্লাসে ভর্তি হলো। এই সময়ে একটি অদ্ভুত ছেলের সঙ্গে তার আলাপ হয়। এই ছেলেটির নাম রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার। 'শ্রীকান্তে' যাকে আমরা 'ইন্দ্রনাথ' রূপে দেখতে পাই। তার ডাকনাম ছিল 'রাজু'। নির্জন গড়ের ধারে বসে সে মনের আনন্দে বাঁশী বাজাতো—এই শুনে শরৎচন্দ্রের মন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ ছিল বলেই, অল্প কয়দিনের মধ্যে সে আলাপ জমিয়ে নিল। অবশ্য রাজুর সঙ্গে আলাপটা ঘুড়ি-ওড়ানোর ব্যাপার নিয়ে মারপিটের মধ্যেই হয়। রাজুর বাবা রামরতন মজুমদার ছিলেন ভাগলপুরের ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার। তাঁর অর্থ ও খ্যাতি দুই-ই ছিল। তা ছাড়া তাঁর এক প্রকাণ্ড কাঠের ব্যবসা ছিল। এই রাজেন্দ্র সকল দোষগুণের অধিকারী ছিল। বয়সে সে শরৎচন্দ্রের চেয়ে বড়। বড় ছিল বলেই শরৎচন্দ্র তার বশ্যতা স্বীকার করেছিল। শুধু তাই নয়, রাজু যেমন দুষ্টু তেমনি সঙ্গীত-শিল্পীও। সব বাজনা সে ভালো বাজাতে পারতো। ঘোষেদের সেই পোড়ো-বাড়ীতে শরৎচন্দ্র ও রাজুর নানা দুষ্টুমির প্ল্যান চলতো। একদিন শরৎচন্দ্র রাজুকে তার ঘরে আমন্ত্রণ জানালো। রাজেন্দ্রনাথ সেদিন সেই নির্জন ঘরটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বললে—তোর ঘরটা মন্দ নয়, শরৎ। তুই তামাক খাস ?

—তা খাই।

—সাজ। তামাক আমিও খাই। তোর চাইতে অনেক বেশী।

তামাক খেতে খেতে রাজেন্দ্রনাথ বললে—তোকে আমি অনেক জিনিস দেব।

—কী জিনিস ?

—কাঠের ভাল শেল্‌ফ, পড়বার টেবিল।

শরৎচন্দ্রকে পরে অবশ্য রাজেন্দ্রনাথ দিয়েছিল এইসব জিনিস।

কলেজে ঢুকে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-প্রীতি আরো বেড়ে উঠলো; লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়লো ভীষণভাবে। রাজেন্দ্রনাথের ডাকে নিরুদ্দেশ-হয়ে-যাওয়া, আবার বাড়ী-ফেরা এই হলো শরৎচন্দ্রের কাছে আনন্দের জিনিস। ভুবনমোহিনী পুত্রের এই স্বভাব দেখে কম চোখের জল ফেলতেন না। বড় আশা, তাঁর শরৎ এফ.এ.-টা পাস করবে।

রাজুর সঙ্গে নৈশ-অভিযানে জেলেডিঙিতে মাছ-চুরি-করা, যাত্রা-থিয়েটারের রিহারশ্যাল দেওয়া—এই নিয়েই শরৎচন্দ্র আরো অধিক মেতে উঠলো। শুধু তাই নয়, এই রাজেন্দ্রই তাকে শেখালো কি ভাবে গাছের উপর উঠে ঘুমোতে হয়। শরৎচন্দ্র অবাক হয়ে ভাবতো সে সব-কিছুই পারে। কোনো কোনো দিন বা রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গ ত্যাগ করে সাহিত্য নিয়ে লেগে থাকতে শরৎচন্দ্রের মনে গভীর আকাঙ্ক্ষা জাগতো। এইসময় বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী পড়বার স্পৃহা যায় আরো বেড়ে। তিনি তাঁর 'বাল্যস্মৃতি'তে বলেছেন—"খবর পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস-সাহিত্যের পরেও যে কিছু আছে তখন তা ভাবতে পারতাম না। পড়ে পড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল। তারপর নিজেও লিখতে শুরু করি।" কলেজে ঢুকে ইংরেজি উপন্যাসের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। সারাদিন সে সেইসব নিয়েই থাকতো। একদিন সাহিত্য-প্রীতিতে আবার ভাঁটা পড়লো। রাজুর ডাকে আবার বেরুতে হলো ঘর থেকে বাইরে। শুরু হলো মড়া-পোড়ানো আর যাত্রার দলে যাত্রা করে বেড়ানো।

এমনি করে অবহেলায় শরৎচন্দ্রের দিন এগোতে থাকে। ঘর থেকে পালিয়ে বেড়ানো ক্রমশই যেন তার স্বভাব হয়ে দাঁড়ালো। বাবা-মা ভাই-বোন সবাই যেন এরা পর। 'বাউণ্ডুলে শরৎ' নামে সংসারে বদনাম রটে গেল। পুত্রের ছন্নছাড়া উদাসী ভাবের প্রাবল্য দেখে ভুবনমোহিনী মানসিক উদ্বেগে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ক্রমশঃ শয্যাশায়ীও হয়ে পড়লেন তিনি। মতিলাল বুঝতে পারলেন স্ত্রীর শেষসময় হয়ে এসেছে। এই সময় কোলকাতার বাড়ী থেকে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ভাগলপুরের বাড়ীতে আসে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তার নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হয়। নানা স্থানে ঘুরে বেড়ানো, সাহিত্যালোচনা ইত্যাদি তুজনের মধ্যে চলতে থাকে। কিন্তু কয়দিনের মধ্যেই উপেন্দ্রনাথ টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়। শরৎচন্দ্র তার সেবা করতো মাঝে মাঝে ওপরের ঘরে গিয়ে। উপেন্দ্রনাথের অসুখের বাইশদিনের দিন শরৎচন্দ্রের মাতা ভুবনমোহিনীর অকালমৃত্যু ঘটে (১৮৯৫ খ্রীঃ)।

শোকার্ত্ত মতিলাল গাঙ্গুলী-বাড়ী ছেড়ে ছেলেপুলে নিয়ে ভাগলপুরের একটি গ্রাম খঞ্জরপুরে এসে বাসা বাঁধলেন। খঞ্জরপুরে থাকবার সময় শরৎচন্দ্রের জীবনে সাহিত্য-রচনার অদ্ভুত একটা প্রেরণা জেগেছিল। সেই সময় তাকে কেন্দ্র করে সমবয়সীদের নিয়ে একটা 'সাহিত্য-চক্র'ও গড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে। এই খঞ্জরপুরে বিভূতিভূষণ ভট্ট ও তার বোন নিরুপমা দেবীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয় এবং ক্রমে তা বন্ধুত্বে পরিণত হয়। বিভূতিভূষণ ছিল শরৎচন্দ্রের চেয়ে ছোট, মাত্র বাইশবছর বয়স তার। আর শরৎচন্দ্রের চব্বিশ। এই চব্বিশ বছর বয়সে শরৎচন্দ্র গিরীশচন্দ্র ঘোষের 'জনা'র অভিনয় করে। রাজু অর্থাৎ রাজেন্দ্রনাথও এই 'জনা'য় অভিনয় করেছিল।

এই নূতন যাত্রা-দলটি রাজা শিবচন্দ্রের চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল ভাগলপুরে। তারপর দলটিকে ভাগলপুরের গোঁড়া ধনী ও মধ্যবিত্ত সমাজ ভেঙে দেয়।

ঋণ, পুত্রের অধঃপতন এইসব চিন্তায় দিশেহারা হয়ে মতিলালকে খঞ্জরপুর থেকে দেবানন্দপুরে আসতে হয় বসতবাটী বিক্রি করতে। ১৮৯৬ সালের ৯ই নভেম্বর মতিলাল তাঁর কনিষ্ঠ মাতুল অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাত্র ২২৫৲ টাকায় বসতবাটী বিক্রি করে খঞ্জরপুরে ফিরে আসেন। এই খঞ্জরপুরের বাসায় শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা রীতিমতোই চলতে থাকে। তার প্রমাণ পাই আমরা শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু বিভূতিভূষণ ভট্ট ও নিরুপমা দেবীর 'স্মৃতিকথা' থেকে। ১৯০০ সালে এদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। সেই 'স্মৃতি-কথা' থেকে এই দুই ভাইবোনের কথা কিছু উদ্ধৃত করলাম।

"আমাদের কবিতার খাতা পুরিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কেমন করিয়া জানিনা সেইসব লেখা, বিশেষতঃ নিরুপমার খাতাখানা শরৎচন্দ্রের হাতে গিয়া পড়িয়াছিল। দাদাদের মধ্যে কেহ হয়তো শরৎচন্দ্রের হাতে দিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র তখন সমবয়স্কদের মধ্যে একজন উচ্চ-জগতের জীবরূপে এবং অদ্ভুত 'ন্যাড়া' নামে অভিহিত। উপরন্তু তাহার তৎকালীন স্বাক্ষরিত নাম *St. Clare Loura*···। আমরা ছোটরা তখন ঐ অদ্ভুত মানুষটিকে দূর হইতে সসম্ভ্রমে দাদাদের পড়িবার ঘরে আসা-যাওয়া করিতে বা পাশা খেলিতে দেখিতাম। কিন্তু এহেন শরৎচন্দ্র সেই *Loura*··· একদিন হঠাৎ আমাদের টেবিলের পার্শ্বে আসিয়া হাজির। আমি ভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলাম—তিনি আমার কবিতার খাতাখানা টেবিলের উপর সজোরে ফেলিয়া বলিলেন—কি ছাইপাঁশ লেখো; খালি অনুবাদ, তাও আবার ভুলে ভরা। নিজের

কিছু নেই তোমার লেখবার? আমি তো শুনিয়া পৌনেমরা। কিন্তু তারপর কখন যে আমাদের আলাপ জমিয়া উঠিল, কবে যে তাঁহার খোলার ঘরে বই-খাতাপত্রে-ভরা টেবিলের পাশে বসিবার অধিকার পাইলাম তাহা আজ আর স্মরণ হয় না। কেবল এইটুকু মনে আছে যে, তাঁহার সেই প্রথম জীবনের সাধনার কুঠুরীর মধ্যে অতি সহজেই আমার স্থান হইয়াছিল।

"দিনের পর দিন তাঁহারই সাহচর্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকাননে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইলাম।···শরৎচন্দ্র রসস্রষ্টা রূপেই শেষ-জীবন পর্যন্ত প্রকটিত। কিন্তু যৌবনে একাধারে নট, সঙ্গীতজ্ঞ, যন্ত্রী এবং কাব্যরসজ্ঞ কবি। কত-না নূতন নূতন রূপে তাঁহাকে দেখিয়াছি! মনে পড়ে আদমপুর ক্লাবে গিরীশচন্দ্র ঘোষের লিখিত 'জনা'র অভিনয়। 'জনা'র পার্টের অভিনয়ে তরুণ শরৎচন্দ্র যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন, পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ অভিনেত্রীর মধ্যে তাহা দেখিয়াছিলাম কিনা সন্দেহ।

"আমরা যে পাড়ায় বাস করিতাম তাহার নাম খঞ্জরপুর। সেই পাড়ায় নদীর ধার হইতে মুসলমানের কবরস্থান, দেবস্থান কোন স্থানই বাদ যাইত না—শরৎচন্দ্র চিরদিনই বেপরোয়া—কোন দ্বিধা তাহাকে বাধা দিতে পারিত না।···আমাদের খঞ্জরপুরের বাড়ীর পাশেই একটা মসজিদ ছিল—এবং হয়তো এখনো আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি কবর আছে। আমরা হিঁদুর ঘরের ভীরু ছেলে; কিন্তু এই অসীম সাহসিকতার সদ্‌গুণে মাম্‌দো ভূতই বলো আর ব্রহ্মদৈত্যই বলো—সকল ভয়কেই তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছিলাম। কত গভীর অমাবস্যার রাত্রি এই কবরস্থানের মধ্যে কাটিয়া গিয়াছে। শরৎদার বাঁশী চলিতেছে, না হয় হারমোনিয়াম-সহ গান চলিতেছে এবং আমরা দু'চারজন তন্ময়

হইয়া বসিয়া শুনিতেছি। কখনো বা গভীর অন্ধকার রাত্রে গুরুজনদের রক্তনয়ন এবং দাদাদের চপেটাঘাত উপেক্ষা করিয়া গঙ্গার চড়ার উপর ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। কিংবা থিয়েটারের রিহারশ্যাল-কক্ষে বাঁশ মাথায় দিয়া সতরঞ্জিতে পড়িয়া রাত্রি কাটাইয়াছি।”

শরৎচন্দ্রের বিচিত্র বেপরোয়া জীবনের এই ছবিটির সঙ্গে নিরুপমা দেবীর ‘স্মৃতিকথা’তে লেখা আর-একটি ছবি যোগ করে দেওয়া গেল :

“আমার দাদারা তাঁহাকে কতদিন হইতে জানিতেন তাহা ঠিক জানি না। কিন্তু আমি জানিতাম, যখন আমার লেখার কবিতা লইয়া দাদারা অত্যন্ত আলোচনা করেন তখন। দাদাদের এক বন্ধুর নাম শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনিও দাদাদের মারফৎ আমার লেখার পাঠক এবং সমালোচক।…অল্পদিনের মধ্যেই আমার মেজো ভাজ মেজদার নিকট হইতে বৃহদায়তন এক খাতা আমাদের সেই ক্ষুদ্র-পরিসর সাহিত্য-চক্রে হাজির করিলেন। তাহা অতি সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র-হস্তাক্ষরে লিখিত ; নাম—‘অভিমান’। শুনিলাম দাদাদের উক্ত বন্ধু শরৎচন্দ্রই উহার লেখক। গল্পটি পড়িয়া যখন আমরা অভিভূত তখন মেজদা (বিভূতিভূষণ ভট্ট) সাড়ম্বরে গল্প করিলেন যে,—এই গল্পটি পড়ে একজন ন্যাড়াকে মারতে ছুটে। তাকে তখন পাঠকের ভয়ে ক’দিন লুকিয়ে থাকতে হয়। ক্রমে বৌদিদি দাদার নিকটে তাঁহার বন্ধুর সম্বন্ধে আরও কিছু কিছু গল্প সংগ্রহ করিয়া আমাদের মধ্যে প্রচার করিলেন। আমরা তখন ‘অভিমানে’র লেখকের অত্যন্ত শ্রদ্ধা-সম্পন্ন।…সেই উদাসী কবি-স্বভাব-বিশিষ্ট লেখকটিকে আমাদের বাসার পশ্চিমদিকে যে প্রকাণ্ড মসজেদ ছিল তাহার বৃক্ষচ্ছায়াময় পথে কখনো কখনো দেখা যাইত। কোন গভীর রাত্রে

সেই মসজেদের সুউচ্চ প্রাঙ্গণ-চত্বরে গানের শব্দ, কখন 'যমনিয়া' নদীর তীর হইতে বাঁশীর আওয়াজ ভাসিয়া আসিলে মেজদা মেজোবৌকে শুনাইয়া বলিতেন—এ ন্যাড়াচন্দ্রের কাণ্ড! আমাদের দল বায়ুপথে ভাসিয়া আসা গানের এক লাইন আবিষ্কার করিল—

'আমি দুদিন আসিনি, দুদিন দেখিনি
অমনি মুদিলি আঁখি—'

ইহার পর দাদাদের বৈঠকখানায় তাঁহার কণ্ঠের গান আমরা ভিতর হইতে শুনিয়াছি।···নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের রচিত আরো একটি গান তাঁহার প্রিয় ছিল—

'গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল
আঁধার আজি কুঞ্জবন—' "

উপরোক্ত উদ্ধৃতি দুটি থেকে শরৎচন্দ্রের প্রথম যৌবনের যে ছবিটি ফুটে ওঠে, তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়—বন্ধনহীন উদ্দাম জীবন-যাপনের আনন্দই ছিল তার চরিত্রের বিশেষত্ব।

এই জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো এফ.-এ. পরীক্ষা।

পড়াশুনায় অমনোযোগী শরৎচন্দ্রকে পিতার নিকটে অনেকসময় ভর্ৎসনা শুনতে হতো। কোনো কোনো দিন মতিলাল রেগে গিয়ে বলতেন—শোরো, এমনি করে তোর জীবন চলবে?

শরৎচন্দ্র জবাব দিতো অন্য সুরে। কখনো বা পিতার কথায় কর্ণপাত না করে ঘর ছাড়তো। মতিলাল একদিন বুঝিয়ে বললেন—শোরো, এফ.-এ. পরীক্ষার সময় তো হয়ে এলো, পড়িস কতক্ষণ?

শরৎচন্দ্র এবার বুঝতে পারলো, আর ফাঁকি দিলে চলবে না—পাস তাকে করতেই হবে।

কিন্তু কাব্য ও সাহিত্য-লক্ষ্মী যার ঘাড়ে চেপেছেন, তার মন চলে যায় সেই সাহিত্য-লোকে।

রাজুর পাল্লায় পড়ে যাত্রাদলে ভেড়া, গঙ্গায় ডিঙি-বাওয়া ইত্যাদির কথা ভাবতে গিয়ে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবার আশঙ্কা শরৎচন্দ্রের মনে এইসময় বদ্ধমূল হয়। ভালোছেলের মতো পরীক্ষার পড়া শুরু করে দিতে হলো। রাত জেগে পড়া, পড়ার মাঝে মাঝে ঘন ঘন তামাক খেয়ে চাঙ্গা হওয়া—এমনি করতে করতে একদিন টেস্ট-পরীক্ষাও দেওয়া হলো। তারপর আবার অমনোযোগী হয়ে পড়লো তরুণ শরৎচন্দ্র। আবার শুরু হলো লেখার পর লেখা। দেখতে দেখতে টেস্ট-পরীক্ষার খবর বেরুলো। শরৎচন্দ্র ভালোভাবে পাস করতে পারেনি। মতিলাল একদিন দুঃখ করেই বললেন—শোরো, তোর পরীক্ষার ফল ভালো হলো না!

শরৎচন্দ্র তাকালেন বাবার বিষণ্ণ মুখখানির দিকে। আত্মভোলা মানুষটি ব্যথায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন। সংসারের দিকে তাকাতে গিয়ে শরৎচন্দ্র দেখতে পেল তার বাবার কী দুঃখ। মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে ঘুম থেকে উঠে শরৎচন্দ্র চুপচাপ বসে থাকে আর ভাবে—বাবা আর ভাইবোনদের কথা। অনেক সময় চোখদুটি তার সজল হয়ে আসতো। বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস বেরুতো। কিন্তু দুঃখ বুঝলে কি হবে, তার স্বভাবে যেন দিন-দিন কেমন একটা ছন্নছাড়া উদাসী ভাবের প্রাবল্য জাগে। এইসব নানা কারণে মনের দুঃখে চিরকালের জন্য কলেজের পাট চুকিয়ে দিয়ে আবার তাকে আশ্রয় নিতে হলো সাহিত্য-লোকে। এইখানেই স্বস্তির নিশ্বাস। এইখানেই যত ভালবাসাবাসির পালা। হাসি-কান্না-বেদনা-ভরা বাস্তব তাকে হাত-ছানি দিয়ে ডাকলো—ঘর ছাড়ো, বাইরের পৃথিবীতে এসো! এইখানেই

আলো বাতাস—প্রাণরসের প্রাচুর্য-মেশানো জগৎ। আকাশের নক্ষত্র আর চাঁদের হাসি দেখে শরতের প্রাণে আবার নবীন বাঁশীর সুর বেজে উঠলো। সাহিত্য-সাধনায় বিপুল আগ্রহ নিয়ে শরৎচন্দ্র এলো সেই পুরনো বন্ধু-বান্ধব—বিশেষ করে বিভূতিভূষণ ভট্ট, তার বোন নিরুপমা দেবী, মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির মাঝে। 'কুঁড়ি সাহিত্যিক' নাম দিয়ে নূতন সাহিত্য-সভা শুরু হলো। তারপর শরৎচন্দ্রের প্রস্তাবে হাতে-লেখা পত্রিকা বের হলো ১৯০১ সালে। নামকরণ হলো—'ছায়া'। আর এই সাহিত্য-সভার অধিবেশন শুরু হলো ভাগলপুরের সরকারী স্কুলের বাঁধানো 'নালি'র মধ্যে পা ঝুলিয়ে বসে, কখনো বা মাঠে গাছতলায়। চেঁচামেচি, তর্কাতর্কি এগুলিও ছিল সাহিত্য-সভার অন্যতম অঙ্গ। শরৎচন্দ্র নিজে এ সম্বন্ধে লিখেছেন—"আমি ছিলাম সভাপতি, কিন্তু আমাদের সাহিত্য-সভার গুরুগিরি করিবার অবসর অথবা প্রয়োজন আমার কোন কালেই ঘটেনি। সপ্তাহে একদিন করিয়া সভা বসিত। জানা আবশ্যক যে, সে সময়ে দেশে সাহিত্যচর্চা একটা গুরুতর অপরাধের মধ্যেই গণ্য ছিল। এই সভায় মাঝে মাঝে কবিতা পাঠ করা হইত। গিরীন (মাতুল গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) পড়িতে পারিত সব চেয়ে ভাল। সুতরাং এ ভার তাহার উপরেই ছিল, আমার উপরে নয়। কবিতার দোষগুণ বিচার হইত এবং উপযুক্ত বিবেচিত হইলে সাহিত্য-সভার মাসিকপত্র 'ছায়া'য় তা প্রকাশিত হইত।"

ঠিক এইসময়ে কোলকাতার ভবানীপুর থেকে একখানা হাতে-লেখা পত্রিকা বের হতো। নাম তার 'তরণী'। সেই 'তরণী'র লেখক ছিল —উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। এরাই

ছিল 'তরণী'র কর্ণধার। ভাগলপুরের দল কোলকাতার বন্ধুদের কাছে 'ছায়া' পাঠাতো। আর কোলকাতার দল ভাগলপুরে পাঠাতো 'তরণী'। আবার উভয়ের কঠোর সমালোচনা প্রকাশ হতো সেই দুই পত্রিকায়। শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে যখন থাকতেন তখন কিভাবে হস্তলিখিত পত্রিকা 'ছায়া'র আত্মপ্রকাশ হয়, তার এক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু যোগেশচন্দ্র মজুমদার ১৩৬৪ সনের 'যুগযাত্রী'র জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যায় 'দিনলিপি (শরৎচন্দ্র)'-তে লিখেছেন ঃ

"হস্তলিখিত 'ছায়া' নামক মাসিকপত্রিকাখানি, যাহাতে শরৎচন্দ্র-রচিত নানা প্রবন্ধ ও গল্প সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়া খ্যাতিলাভ করে, তাহা সতীশচন্দ্রের স্মৃতির সহিত গ্রথিত। পত্রিকাখানির 'ছায়া' নাম দিবার একটু পূর্ব-ইতিহাস আছে, তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।...সতীশচন্দ্র [মিত্র] একখানি খাতা মাসিকপত্রিকা আকারে বাঁধাইয়া তাহার প্রচ্ছদপটে 'আলোক' নাম দিয়া আনিয়াছিলেন। সম্পাদকের স্থানে আমাদের যুগ্ম নাম ছিল। খাতাখানি দেখাইয়া বলিলেন, ইহার শূন্য পাতাগুলি ভরাইয়া তুলিতে হইবে। সাহিত্যরসিক বন্ধুবান্ধবদের উৎসাহ পাইলে পত্রিকাখানি স্বপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিবে এইরূপ আশাই সুদৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। 'আলোক' আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। একপক্ষ কালের মধ্যেই সতীশচন্দ্র দেহত্যাগ করেন। অল্পবয়স হইতেই তাঁহার যেরূপ সাহিত্য-প্রতিভা দেখিয়াছিলাম, মনে হয়, অল্পসময়েই তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন।

"...সতীশচন্দ্রের অকাল-বিয়োগের পর তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য আমরা ব্যস্ত হইয়া পড়ি। গিরীন্দ্রনাথ সতীশচন্দ্রের অভীপ্সিত মাসিকপত্রিকাখানি 'ছায়া' নাম দিয়া প্রকাশ করিবার প্রস্তাব

করেন। তাঁহার ও আমার যুগ্ম চেষ্টায় 'ছায়া' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৩০৭ সালে ১১ই বৈশাখ। পত্রিকাটি প্রকাশ হইবার পর শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের সাহিত্য-সভা পাকাপাকি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ২০শে শ্রাবণ ১৩০৭। এই সভার একটি অধিবেশনে আমার বহু আপত্তি সত্ত্বেও স্থিরীকৃত হয় যে, 'ছায়া'র সম্পাদনার কার্য আমাকেই করিতে হইবে। লেখা বাছাই ও সম্পাদনার অপ্রিয় কার্য করিতে মন সদাই বিমুখ হইত—কিন্তু কোন উপায়ও ছিল না। এই সময় হইতেই শরৎচন্দ্রের নিকট হইতে 'ক্রিটিক' আখ্যাটি লাভ করি। তাঁহার কয়েকটি গল্প ও প্রবন্ধ 'ছায়া'তে প্রকাশিত হয় তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। যতদূর মনে পড়ে, একখানি ছোট উপন্যাসও ('আলোছায়া'?) প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার বহুদিন আগে রচিত কয়েকটি লেখা এইসময় আমাদের খুবই কাজে লাগিয়াছিল।

"অল্পকালের মধ্যে 'ছায়া' ভাগলপুরের সাহিত্যিক মহলে বেশ সাড়া জাগাইয়া তুলে ও সুখ্যাতি অর্জন করিতে সমর্থ হয়। ইহার কিছু পরে কলিকাতা (ভবানীপুর) হইতে সতীর্থ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অনুরূপ একটি পত্রিকা 'তরণী' নাম দিয়া বাহির করেন। উভয় পত্রিকার ডাকযোগে আদান-প্রদান হইত।

"...শরৎচন্দ্র যদিও তাঁহার 'বাল্যস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন যে, সাহিত্য-সভা সপ্তাহে একবার করিয়া বসিত, আমার যতদূর মনে পড়ে, উহার নির্দিষ্ট কোনও দিন ছিল না। বিশেষ বাধা না পড়িলে উহা প্রায় প্রত্যহই ভাগলপুর জিলা-স্কুলের পিছনে যে প্রশস্ত ও পরিষ্কার Storm water drainটি ছিল, উহার পাড়ে বসিত। উহার নিকটেই স্কুলের Gymnasium; আমি প্রত্যহ বৈকালে এই স্থানে ব্যায়াম করিতে

যাইতাম। সভা বসিবার যেমন নির্দিষ্ট দিন ছিল না, তেমনি নির্দিষ্ট স্থানও ছিল না। কোনদিন ফুটবল খেলার মাঠে (Wace field) অথবা তাহারই সংলগ্ন বাল্যখিল্য টাউন হল—তাহার বাগানের একটি কোণে সভা বসিত।”

তাস-দাবার আড্ডা, থিয়েটারের রিহারশ্যাল আর সাহিত্য-সভার অধিবেশনের মধ্যে ডুবে শরৎচন্দ্র মনের দুঃখ ভুলতে চাইতো। কিন্তু বাড়ীতে ঢুকলে সে-দুঃখ আবার প্রবল হয়ে উঠতো। মতিলালের অবস্থা তখন এতই খারাপ যে, সংসার আর মোটে চলে না। শুধু ঋণের উপর সংসারটা যা-হোক খাড়া হয়ে আছে। আত্মভোলা মানুষটি সংসারের দুশ্চিন্তায় পীড়িত হয়ে পড়লেন। শরৎকে ডেকে দুঃখ করে মতিলাল বললেন—শোরো, আর যে পারিনা বাবা! এবার তুই যা-হোক একটা কাজ কর্।

পিতার আক্ষেপ। শরৎচন্দ্রের বুকে বড় বাজলো। ঠিক করলো, একটা চাকরি না জোগাড় করলে নয়। অগত্যা রাজবনেলী স্টেটে একটা চাকরি জুটিয়ে নিল শিবশঙ্কর সাউ-এর কাছে গিয়ে। শিবশঙ্কর সাউ আগে থেকেই শরৎচন্দ্রকে চিনতেন। তাকে সাদরে গ্রহণ করে বললেন—আপনাকে পেয়ে সত্যিই খুশী হলাম।

শরৎচন্দ্র বললেন—কি রকম শিবশঙ্করবাবু?

—আপনি অল্-স্কোয়ার। গান জানেন, থিয়েটার করতে পারেন। আদমপুর ক্লাবে আপনার ‘জনা’র অভিনয় খুব ভালো লেগেছিল।

রাজবনেলী স্টেটের জমিদার শিবশঙ্কর সাউ হলেন শরৎচন্দ্রের পরম বন্ধু। তাঁর সঙ্গে শিকার প্রভৃতি আনন্দে বেশ দিন চলছিল। হঠাৎ একদিন এক পাঞ্জাবী সন্ন্যাসী উপস্থিত হলেন। তিনি খুব ভালো হাত দেখতে পারেন। সকলেই হাত দেখালো, কিন্তু
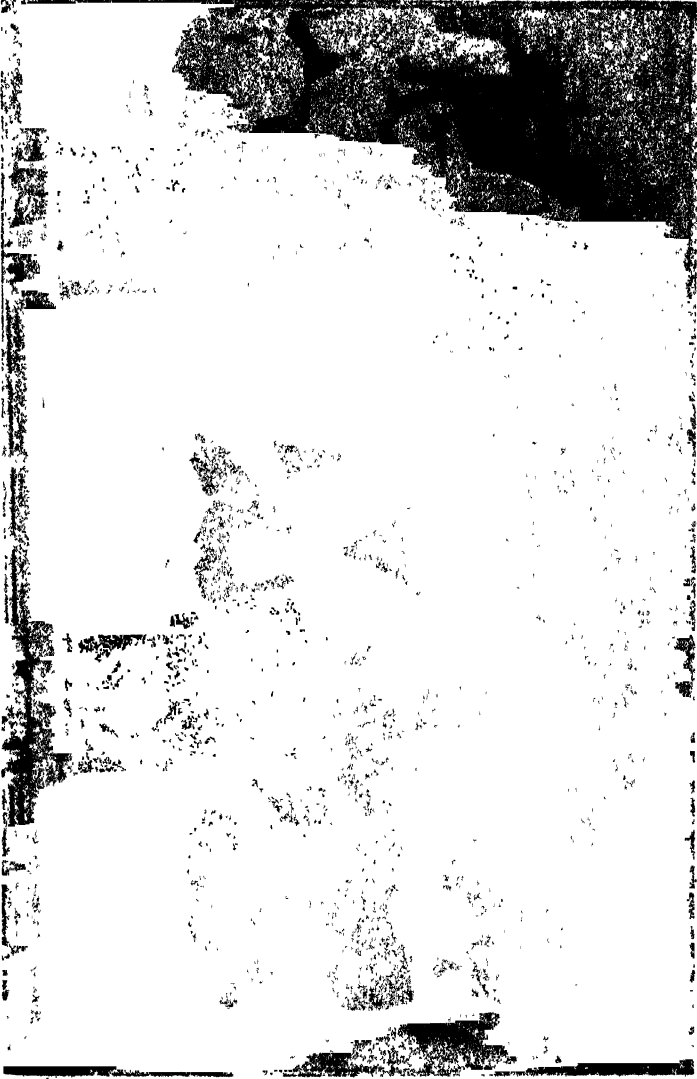
ভাগলপুরে 'আদমপুর ক্লাব'-এর সভ্যবৃন্দসহ শরৎচন্দ্র (তৃতীয় সারিতে সর্ববামে উপবিষ্ট)

শরৎচন্দ্র রাজী নয়। শেষ পর্যন্ত শিবশঙ্কর সাউ-এর পীড়াপীড়িতে শরৎচন্দ্রকে হাত দেখাতে হলো। সন্ন্যাসীটি শরৎচন্দ্রের হাত দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করে বললেন—তুই বেটা এক বড় আদ্‌মী হবি।

সকলে মুচকে হাসে। সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী কি সত্যই ফলবে? সন্ন্যাসীটি আরো বললেন—চল্লিশ বরষ পর তোর খুব নাম হবে—রাজা-কা মাপি নাম।···ষাট বরষ পর তোর একটা ফাঁড়া আছে নইলে বেটা অনেক দিন বাঁচতিস।

শরৎচন্দ্র সেদিন সন্ন্যাসীর কথায় কোনো আমল না দিলেও, উত্তরকালে ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল।

যার মন যাযাবর, তার কি সামান্য টাকার স্থায়ী চাকরি করতে ভালো লাগে? হঠাৎ একদিন চাকরিতে ইস্তফা দিতে হলো। ভালো লাগলো না পরের দাসত্ব, বন্ধনময় জীবন।

বন্ধুরা একদিন বললে—শরৎ, তুই চাকরি ছেড়ে দিলি?

—হ্যাৎ, ওসব ভালো লাগে না।

—তোর বাবার অবস্থা একটু ভাবিস না?

এদিকে মতিলাল ছেলের এই মতিগতি দেখে আরো দুঃখ পেলেন। যা হোক, কিছু আশা পেয়েছিলেন। সংসারে কিছু অর্থও আসছিল। খুব দুঃখ পেয়ে তাই বললেন—শোরো, চাকরি ছেড়ে ভবঘুরে হয়ে তোর লাভ?

—পরের দাসত্ব ভালো লাগলো না।

—তাই চাকরি ছেড়ে দিলি!

—হুঁ— ছোট্ট একটি কথা কয়ে শরৎ ঘর ছাড়লো। আবার সেই খেয়ালী মন মেতে উঠলো যাত্রা-থিয়েটার আর সাহিত্য-চর্চা নিয়ে। এই সময় ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকিল চন্দ্রশেখর সরকারের

বাড়ীতে 'বিল্বমঙ্গল' অভিনয় হলো। শরৎচন্দ্র 'চিন্তামণি'র আর রাজু 'পাগলিনী'র চরিত্রে অবতীর্ণ হলো। সেই রাত্রের অভিনয় শেষ করে রাজু যে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, এ পর্যন্ত তা কেউ জানতে পারেনি। শরৎচন্দ্র এই প্রিয়বন্ধুটির জন্য কম তুঃখ পেলেন না। 'শ্রীকান্তে' এই রাজুই 'ইন্দ্রনাথ' রূপে অমর হয়ে আছে।

এই সময়ে শরৎচন্দ্র গল্পলেখায় মন দিয়েছিল। একে একে স্থষ্টি হলো 'কাশীনাথ', 'অনুপমার প্রেম', 'কোরেল গ্রাম', 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ,' 'হরিচরণ', 'দেবদাস' ও 'বাল্যস্মৃতি'। 'শুভদা' নামে একখানি উপন্যাস অসমাপ্ত থেকে যায়।

দিনের পর দিন বয়ে যায়। সাহিত্য-কাননে প্রবেশ করেও শরৎচন্দ্র পিতার তুঃখ ঘোচাতে পারলো না। মতিলাল সব-কিছু লক্ষ্য করে একদিন ভর্ৎসনা করলেন। শোনা যায়, পিতার মূল্যবান পাথরগুলি শরৎচন্দ্র তার এক ধনী বন্ধুকে দিয়ে দেয়। এইসব ব্যাপার নিয়েই মতিলাল তরুণ শরৎচন্দ্রকে সেদিন ভর্ৎসনা করেছিলেন। যার ফলে শরৎচন্দ্র পিতার উপর অভিমান করে ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ হলো। নিরীহ মতিলাল পুত্রের কোনো হদিস পেলেন না।

মাঘের এক শীতের সকালে কপর্দকশূন্য মতিলালকে শ্বশুরালয়ে আসতে হলো খুড়শ্বশুর অঘোরনাথের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি তখন চাকরি-স্থান জলপাইগুড়ি থেকে নিজের বাড়ীতে কয়েকদিনের ছুটিতে এসেছিলেন। অঘোরনাথ মতিলালের তুঃখ দেখে বললেন—তুমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে কেন হে মতি ?

—ভালো লাগলো না, ছোটকাকা।

—এই শীতে গায়ের কাপড় নাওনি, ব্যাপারটা কি বল তো মতি ?

—অভাবের সংসারে তাও জোটে না, ছোটকাকা।

অঘোরনাথ সেদিন বলেছিলেন—হুঁ, তোমার অবস্থা দেখছি খুবই খারাপ।— তারপর আবার বলেছিলেন—শরৎ এখন করে কি ?

—সে নিরুদ্দেশ হয়েছে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে।

অঘোরনাথ আর থাকতে পারলেন না, দুঃখের সুরেই বললেন—সবই অদৃষ্টের পরিহাস, মতি ! ঐ ছেলেটাই তোমার একমাত্র ভরসা ছিল।

তারপর মতিলালের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন—এটা কাছে রাখ, মতি।

নিঃসম্বল মতিলাল অঘোরনাথের টাকা নিয়ে ফিরে এলেন বাড়ি।

শরৎচন্দ্র পিতার ওপর অভিমান করে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এলো এক সন্ন্যাসীর আখড়ায়। সেখানে কিছুদিন কাটলো। তারপর সন্ন্যাসীর বেশ নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হলো অজানার পথে। এমনি ক'রে ঘুরতে ঘুরতে মজঃফরপুরে এসে হাজির।

এই মজঃফরপুরে শরৎচন্দ্রের আগমনের এক বিচিত্র ঘটনার কথা জানতে পারা যায়। 'ভারতবর্ষে'র অন্যতম কর্ণধার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন :

"একদিন সন্ধ্যার সময় ক্লাবে তাঁদের দলবল মিলিত হলে—এমন সময় গেরুয়া-বসনধারী এক তরুণ সন্ন্যাসী এসে পরিষ্কার হিন্দী ভাষায় সবিনয়ে লিখবার সরঞ্জাম প্রার্থনা করলেন। ক্লাবের একটি ছেলে দোয়াত কলম এনে দিল। সন্ন্যাসী ঝুলির ভিতর থেকে পোস্টকার্ড বের করে ঘরের এক কোণে বসে নিবিষ্টমনে পত্র লিখতে

শুরু করলেন। ছেলেরা স্বভাবতই কৌতূহলী। ওরই মধ্যে দু'একজন আড়ালে দেখে নিল সন্ন্যাসী চমৎকার হরফে বাংলা পত্র লিখছেন। ক্লাবের মধ্যে একটা কানাঘুষা পড়ে গেল এই তরুণ সন্ন্যাসীটির পরিচয় নেবার জন্য। আমি ছিলাম এসবের অগ্রণী। এগিয়ে এলাম সন্ন্যাসী-ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করতে। বেশ পরিষ্কার বাংলাভাষায় বললাম—সন্ন্যাসী-ঠাকুর, আপনার নাম কি?

"সন্ন্যাসী-ঠাকুর, ওরফে শরৎচন্দ্র বললেন হিন্দী সুরে—বেহারী, দেহাতী লোক আমি।

"আমি বললাম—ছাতুখোর ভাষা ছাড় না বাবা, নিজের জাতভাষা ধর না। আমরা অনেকক্ষণ বুঝতে পেরেছি তুমি বাঙালী।"

শরৎচন্দ্র সেদিন মৃদু হেসেই পরিচয় দিলেন—তিনি বাঙালী সন্ন্যাসী। নাম শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঝুলির মধ্যে থেকে বের করলেন লেখার খাতা। আশ্চর্য হয়ে গেলেন প্রমথনাথ ভট্টাচার্য শরৎচন্দ্রের লিখনভঙ্গী দেখে।

ক্লাবে এতক্ষণ যারা শরৎচন্দ্রকে সন্ন্যাসী-ঠাকুর বলেই জেনেছিল, তারাও ক্রমশঃ আলাপ জমিয়ে নিল। তামাক এলো, চা এলো—নানা গল্পের মধ্যে এমনি এক মধুর সন্ধ্যায় সেদিনকার মতো সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শরৎচন্দ্র আবার পথে বেরিয়ে পড়লো।

তারপর শরৎচন্দ্র এক ধর্মশালায় ওঠে। এই ধর্মশালার সমস্ত লোকের মন হরণ করে নিয়েছিল শরৎচন্দ্র সুকণ্ঠের জন্য।

অনুরূপা দেবী লিখেছেন—"আমরা তখন ভাগলপুরে থাকি। আমার এক জ্ঞাতি খুড়ো আমাদেরই সমবয়সী—নাম অরুণ দেব। একদিন তাঁর পড়িবার ঘরে একখানি খাতা আবিষ্কার করিয়া বসিলাম। পাতা খুলিতেই দেখা গেল সেটা গল্পের খাতা। তাতে

অনেকগুলি গল্প লেখা ছিল। তাদের নাম—'বোঝা', 'অনুপমার প্রেম', 'বামুনঠাকুর', আর একটি কি তা মনে নাই। গল্পগুলি খুব ভাল না লাগুক, মন্দও লাগিল না। 'বামুনঠাকুর' গল্পটির করুণ রস মনকে গলাইয়া দিল। অরুণ কাকাকে বলিলাম—অরুণ কাকা, বাঃ, তুমি তো বেশ ভাল গল্প লিখিতে পারো? আমাদের দেখাওনি কেন? আর কিছু আছে? না, ঐ। সে বেচারী জন্মে গল্প লেখে নাই। অবাক্ হইয়া গিয়া অস্বীকার করিল। হাঁফ ছাড়িয়া বলিল—ও আমার এক বন্ধুর লেখা। আমার তো নয়। জেরা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—খাতাতে নামের কোন উল্লেখ তো দেখছি না। তা তোমার বন্ধুটির নাম কি?

"তিনি বলিলেন—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

"তারপর ঐ অরুণ কাকার দৌলতে শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় খাতা পাই। তাতে 'কোরেল গ্রাম' নাম দেওয়া একটা গল্প। মাঝারি ধরনের উপন্যাস বলা চলে। 'চন্দ্রনাথ' ও 'বড়দিদি' নামক রচনা দুটি খুব ভালই লাগিয়াছিল। এমনি অবস্থায় আমার স্বামীর মুখে শুনিয়াছিলাম, সেই অজ্ঞাতনামা লেখকটি আমাদের বাড়ীতে দুই মাস অতিথিরূপে ছিলেন। তিনি এক ধর্মশালায় তখন বাস করিতেছিলেন। হঠাৎ আমার দেবর নিশানাথ একদিন ঐ ধর্মশালার পাশ দিয়া যাইবার সময় এ অবাঙ্গালী দেশে একজন বাঙ্গালীর মুখে সঙ্গীত শুনিয়া ধর্মশালায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন একজন তরুণ সন্ন্যাসী ধর্মশালার ছাদে বসিয়া গান গাহিতেছেন। আমার স্বামীর গান-বাজনার খুব শখ ছিল। দেবর তা জানিতেন। অগত্যা সেই তরুণ সন্ন্যাসীটিকে বাড়ীতে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তরুণ সন্ন্যাসীটি নিজেকে বেহারী পরিচয় দিল। কিন্তু নিশানাথ একরূপ

জোর করিয়া আমার স্বামীর নিকট ধরিয়া আনিলেন। সেদিন সেই তরুণ সন্ন্যাসীটির গান গাহিয়া, অসহায় রোগীর সেবাকার্য করিয়া, মৃতের সৎকার ইত্যাদির জন্য মজঃফরপুরের এক জমিদারের সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁহার নাম মহাদেব সাউ। শরৎচন্দ্রের সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ দেখিয়া মহাদেব সাউ তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন।”

শরৎচন্দ্র এই মহাদেব সাউ-এর বাড়ীতে অবস্থান করেছিল বহুদিন। এখানে গান-বাজনা, শিকার আর সাহিত্যচর্চা নিয়েই তার দিন অতিবাহিত হতো। ‘শ্রীকান্তে’ এই মহাদেব সাউকে শরৎচন্দ্র ‘কুমারসাহেব’ নাম দিয়ে তাঁকে অমর করে রেখে গেছেন। এখানে শরৎচন্দ্র ‘ব্রহ্মদৈত্য’ নামে একখানি উপন্যাস লিখতে শুরু করে। মহাদেব সাউ-এর কাছে সেই পাণ্ডুলিপিটি ছিল ; পরে তিনি সেটা হারিয়ে ফেলেন। এই সময় অর্থাৎ ১৯০৩ সালের একদিন পিতার আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ শুনে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত কাতর ও বিপন্ন হয়ে মজঃফরপুর থেকে সাইকেলে চড়ে খঞ্জরপুরে আসে। মাতুল-গোষ্ঠীর কাছে কিছু অর্থসাহায্য চাইতে তাকে ভাগলপুরে যেতে হয়। সম্পর্কীয় মাতুল মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কিছু অর্থসাহায্য করলে, শরৎচন্দ্র কোনমতে পিতৃশ্রাদ্ধাদি করে।

নিঃস্ব শরৎচন্দ্রই ছিল সেদিনের তিনটি পিতৃমাতৃহীন নাবালক ভাইবোনের একমাত্র অবলম্বন। সে ব্যস্ত হয়ে উঠলো চাকরির জন্য। শেষে কলকাতায় চলে আসতে মনস্থ করলো,—যদি একটা কিছু হয়। কিন্তু ভাইবোনদের উপায় কি হবে? ভাবতেও চোখ ফেটে জল আসে। প্রভাসচন্দ্র তখন মাত্র পনেরো বছরের বালক। কনিষ্ঠ প্রকাশচন্দ্রের বয়স সাত কি আট। ছোটবোন সুশীলা, ওরফে

মুনিয়া আরো ছেলেমানুষ। এই মাতৃপিতৃহারা শিশু মুনিয়াকে খঞ্জরপুরের বাড়ীওয়ালার পত্নী খুব ভালবাসতেন। তিনি স্বেচ্ছায় মুনিয়াকে তাঁর কাছে রাখতে রাজী হলেন। পরে মুনিয়ার বিবাহ হয় আসানসোলের কয়লা-ব্যবসায়ী রামকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বড়বোন অনিলা দেবীর বহুপূর্বেই বিবাহ হয়েছিল; শরৎচন্দ্র দুই ভাইকে তাঁর কাছে রাখা প্রথমে স্থির করলো। কিন্তু সেখানে রাখা হলো না। আসানসোলে এক আত্মীয় রেলে চাকরি করতেন, প্রভাসচন্দ্রকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলে, তিনি প্রভাসকে টেলিগ্রাফের কাজ শেখাবেন ব'লে তাঁর কাছে রেখে দিলেন। সম্পর্কীয় মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতা অঘোরনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই সময় জলপাইগুড়িতে কাজ করতেন, সেখানে প্রকাশকে নিয়ে গিয়ে অনেক কাতর অনুনয় করবার পর তিনি রাখতে রাজী হলেন। তারপর কোলকাতায় সম্পর্কীয় মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট রিক্তহস্তে শরৎচন্দ্র হাজির হলো।

শরৎচন্দ্রকে দেখে উপেন্দ্রনাথ বললো—শরৎ, তুমি এখন কি কর?

—কিছু না। তোমার কাছে এলাম একটা চাকরির চেষ্টায়।

—ছ্যাখো, চাকরি হতে পারে এ-বাড়ীতেই।— উপেন্দ্রনাথ বললো।

—কি রকম?— শরৎচন্দ্র অবাক হয়ে বলে উঠলো।

উপেন্দ্রনাথ বললো—আমার বড়দাদার কোর্টের কাগজপত্র ও দলিলগুলির যদি অনুবাদের ভার নাও।

—বেশ, আমি তাই করবো, উপীন।

শরৎচন্দ্র এখানে সেই কাজে উঠে-পড়ে লেগে গেলো। উপেন্দ্রনাথের ভ্রাতা লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায় হাইকোর্টের একজন

নামজাদা উকিল। তাঁর মক্কেলগুলিও ধনবান। তিনি বললেন—বুঝলে শরৎ, কাজে মন দিলে বেশ পয়সা পাবে।

কাজের মানুষ হয়ে শরৎচন্দ্র ওখানে দিন যাপন করতে লাগলো।

১৯০৩ সালে বর্মা-যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে শরৎচন্দ্র 'কুন্তলীন পুরস্কার'-এর জন্য কিভাবে 'মন্দির' গল্পটি রচনা করেন সে-বিষয়ে তাঁর ভাগলপুরের বিশিষ্ট বন্ধু যোগেশচন্দ্র মজুমদার ১৩৬৪ সালের 'যুগযাত্রী' (শ্রাবণ-আশ্বিন) সংখ্যায় 'দিনলিপি (শরৎচন্দ্র)'-তে লিখেছেন—"তিনি ১৩০৯ সালে একবার 'কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতা'য় তাঁহার মাতুল সুরেন্দ্রনাথের নামে রচনা পাঠাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইহা হয়তো অনেকেই জানেন। তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার পর সব সময়ই দেখিয়াছি, তিনি নিজ নামে কিছু প্রকাশ করিতে একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। কি পরিবেশের ভিতর এই গল্পটি রচিত হয়, তাহা গিরীন্দ্রনাথের নিকট সেই সময় শুনিয়াছিলাম।

"সুরেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ তখন বহুবাজারের একটি বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। শরৎচন্দ্র প্রায়ই তাঁহার মাতুলদের বাসায় আসিতেন। এক ছুটির দ্বিপ্রহরে আহারের পর শরৎচন্দ্র সেই বাসায় আসিলেন। গিরীন্দ্রনাথ একাই বাসায় ছিলেন। দুইজনের ভিতর সাহিত্যালোচনা চলিতে লাগিল। কথাবার্তার মধ্যে স্মরণ হইল যে, কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য গল্প পাঠাইবার সেই দিনটিই শেষ দিন। গিরীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে প্রতিযোগিতায় গল্প লিখিবার জন্য ধরিয়া বসিলেন। গল্প তৈয়ারি হইলে সন্ধ্যার সময় উহা এইচ. বসু মহাশয়কে দিয়া আসিলেই চলিবে। এই অদ্ভুত আবেদনের উত্তরে

শরৎচন্দ্র কি বলিয়াছিলেন জানিনা। তবে তিনি সম্মত হইয়া বাজার হইতে কাগজ আনাইলেন এবং গল্প-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। গল্পটির নাম 'মন্দির'। উহা শেষ করিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। সন্ধ্যার সময় শরৎচন্দ্র ও গিরীন্দ্রনাথ কুন্তলীন আপিসে গল্পটি লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সব দোকানেই আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এইচ. বসু মহাশয়কে গল্পটি দেওয়া হইলে তিনি মন্তব্য করেন যে, শেষ দিনের শেষ মুহূর্তে গল্পটি তাঁহাকে দেওয়া হইল। এই মন্তব্য শুনিয়া শরৎচন্দ্র, আপত্তি থাকিলে, উহা ফেরত দিবার কথা বলেন। যাহা হউক বসুমহাশয় গল্পটি গ্রহণ করেন। এই গল্পটি শরৎচন্দ্র নিজ নামে প্রকাশ করিতে দেন নাই। তাঁহার মাতুল সুরেন্দ্রনাথের নামে উহা প্রকাশ করিতে দেওয়া হয়। এই ঘটনার পরেই তিনি বর্মায় চলিয়া যান।"

মাত্র ত্রিশটাকা মাইনেয় লালমোহনবাবুর নিকট চাকরি করা শরৎচন্দ্রের পোষালো না; বেশী মাইনের চাকরির সন্ধান চলতে লাগলো।

উপেন্দ্রনাথকে একদিন শরৎচন্দ্র বললো—উপীন, আমার একটা কথা রাখবে?

—কী কথা, বল?

—বলছিলুম আর কি, আমাকে যদি কিছু টাকা কর্জ দাও।

—টাকায় কি হবে?

—এখানে থাকতে আমার মন চাইছে না, উপীন। রেঙ্গুনে নাকি ভাগ্য ফেরে।

উপেন্দ্রনাথ মৃদু হেসে বললো—অচেনা মুল্লুকে গিয়ে কি ঠাঁই পাবে শরৎ?

শরৎচন্দ্র যুক্তি দেখিয়ে বললো—কেন? রেঙ্গুনে তো মাসিমা আছেন, আপাততঃ সেখানে গিয়ে উঠবো।

এমনি জল্পনা-কল্পনা করে শরৎচন্দ্র বর্মা-যাত্রা স্থির করলো। উপেন্দ্রনাথও একদিন লুকিয়ে রেঙ্গুনের জাহাজে শরৎচন্দ্রকে তুলে, হাতের মধ্যে পুরে দিয়ে এলো চল্লিশটি টাকা।

—উপীন, আসি।

—এসো।

—বেঁচে থাকি তো আবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে।

বিদায় নিলো শরৎচন্দ্র।

॥ পাঁচ ॥

বাংলার কোল ছেড়ে জাহাজে ভাসতে ভাসতে শরৎচন্দ্র সাতাশ বৎসর বয়সে রেঙ্গুনে উপস্থিত হলেন। সেটা ১৯০৩ সালের কথা। আজব শহর এই রেঙ্গুন। অদ্ভুত পথঘাট, বাড়ী ও মানুষ।

পথে কোনো বাঙালী ভদ্রলোককে দেখে শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন—আমায় একটা খোঁজ দিতে পারেন স্যার?

—কিসের খোঁজ?

—উকিল অঘোরবাবুর। কোথায় থাকেন তিনি?

—অঘোরবাবুর নাম শুনেছি বটে। কিন্তু কোথায় থাকেন, ঠিকানা তো বলতে পারি না।

বিদায় নেয় পথচারী।

এম্‌নি খুঁজতে খুঁজতে নানা লোকের মুখে নানা কথা শুনে শরৎচন্দ্র খোঁজ পেলেন অঘোরবাবুর বাড়ীর। ৫৬ ও ৫৬-এ লিউউইস

স্ট্রীটে। এইখানেই শরৎচন্দ্রের মাসিমা—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহোদরা ভগিনী অন্নপূর্ণা দেবী থাকতেন। বিশাল বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করে শরৎচন্দ্র থমকে দাঁড়ালেন। সাজানো-গোছানো বাড়িটি। সাহেবী কায়দায় সব জানলায় দামী পর্দা লাগানো। আসবাবপত্র প্রচুর। একজন বর্মী চাকর শরৎচন্দ্রকে দেখে এগিয়ে এলো। বর্মীভাষা শরৎচন্দ্র জানতেন না। অগত্যা কাগজে তাঁর নাম লিখে দিলেন।

একটু পরে অঘোরবাবু এলেন। অঘোরনাথ পরিচয় শুনে শরৎচন্দ্রকে বুকে টেনে নিলেন। বললেন—শরৎ, তুই? এসেছিস, ভালো করেছিস।

কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—এখন তুই করিস কি?

—কিছুই নয়। বাবা মারা গেলেন—। ভালো চাকরির অনেক চেষ্টা করলুম—তাও জুটলো না। তাই—

—তাই আমার এখানে এসেছিস? তোরা আমার আপন-জন। একশোবার আসবি।— অঘোরনাথ আনন্দের সঙ্গেই বলে উঠলেন।

এই সময়ে অঘোরবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী এলেন। শরৎচন্দ্র অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন তাঁর দিকে। তাকিয়ে থাকার উদ্দেশ্য ছিল—জ্যাকেট, সেমিজ, জুতো পরা বাংলাদেশে এমন বাঙালী মহিলা দেখেছেন কিনা সন্দেহ।

অঘোরবাবু বলে উঠলেন—অমন হাঁ করে দেখছিস কি শরৎ? ইনি যে তোর মাসিমা।

—মাসিমা!— অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন শরৎচন্দ্র। তারপর প্রণাম করে বললেন—কেমন আছেন মাসিমা?

—ভালো। তা তোরা সব ভালো তো ?

—অঘোরনাথ সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীকে বলে উঠলেন—ভালো থাকলে কি এই বর্মা-মুল্লুকে ও আসে ? মতি মারা গেছে !

শরৎচন্দ্রের চক্ষুদুটি সজল হয়ে আসে। স্নেহময় পিতাকে তিনি অনেক যাতনা দিয়েছেন, ভাবতে বড় কষ্ট হয়।

সব কষ্ট এখানে আনন্দের জীবন হয়ে বয়ে চললো। মাসিমারা তাঁর খুব বড়লোক। শরৎচন্দ্র এখন তাঁদের ঘরের ছেলের মতো।

অঘোরনাথ একদিন শরৎচন্দ্রকে ডেকে বললেন—কেমন দেশটা রে ?

—ভালো।— খুশীর সুরে বলে উঠলেন শরৎচন্দ্র।

—নূতন এসেছিস, ভালো তো লাগবেই। এখন কি করবি বল্ দেখি ?

—চাকরি।

—হুঁ, তুই যদি বর্মীভাষাটা শিখে নিতে পারিস ভালো হয়।

—কেন মেসোমশাই ?

—তাহলে তোকে অ্যাডভোকেট করে ছাড়তুম। বড়লোক হয়ে যেতিস।

উঠে-পড়ে লেগে গেলেন শরৎচন্দ্র বর্মীভাষা শিখতে। কিছুদিনের মধ্যে ভাষাটা আয়ত্ত করলেন শরৎচন্দ্র। অঘোরনাথ শরৎচন্দ্রের ভালো একটা চাকরির জন্যে এদিক-ওদিক চেষ্টা করতে লাগলেন।

মাসিমার একমাত্র কন্যার শরৎচন্দ্রকে খুব ভালো লাগতো—সময়ে অসময়ে শরৎচন্দ্রকে অস্থির করে তুলতো গান গাইবার জন্য। শরৎচন্দ্রকে মাঝে মাঝে তাই রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতে হতো।

এদিকে অন্নপূর্ণা দেবী কন্যার বিবাহের জন্য কোলকাতায় যাবার ব্যবস্থা করছিলেন।

শরৎচন্দ্র একদিন মাসিমাকে বললেন—হ্যাঁ মাসিমা, আপনি নাকি কোলকাতায় যাবেন?

—হ্যাঁ, বাবা। খুকির বিয়ের ব্যবস্থা না করলে নয়। আমি চলে গেলে ওঁকে একটু চোখে চোখে রাখিস, বাবা! ওঁর যেন কোনো কষ্ট না হয়।

এই সময়ে অঘোরনাথ শুভ-সংবাদ নিয়ে এলেন। অন্নপূর্ণা দেবীকে বললেন—শুনছো, শরতের একটা চাকরির ব্যবস্থা করে এলাম।

—কোথায় গো?

—বর্মা-রেলওয়ের এজেন্ট জনসন-সাহেবের আপিসে।

—মাইনে কত?

—পঁচাত্তর।

—তা মন্দ কি।

তারপর মাসিমা শরৎচন্দ্রকে বললেন—শুনলি তো শরৎ?

—ওই ভালো, মাসিমা। চাকরির বাজার বড় মন্দা।— শরৎচন্দ্র আনন্দের সঙ্গে বলে উঠলেন।

কিছুদিন পরের কথা। অন্নপূর্ণা দেবী কন্যাকে নিয়ে কোলকাতায় চলে এলেন। স্বামীর সেবার ভার শরৎচন্দ্রের হাতে দিয়ে তিনি স্বস্তি পেয়েছেন।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনের পরিবেশে সুখেই আছেন। কিন্তু বিধাতা-পুরুষ অন্তরালে মুচকে হাসলেন। চাকরির গদিতে বসবার আগের

সপ্তাহে অঘোরনাথবাবু অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। ডাক্তার এসে বললেন—নিউমোনিয়া। শরৎচন্দ্র উঠে-পড়ে সেবা করতে লাগলেন। কিন্তু ভাগ্যের এমন পরিহাস যে, মাত্র দু-তিনদিন রোগভোগের পর অঘোরনাথের মৃত্যু হলো।

মাসিমা খবর পেয়ে ছুটে এলেন রেঙ্গুনে। শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন তিনি। তারপর কিছুদিন পরে রেঙ্গুনের বাড়ির পাট চুকিয়ে যাত্রা করলেন কোলকাতায়।

মাসিমার জাহাজ ছেড়ে চলে গেলে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শরৎচন্দ্র আবার পথে এসে দাঁড়ালেন। নিরাশ্রয়ের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন দিনের পর দিন।

বহুদিন এমনি ঘুরতে ঘুরতে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বেশে গান গাইতে গাইতে উত্তর-ব্রহ্মে ঘুরে বেড়ালেন। তারপর ফিরে এলেন রেঙ্গুনে। এই সময়ে শরৎচন্দ্র দাঁড়ি-গোঁফ রাখেন। এমনি ক'রে গান গেয়ে-গেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে দেখে অনেকে তাঁকে মুসলমান বলে মনে করতো। এম্‌নি এক সময়ে অর্থাৎ ১৯০৫ সালে এক সদাশয় ব্যক্তির সাথে শরৎচন্দ্রের পরিচয় হলো। তাঁর নাম এম. কে. মিত্র, ওরফে মণীন্দ্রকুমার মিত্র। এঁর পিতা রামচন্দ্র মিত্র রেঙ্গুনে বড় সরকারী কর্মচারী ছিলেন। এই সদাশয় এম. কে. মিত্র শরৎচন্দ্রকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসেন। তারপর তাঁর সহায়তায় শরৎচন্দ্র ডেপুটি অ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেলের আপিসে পাবলিক ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টস বিভাগে প্রবেশ করেন। এম. কে. মিত্র মহাশয়ও এই আপিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তাঁর বাড়ি রেঙ্গুনের টমসন স্ট্রীটে ছিল।

এই আপিসটিতে বাঙালী কর্মচারীর সংখ্যা ছিল খুব বেশী।

শরৎচন্দ্র এইখানে অনেক বন্ধু পেলেন। প্রথম যেদিন তিনি আপিসে প্রবেশ করেন সেদিন মিত্রমহাশয় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দেন; যথা—যোগেন্দ্রনাথ সরকার, দাদামশাই, টি. এন. বসাক ওরফে ত্রৈলোক্যনাথ বসাক, কুমুদিনীকান্ত কর, নিশানাথ বসু (ইনি বর্তমানে জীবিত), বঙ্গচন্দ্র দে প্রভৃতি। দেখতে দেখতে আপিসে এই নূতন মানুষটির কদর ক্রমে বেড়ে উঠলো। শরৎচন্দ্র ভালো একজন গাইয়ে এ-কথা সবাই একদিন জানতে পারলেন।

শরৎচন্দ্র বন্ধুবান্ধবদের পীড়াপীড়িতে রেঙ্গুনের বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবের সভ্য হন। এই ক্লাবে রেঙ্গুন-প্রবাসী বাঙালীর দল সন্ধ্যা-মজলিসে ভিড় করে আসর জমিয়ে তুলতেন। শরৎচন্দ্রকে একদিন তাঁর আপিসের বিশিষ্ট বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ সরকার এই সান্ধ্য-মজলিসে হাজির করান। সেদিন বিশেষ কোনো জলসার অনুষ্ঠান ছিল না। বন্ধু-মহল গল্পে নিমগ্ন। বেশীক্ষণ গল্প চললো না। যোগেন্দ্রনাথ সরকার এইসময় বলে উঠলেন—এখন গল্প থাক্, শরৎদার গান শোনা যাক্। কি বল হে তোমরা?

ঘরসুদ্ধ সকলেই এই নবীন মানুষটির গান শোনবার আগ্রহ প্রকাশ করে চুপচাপ বসে রইলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—না হে সরকার, আজ থাক্। শরীরটা বড্ড খারাপ।

—সে কি কথা আপনার!—গান সবাই শুনতে চায়।

শরৎচন্দ্র সেদিন গান না গাইলেও, এই ক্লাবের অনুষ্ঠানগুলিতে পরে তাঁকে গান গাইতে হতো।

শরৎচন্দ্রকে চলে যেতে দেখে যোগেন্দ্রনাথ বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন—শরৎদা, চলুন-না দাদামশায়ের মেসে?

শরৎচন্দ্র বললেন—ও, আমাদের আপিসের দাদামশাই ? সরকার, বয়েসে আমাদের চেয়ে উনি অনেক বড়। উনি খুব মিশুকে। বেশ, তাই চল।

তুজনে আপিস-বাবুদের মেসে এলেন।

শরৎচন্দ্রের আগমনে দাদামশাই পিরীতের সুরে বললেন—এসো দাদা আমার! তা হঠাৎ কি মনে করে ভাই ?

শরৎচন্দ্র বললেন—সরকার টেনে নিয়ে এলো।

এখানে বঙ্গচন্দ্র দে নামে শরৎচন্দ্রের এক বন্ধু থাকতেন। তিনি বললেন—বেশ করেছে, এনেছে। শুধু মিত্তির মশাইয়ের বাড়ীতে ঠাঁই হলে চলে ? অন্য বন্ধুবান্ধব তো আছে।

শরৎচন্দ্র মৃতু হেসে বসলেন বিছানার উপর। যোগেন্দ্রনাথ এবার বলে উঠলেন—বাঙালী সোশ্যাল ক্লাব তো এটা নয়। আপনাকে গান শোনাতে হবে।

দাদামশাই বলে উঠলেন—গান গাইতে লজ্জা কি দাদা ? এখন লক্ষ্মী ছেলেটির মতো হারমোনিয়ামটা নিয়ে এসো তো।

শরৎচন্দ্র দ্বিমত করতে পারলেন না। হারমোনিয়ামটাকে বিছানার উপর নিয়ে বসলেন। তারপর সুমিষ্ট সুর-লহরীতে ক্ষুদ্র কক্ষটি পরিপূর্ণ হলো—

"শ্রীমুখপঙ্কজ—দেখবো বলে হে,
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিয়ো রাই চরণ-তলে।
মানের দায়ে তুই মানিনী,
তাই সেজেছি বিদেশিনী,
এখন বাঁচাও রাধে কথা কোয়ে,
ঘরে যাই হে চরণ ছুঁয়ে।

দেখবো তোমায় নয়ন ভরে,
তাই বাজাই বাঁশী ঘরে ঘরে।
যখন রাধে ব'লে বাজে বাঁশী,
তখন নয়ন-জলে আপনি ভাসি।
তুমি যদি না চাও ফিরে,
তবে যাব সেই যমুনা-তীরে,
ভাঙবো বাঁশী তেজবো প্রাণ,
এই বেলা তোর ভাঙুক মান।
ব্রজের সুখ রাই দিয়ে জলে,
বিকাইনু পদতলে,
এখন চরণ-নূপুর বেঁধে গলে,
পশিব যমুনা-জলে ॥"

সেই কক্ষটিতে যে ভীড় জমেছিল—সেখানে হাসির পরিবর্তে যেন অনাবিল অশ্রুর ঝরণা ব'য়ে চলেছে। গান শেষ হবার পর কত অনুরোধ, কত অনুনয়! দাদামশায়ের অনুরোধে শরৎচন্দ্রকে আরেকখানি গান শোনাতে হয়। তিনি এবার শরৎচন্দ্রকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন—হ্যাঁ ভাই শরৎ, এমন মধুর গলা তোর! এমন মধুর গান এ-শালার-দেশে কেউ গাইতে পারে? কি বল হে যোগেন সরকার?

যোগেন্দ্রনাথ বললেন—শরৎদার মান-অভিমান সত্যিই ভাঙলেন দাদামশাই! এবার রোজ শরৎদাকে আসতে হবে। রাজী শরৎদা?

শরৎচন্দ্র বললেন—তা মন্দ কি? গান শুনিয়ে যদি আপনাদের খুশী করতে পারি, এতে আর কিন্তু করা চলে না। আচ্ছা উঠি, দাদামশাই। আর একদিন আসবো।

দাদামশাই বাধা দিয়ে বললেন—একটু চা-টা খেয়ে যাবে না? শুধু-মুখে চলে যাবে দাদা?

শরৎচন্দ্র বললেন—না, থাক্ দাদামশাই—অনেক রাত হলো। মিত্রমশাই আমার জন্য হয়তো বসে আছেন।

শরৎচন্দ্র হাসিমুখে বিদায় নিলেন।

বাসায় ফিরতে একটু রাত হয়ে গেল। শরৎচন্দ্র দেখতে পেলেন, মিত্রমশাই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-দর্শন-অধ্যয়নে মগ্ন।

শরৎচন্দ্রকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন মিত্রমশাই—কোথায় ছিলেন শরৎবাবু? আপনার অপেক্ষায় সেই সন্ধ্যে থেকে বসে আছি।

শরৎচন্দ্র হাসিমুখেই একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন—জানেন মিত্রমশাই, আপিসের দাদামশাই সত্যি-ই ভালোমানুষ।

—হুঁ, উনি রেঙ্গুনে অনেকদিন কাটিয়ে গেলেন। তা ব্যাপারটা কি?

—ব্যাপার বলতে সন্ধ্যা-মজলিসে আসর জমানো। ওখানে গান আমাকে গাইতেই হলো।

মিত্রমশাই বললেন—বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি উনি, তা না গেয়ে কি আপনি পারেন? সে যাক্, এখন আমাদের মজলিসটা বসুক— ব'লে শরৎচন্দ্রের হাতে একখানি বই তুলে দিলেন।

শরৎচন্দ্র অবাক হয়ে বলে উঠলেন—এসব বই আপনি পড়েন মিত্রমশাই?

—তা পড়তে হয়। লিখতে পারি না, তবে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের দর্শন সমাজতত্ত্ব এগুলো না পড়লে মনের ক্ষুধা মেটে না। বিশেষ করে স্পেনসার, মিল, হেগেল আর ডিকেন্স-ই আমার সবচেয়ে প্রিয়। তা আপনার মতে কি?

—আমার মতে এঁরাই হলেন সত্যিকারের সাহিত্য-স্রষ্টা।

শরৎচন্দ্র আশ্চর্য হয়ে যেতেন মিত্রমশায়ের জ্ঞানস্পৃহা দেখে। নিজেও পড়তে আরম্ভ করলেন। শরৎচন্দ্রকে আমরা এখানে লেখার বদলে অধ্যায়নানুরাগী হতে দেখি। 'বার্নার্ড ফ্রী লাইব্রেরি' থেকে ইংরেজী সমাজনীতি, রাজনীতি ও দর্শন সম্পর্কীয় গ্রন্থ এনে পড়তেন। এই মিত্রমশায়ের মতো একজন সঙ্গী পেয়েছিলেন বলেই শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টি এত উচ্চস্তরের হয়েছিল।

একদিন আপিসে এসে যোগেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের হাতে একটুকরো কাগজ দিলেন। সেটা যে দাদামশাইয়ের চিঠি, শরৎচন্দ্র বুঝতে পারলেন। বললেন—দাদামশাই আজ যে আপিসে আসেননি ?

—না, ছুটি নিয়েছেন।

—আচ্ছা, ব্যাপারটা কি বল দেখি সরকার ?

—তা আমি জানি না। হয়তো কিছু দরকার আছে। বেশ তো, আজ শনিবার, একটু পরেই তো ছুটি হচ্ছে—তুজনে যাওয়া যাবে।

আপিসের ছুটির পর শরৎচন্দ্র দাদামশায়ের মেসে এলেন। বললেন—হঠাৎ বার্তা পাঠালেন কিসের জন্য দাদামশাই ?

বয়োবৃদ্ধ দাদামশাই রহস্যচ্ছলে বলে উঠলেন—ডেকেছি কি সাধে ? আগে কাছে এসে বোসো, তারপর বুড়ো দাদামশায়ের কথা শুনবে।

শরৎচন্দ্র দাদামশায়ের বিছানার উপর বসলে, দাদামশাই কাছে টেনে তেমনি রহস্যভরা কণ্ঠে বলেন—হ্যাঁ ভাই শরৎদা, সত্যি করে বলবি তো ?

দাদামশায়ের কথা-বলার ভঙ্গী শুনে ঘরসুদ্ধ সবাই হেসে ফেললে। মেসের এক বাবু, ডাক নাম তাঁর 'খুড়ো', তিনি বললেন—

দাদামশায়ের যদি কিছু প্রাইভেট 'টক্' থাকে তো, আমরা আগে থাকতেই সরে পড়ি।

অম্লমধুর স্বরে দাদামশাই বলেন—অত ব্যস্ত হবার কোনো প্রয়োজন নেই— ব'লে শরৎচন্দ্রকে বললেন—হ্যাঁ শরৎদা, শুনতে পেলাম আমাদের মিত্তির-সাহেবের সঙ্গে নাকি তোর খুব ভাব? সত্যি নাকি রে?

শরৎচন্দ্র বুঝেতে পারলেন এ-ডাকার অর্থটা কী। নিশ্চয় যোগেন্দ্রনাথের কাজ। বললেন—সরকার বলেছে বুঝি?

—না, ও বলবে কেন? কানে কথাটা সেদিন কে যেন বলে গেল। বল্ না, সত্যি কিনা?

দাদামশাই তেমনি রহস্যচ্ছলেই বললেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—সত্যি, দাদামশাই। তাঁরই সুপারিশে আপনাদের আপিসে চাকরি পেয়েছি। তাতে হলো কি দাদামশাই?

—ওমা, দাদার আমার রাগ ছাখো গো! বেশ করেছো ভাই— মিত্তিরের নজরে থাকা খুব ভালো। অমন ক'জনের বরাতে জোটে। সমস্ত আপিসের ফিরিঙ্গি-সাহেবগুলো ওঁকে ভয় করে।— তারপর একটু থেমে বললেন—কি বলব রে দাদা! দেখলে আজো আমার তাঁর আসল রূপটির কথা মনে পড়ে— ব'লে চুপ করে রইলেন।

শরৎচন্দ্র বলেন—চুপ করে রইলেন কেন দাদামশাই?

—চুপ আর কোথায় করলাম, দাদা— ব'লে ফরমাস করলেন দু'তিন কাপ চা। সকলের বরাদ্দ চা এলো। শরৎচন্দ্র পেলেন এক কাপ। চা খেতে খেতে শরৎচন্দ্র বললেন—একে অম্বলের রুগী, তার ওপর এই বোক্‌নো-বোঝাই চা। হয়েছে দফারফা এইবার!

—নে ভাই, স্থাকামো করিসনে— ব'লে একটুখানি চুপ করে থেকে

চা খেতে খেতে বলতে লাগলেন দাদামশাই—এই সামান্য চা কোথায় চোঁ মেরে উড়িয়ে দিবি তা নয়? যখন জলন্ধরের হরিশপুর অঞ্চলে ছিলুম, অমন বোক্‌নো-বোঝাই চা কত উড়িয়ে দিতুম। তা হয়তো তোরা বিশ্বাস করবিনে, ভাই।— চায়ে আবার চুমুক দিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন—আঃ, কী ঠাণ্ডায় সেখানে কফি খেতুম। পোড়া রেঙ্গুনে আর ভালোও লাগেনা ছাই। কি বলো মিত্রজা?— ব'লে আপিসের এক মেসবাবু মিত্রজার হাতে চায়ের কাপটা তুলে দিলেন।

মিত্রজা বললেন—সে কথা বলতে! একেবারে আমরা যেন আমসত্ত্ব মেরে গেলুম।

দাদামশাই এতক্ষণ পরে আশ্বস্ত হয়ে বলতে শুরু করলেন—ঠিক বলেছ, মিত্রজা। তবে শোন্ ভাই তোরা এই পোড়া দেশের কাণ্ডকারখানার কথা। ওরে ভাই রে! সে কি বলবো রে দাদা—এম্‌নি সময়ে চলেছি ইণ্ডাজের ধারে বরাবর দক্ষিণ-মুখো। সূর্যদেব লাল টক্‌টক্‌ করছে তখন। মনে করলুম সামনের ওই বাড়িগুলো ঘুরে দেখে আসি একবার। চলতে চলতে একটু পরেই সন্ধ্যে হয়ে এলো। কৃষ্ণপক্ষ কিনা? একেবারে যাকে বলে জমাট অন্ধকার। বলবো কি রে ভাই! আমার পেছনে মানুষের সাড়া পেতেই যেমনি ঘাড় ফিরিয়ে দেখি—ইয়া এক পাঠান-শালা আমাকে ধরবার জন্যে ছুটে আসছে। ভাগ্যিস আমার হাতে সেদিন রুল ছিল। আমি অম্‌নি মালকোঁচা মেরে দাঁড়িয়ে পড়লুম। পাঠান এক শালা আমার বাঁ হাতটা খপ্ করে ধরে ফেললো। যেই-না ধরা, রুলের বাড়ি শালার কব্জিতে এক ঘা। তারপর কুমড়োর মতো গড়াতে গড়াতে ইণ্ডাজের মধ্যে গিয়ে পড়লো। আর এক শালাকে এগিয়ে আসতে দেখে, তার লম্বা দাড়িটা ধরে বোঁ-বোঁ করে ঘোরাতে লাগলুম। সেই

হিন্দীবাদ : ছোড় দো। আমিও 'শালা, নেহি ছোড়ে গা' ব'লেই বন্‌বন্‌ করে তার দাড়ি ধরেই ঘোরাতে লাগলুম। তারপর দেখি দাড়ি ছিঁড়ে যেতেই সেও পড়লো সেই ইণ্ডাজের মধ্যে। ওমা, বাসায় এসে দেখলুম গা-ময় চুল আর চুল! উঃ, ভাবতেও গায়ে কাঁপুনি লাগে। সে কী দিন গেছিল রে দাদা— ব'লে থামলেন দাদামশাই।

ঘরসুদ্ধ লোকে হাসি সংবরণ করে দাদামশায়ের গল্প শুনছিলেন এতক্ষণ। এই সময় যোগেন্দ্রনাথ সরকার দাদামশাইকে বলে উঠলেন—এসব কথা আমার বিশ্বাস হয়না, দাদামশাই।

দাদামশাই বলেন—তা তোমাদের না হতে পারে। আমার কিন্তু হয়।

—তার মানে?— যোগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন।

শরৎচন্দ্র বলে উঠলেন—কথায় বলে 'গল্প-কথা'। দাদামশায়ের হোলো তাই। সময় কাটানো নিয়েই কথা। কি বলেন দাদামশাই?

দাদামশাই বললেন—তা তোরা যা বলিস বল্, আমি চললুম। দাদামশাইয়ের বিশাল দেহটা ঘরের আড়াল হলে তাঁর অলক্ষ্যে অনেক হাসি-বিদ্রূপ চলতে লাগলো।

শরৎচন্দ্র যখন মেস থেকে বাইরে এলেন তখন রাত হয়েছে। পথে নেমে বললেন—সরকার, তুমি তো এই বাঁয়ে যাবে?

—হুঁ। আপনি সোজা পথ ধরে যান— ব'লে যোগেন্দ্রনাথ বিদায় নিলেন।

মিত্রমশায়ের বাড়িতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল শরৎচন্দ্রের। মিত্রমশায় তখন একটা আরাম-কেদারায় শুয়ে একখানি বই পড়ছিলেন। বললেন—আজ অনেক দেরি করে ফেলেছেন, শরৎবাবু। সে যাক্, শুনেছেন কবিবর নবীনচন্দ্র সেন এই রেঙ্গুনে এসেছেন?

—কই না তো?

—আমরা তাঁর সম্বর্ধনার জন্যে আয়োজন করছি। আপনাকে গাইতে হবে। আগে থাকতেই বলে রাখছি।

—এই সম্বর্ধনার আয়োজনটা কোথায় হবে?

—বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবে। (এখানে শরৎচন্দ্র "ওহে জীবন-বল্লভ, ওহে সাধন-দুর্লভ" এই গানটা প্রায় গাইতেন।)

নবীনচন্দ্র সেনের সম্বর্ধনার ব্যাপার নিয়ে সেদিন আপিসে হৈ-হুল্লোড় পড়ে গেল। শরৎচন্দ্র গান গাইবেন এই নিয়ে কত না আনন্দ। কেউ কেউ বললেন আগে আপিস পালাতে হবে, নইলে শরৎদার গান শোনা যাবে না।

আপিসের কুমুদিনীকান্ত কর নামে এক ভদ্রলোক পূর্ব থেকেই জয়ধ্বনি করে উঠলেন—'শরৎদা কি জয়!' এইরকম চীৎকার শুনে ফিরিঙ্গি-সাহেব ল্যাজোরা ছুটে এলেন আপিস-ঘরে। লেজার-বুক্‌টা টেবিলের ওপর রেখে চীৎকার করে বলে উঠলেন—হোয়াট্‌স্ ছ্যাট্?

এই ফিরিঙ্গি-সাহেবটিকে সবাই ভয় করতো। আপিসে এঁর অত্যাচার কম নয়। আপিস-ঘর নিস্তব্ধ হলো। ল্যাজোরা-সাহেব চলে গেলে ফিসফাস শুরু হলো। কেউ কেউ বা তাকে অকথ্য গালাগালি দিল। শরৎচন্দ্র এই ফাঁকে আপিস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শরৎচন্দ্র আপিস থেকে একেবারে বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবে এসে উপস্থিত হলেন। সমস্ত হল-ঘরটি লোকজনে পরিপূর্ণ। উদ্বোধন-সঙ্গীত গেয়ে এক ফাঁকে বেরিয়ে গেলেন শরৎচন্দ্র। কবিবর নবীনচন্দ্র শরৎচন্দ্রের মুখে মধুর সঙ্গীত শুনে বলে উঠলেন—এমন সুন্দরভাবে

যে কেউ গাইতে পারে আমি জানতাম না। এ যে তোমাদের রেঙ্গুন-রত্ন! ওর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দাও।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর একজন শরৎচন্দ্রকে দেখতে পেলেন ক্লাবের ক্ষুদ্র একটি নির্জন কক্ষে।

তিনি বললেন—একি শরৎবাবু! নবীনচন্দ্র সেন মশায় আপনাকে ডাকছেন, চলুন একবার।

—কিসের জন্য?

—আপনার মুখে গান শুনে তো উনি পঞ্চমুখ! আপনাকে উনি একেবারে 'রেঙ্গুন-রত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। চলুন।

শরৎচন্দ্র কিছুতেই রাজী হলেন না। যশোলাভের পাত্র হওয়া তাঁর ধাতে সইলো না। বললেন—হৈ-চৈ করে এমনভাবে যশ কুড়িয়ে লাভ কি? আমাকে তোমরা মাপ কর।

এই সময়ে অর্থাৎ নবীনচন্দ্র সেনের সম্বর্ধনার কিছুকদিন পরে রেঙ্গুনে মহামারি আকারে প্লেগ দেখা দেয়। ১৯০৫ সনের কথা সেটা। এই প্লেগ সমগ্র রেঙ্গুনে ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এম. কে. মিত্র মশায়ের বাড়িতে কয়েকটি ইঁদুর মরলো। মিত্রমশায় স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অন্যত্র যাবার বন্দোবস্ত করলেন। শরৎচন্দ্র মিত্রমশায়ের বাসা-বদলের ধুম দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—মিত্রমশাই এসব পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে চললেন কোথায়?

—বাসা আমাকে ছাড়তে হবে, শরৎবাবু।

শরৎচন্দ্র বুঝতে পারলেন সব। বললেন—আজই যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ, আজই। আজ আমার বাসায় দুটি ইঁদুর মরেছে। কোথ থেকে কি এক বিভীষিকা জেগে উঠলো— ব'লে শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাস করলেন—আপনি এখন কোথায় উঠবেন ঠিক করলেন?

—আপিস-বাবুদের মেসে। সেখানে আমাদের বঙ্গচন্দ্র দে আছেন, অনেক জানাশুনা লোকও আছেন।

শরৎচন্দ্র আপিস-বাবুদের মেসে এসে উঠলেন। এই মেসে বঙ্গচন্দ্র দে নামে এক পণ্ডিত ব্যক্তি থাকতেন। তিনি রেঙ্গুনে চিন্তাশীল লেখক নামে সুপরিচিত। এই বঙ্গচন্দ্র ভদ্রলোকটির নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলায়। শরৎচন্দ্র এই বাঙাল বন্ধুটিকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি অত্যধিক পানাসক্ত ছিলেন। যেদিন মিত্রমশায়ের বাসা ছেড়ে মেসে উঠে এলেন শরৎচন্দ্র, সেদিন পরিহাস করে বঙ্গচন্দ্রকে ডেকে বললেন—ওরে বঙ্গচন্দ্র, তোদের মেসে তো এলাম। এখন অষ্টগণ্ডার ঠেলায় রক্ত-আমাশা না ধরাস!

বঙ্গচন্দ্রও পরিহাসচ্ছলে বললেন—ওরে, তুই আসবি বলে মেস থেকে আমরা লঙ্কার পাট চুকিয়ে দিয়ে এখন হিং আর গুড় চালাতে শুরু করেছি।

—বটে! তাহলে তোদের উন্নতি হয়েছে বল্? দেখিস, এখন তোদের পেটে সইলে হয়। ওরে ত্মাখ্, শুঁটকি-ফুঁটকি তো খাসনে মেসে?— ব'লে মুখ টিপে হাসলেন শরৎচন্দ্র।

ঘরসুদ্ধ লোকের মুখে হাসির রেখা দেখা দিল।

বঙ্গচন্দ্র একখানি ইংরেজি বই থেকে মুখ তুলে শরৎচন্দ্রকে বললেন—রামচন্দ্র! এখন থেকে শামুক-কেঁচো খেতে হবে। রেঙ্গুনে মাছের দর অনেক।

—কি বললি?— শরৎচন্দ্র বঙ্গচন্দ্রের কাছে এসে বললেন—কি বললি রে বঙ্গা? শামুক-কেঁচো কি রে?

—আরে, তোদের হুগলী অঞ্চলের লোকে যাকে পরম সমাদরে গুগ্লি বলে খায়। আমরা মুখ্যু বাঙাল মানুষ, ওকেই শামুক বলি।

—শরৎচন্দ্র গলার সুর চড়িয়ে বলে উঠলেন—মুখ্যু যে একশোবার সত্যি, আর বাঙাল যে সে-কথা দুশোবার সত্যি। শামুককে কি গুগ্‌লি বলে রে মুখ্যু? গুগ্‌লি বলে, ওর ভেতরে যেটা থাকে তাকে। বুঝলি রে বঙ্গচন্দ্র?

মেস-জীবন শরৎচন্দ্রের ভালো লাগলেও, এখানকার রান্না তাঁর শরীরে সহ্য হলো না। অম্ল অজীর্ণ ইত্যাদি রোগ দেখা দিল। একদিন বঙ্গচন্দ্রকে ডেকে বললেন—বঙ্গা, যা ভেবেছিলুম তাই হলো রে। তোদের রান্নাবান্না আমার সহ্য হলোনা। অন্য একটা মেস জোগাড় করেছি।

বঙ্গচন্দ্র অবাক হয়ে বললেন—ক'দিন-ই বা এলে, তারই মধ্যে মেস-বদল?

শরৎচন্দ্র এই মেস থেকে একদিন বিদায় নিয়ে অপর একটি মেসে উঠলেন।

এই মেসটি শরৎচন্দ্রের কাছে খুবই ভালো লাগলো। বোটাটং স্ট্রীটের এই মেসটি বৃহৎ একটি অট্টালিকায় ছিল। শরৎচন্দ্র থাকতেন তিনতলায়। এখানে এসে শরৎচন্দ্রের অনেক বন্ধু জুটলো। তাস দাবা আর গানে শরৎচন্দ্র জাঁকিয়ে তুললেন মেস-জীবন। এই মেসে সতীশচন্দ্র দাস নামে এক ভদ্রলোক থাকতেন। তিনি ভালো চাকরি করতেন রেঙ্গুনের এক সরকারী আপিসে। ইনি থাকতেন চারতলায়। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মেলামেশায় সতীশচন্দ্র শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু হয়ে পড়লেন। বহুদিন যাবৎ এই মেসে দুজনে অবস্থান করেছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ হওয়ায়, অবশেষে মেস ছেড়ে শরৎচন্দ্রকে আসতে হয় বোটাটং-পোজনডং মিস্ত্রী-পল্লীতে। এখানে

এসে ছোট্ট একটা বাসা ভাড়া করলেন। এখানে তিনি বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে রইলেন। গান-মজলিসের আড্ডা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শরৎচন্দ্র নীরব সাধনায় মত্ত হলেন। এখানে কবিতা লেখা, মাঝে মাঝে উপনিষদ্ পাঠ, আর লাইব্রেরি থেকে ডিকেন্সের বই নিয়ে এসে পড়া—এই হলো তাঁর সাধনা। এই বাসাটিতে যদি কেউ আসতো, তাঁরা হলেন যোগেন্দ্রনাথ সরকার ও ভূ-পর্যটক গিরীন্দ্রনাথ সরকার। আর আসতো মিস্ত্রী-পল্লীর লোকজনেরা। পাড়াতে মাঝে মাঝে নানান ঝগড়া-বিবাদ হতো। শরৎচন্দ্র তা মিটিয়ে দিতেন। কারো বা মনি-অর্ডার ফর্ম লিখে দিতেন। সবাই তাঁকে মান্য করতো এবং বামুনদা বলে ডাকতো। বামুনদা না হলে তাদের কোনো মীমাংসাই হতো না। শরৎচন্দ্রেকে ওরা যেমন ভালোবাসতো তেমনি ভয়ও করতো। আবার ছুটির দিনে বামুনদার পরিচালনায় খোল-করতাল নিয়ে নাম-সংকীর্তন হতো।

একদিন এলেন শরৎচন্দ্রের বাসায় আপিস-বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ সরকার। হঠাৎ তাঁর আগমন দেখে শরৎচন্দ্র বলে উঠলেন—আরে, সরকার যে !—আজ তুমি আপিসে যাবে না ?

—আপিস কামাই করে কি লাভ ? আপনার বাসার কাছেই এসেছিলাম, একজনের সঙ্গে দেখা করতে। ভাবলাম, শরৎদা আছেন কিনা দেখে যাই।

—বটে !

শরৎচন্দ্র তামাক সাজতে বসলেন। তারপর বললেন—ত্থাখো সরকার, এই মেস আর ঘরের তফাত কি বলতে পারো ?

—এসব আমরা বুঝিনে, দাদা। আপনার নিরিবিলি থাকা অভ্যাস। শহর থেকে এর দূরত্বই বা কত ? এক মিনিটে তো আসা যায়।

এম্‌নি নানা কথাবার্তার মধ্যে শরৎচন্দ্র যোগেন্দ্রনাথ সরকারকে বলে উঠলেন—সরকার, আজ আপিসে তোমায় একটা মজার জিনিস দেখাবো।

—মজার জিনিসটা কি শরৎদা ?

—আরে, আপিসে গেলেই দেখতে পাবে।

আপিসের সময় হলে দুজনেই চললেন আপিসে। এই অ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেল আপিসে ফিরিঙ্গি-সাহেবের উৎপাত ছিল ভীষণ। সেইজন্য শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাদের খুব বচসা হতো। উপরওয়ালা অনেকেই ছিল সাদা সাহেব। সময়মতো কাজকর্ম করে দিতে পারলেই সকলেই খুশী। শরৎচন্দ্র আপিসের কাজ যেমন করতেন, তেমন গল্পগুজবেও বেশী মেতে থাকতেন। সেদিন দাদামশাই, যোগেন্দ্রনাথ ও কুমুদিনীকান্তবাবুকে ডেকে বললেন—আজকে একটা ভারি মজা হয়েছে। বসাক এলে, তার দিকে তাকিয়ে দেখো—চিনতে পারো কিনা।

একটু পরেই একগাদা ফাইলপত্র নিয়ে বসাক মশায়ের প্রবেশ। ঘরসুদ্ধ লোক ব্যাপারটা যে কী বুঝতে পারলো না। শরৎচন্দ্র বসাক মশায়ের কাছে গিয়ে বললেন—বলি বসাক, আট-হাতী ধুতি তো এতদিন পরতে, আজ আবার খাকির হাফপ্যান্ট আর নীচে পট্টি জড়ানো। পায়ে বর্মার ফানার বদলে এডওয়ার্ড স্লিপার। গায়ে সনাতন কোটটির বদলে কুমিল্লা-ছিটের বুক-খোলা কোট। মাথায় পাগড়ির টুপি। বলি সরকার, এ যে দেখছি যাত্রার দলের মন্ত্রীর ড্রেস গো ! অ্যাঃ, দিনে দিনে বসাক আমাদের হলো কি ?

দাদামশাই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—ঠিক যেন মানিয়েছে লোহার কার্তিকটি— ব'লে শুদ্ধকথায় আবার বলে উঠলেন—না দাদা, ভুল

হয়েছে—ঠিক যেন বাঁকা শ্যামচাঁদটি। যাক্ গে, এ মোহন-বেশটি কিসের জন্য বল তো বসাক ?

শরৎচন্দ্র বলে উঠলেন—ওহো, বুঝতে পারছেন না দাদামশাই ? বসাক আজকে জুরী হয়েছে চীফ-কোর্টে।

দাদামশাই একগাল হেসে বললেন—বটে! খুনী মকদ্দমার নিশ্চয়। ছ্যাখ্ ভাই বসাক, বর্মা ব'লে ছাড়িস নে। সরাসরি 'গিল্‌টি' ব'লে বসবি।

ঘরসুদ্ধ লোকের হাসির বন্যা। বসাক মশায় নিজেকে খালাস করবার জন্য ফাইলপত্রগুলি টেবিলের উপর রেখে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। এই বসাক মশায় হলেন আপিসের বেয়ারা। এঁর আসল নাম—টি. এন. বসাক (ত্রৈলোক্যনাথ বসাক)।

টিফিনের ঘণ্টা পড়লে যোগেন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র একসঙ্গে বেরিয়ে এলেন কোর্ট-বাজারে কাকার চায়ের দোকানে। একটু পরেই এলেন বসাক মশায়। শরৎচন্দ্র চা খেতে খেতে বসাক মশায়কে বললেন—বসাক, তোমাকে ঠাট্টা করি ব'লে রাগ করোনা তো ?

—আরে, তোমাদের কথায় আমি কান-ই দিই না। এইতো আপিসের ল্যাজোরা-সাহেব আমাকে 'বৈসাক' ব'লে ডাকে। তাতে রাগেরই বা কি আছে ?

—হ্যাঁ, ল্যাজোরা তোমার পিরিতের লোক কিনা—তাই অমন করে তোমায় ডাকে! কি বল শরৎদা ?— যোগেন্দ্রনাথ বললেন বিদ্রূপের সুরে।

শরৎচন্দ্র বললেন—সত্যিকথা কি জানো বসাক ? ঐ ল্যাজোরা-সাহেবটা বড় দুর্মুখ। শালা কাজের নামে তো অষ্টরম্ভা! খালি খুঁত ধরে বেড়াবে কাজে।

বসাক বলে উঠলেন—ও শালা ঠিক সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে। একটু পরেই দেখতে পাবে। মরেও না আপদটা!

সত্যি-ই তাই। আপিসে ওঠবার সিঁড়ির মুখেই ল্যাজোরা-সাহেব দাঁড়িয়ে। এক হাতে খানকয়েক মোটা খাতা এবং ছাতা বগলে রেখে একটা প্রকাণ্ড বর্মাচুরুট ধরিয়ে পাইচারী করছিল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলে উঠলো—হ্যালো বৈসাকবাবু!

সকলে একটু সচকিত হয়ে পড়লেন। বসাক মশাই কোনো কথা না ব'লে ওপরে উঠে যাচ্ছিলেন, শরৎচন্দ্র ও যোগেন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে ল্যাজোরা-সাহেবের অপূর্ব ইংরেজী ভাষা-প্রয়োগ শুরু হলো—হ্যালো ব্রাদার! আই সী—ইউ আর অল ফ্রী দি ট্রাবলস্। ···ড্যাম ননসেন্স, কচ্ড়া ওয়ার্ক। ও হেল্! দেয়ার ইজ নো হেণ্ড (এণ্ড) অফ ইট···ইত্যাদি। এই অপরূপ ভাষায় আপিসের বড়বাবু, পেয়াদা পর্যন্ত কারুকেই বাদ দিল না। শরৎচন্দ্র কোনমতেই আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না; রাগে গজগজ করতে করতে উপরে উঠে গেলেন।

খানিকক্ষণ পরেই শরৎচন্দ্র একটা ফাইল নিয়ে নীচে নামার মুখেই ল্যাজোরা-সাহেবকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন। এবার আর পদচারণা নয়। একটা চেয়ার-শূন্য টেবিলের ওপর বসে বড়রকমের একটা যোগ করছিল। না পেরে, মাঝে মাঝে—হোয়াট সাম্, বিগ সাম্, ভেরি বিগ্ সাম—ইত্যাদি কথার প্রয়োগ। শরৎচন্দ্র মুখ টিপে হাসছিলেন। এবার কাছে এসে বললেন—হোয়াট ইজ দি বিগ্ সাম, ল্যাজোরা— ব'লে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ল্যাজোরা-সাহেব আর কোনো কথা না বলে শরৎচন্দ্রের হাতে খাতাটি তুলে দিলে। শরৎচন্দ্র কয়েক মিনিটের মধ্যে অঙ্কটা কষে

বের করে দিলেন। কিন্তু ল্যাজোরা-সাহেব রেগে বলে উঠলো—হোয়াট এ ননসেন্স ইজ্ দিজ্ চ্যাটার্জী? আন্সার ইজ ওন্লি হাফ? ছাট ক্যান্নট বি, ব্রাদার। ইট ইজ কোয়াইট অ্যাবসার্ড। টোট্যাল ক্যান্নট বি সাচ এ স্মল সাম।

শরৎচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন—ছাট ইউ বেটার ব্রেক ইয়োর হেড আপন ইট।

আর কোনো কথা না ব'লে শরৎচন্দ্র নিজের কাজে চলে গেলেন।

এদিকে ল্যাজোরা-সাহেব আপিস-বাবুদের কাছে অঙ্কটি ঠিক হয়েছে কিনা তা দেখাবার জন্য ছুটে গেল। অঙ্কটি ঠিক হয়েছে বললে, ল্যাজোরা-সাহেবকে আবার আসতে হলো সেই সিঁড়ির মুখটার কাছটিতে। একটু পরেই শরৎচন্দ্রকে ফিরতে দেখে ল্যাজোরা-সাহেব দু'হাত উপরে তুলে বলে উঠলেন—চ্যাটার্জী, ইউ আর গুড।

এই আপিসটির প্রধান কাজ হচ্ছে ঘন ঘন ফাইলপত্র দেখানো বড়-সাহেবদের কাছে গিয়ে। শরৎচন্দ্রকে অনেক সময় উপর-নীচ করতে হতো।

আপিস আর ঘর। গান-বাজনার আসর আর নেই। শুধু বই-পড়া আর ঘন ঘন তামাক খাওয়া। শরৎচন্দ্রের জীবন এম্নি ভাবেই চলতে লাগলো।

একদিন আপিস-বাবুদের মেস থেকে এক ভদ্রলোক এলেন শরৎচন্দ্রের বাসায়। তিনি বললেন—বঙ্গচন্দ্রবাবুর ভারি অসুখ। আপনাকে একবার দেখা করতে বলেছেন।

এই কথা শুনে শরৎচন্দ্র আর থাকতে পারলেন না। একটা রিক্সা ভাড়া করে ছুটলেন আপিস-বাবুদের মেসে। মেসে গিয়েই শুনতে

পেলেন বঙ্গচন্দ্রের কাতর আর্তনাদ। জিজ্ঞাসা করলেন—ডাক্তার-বদ্যি দেখিয়েচিস ?

—না। অমন পেন্ মাঝে মাঝে হয়।

শরৎচন্দ্র বুঝতে পারলেন এই অসুখটি কী। অতিরিক্ত পানাভ্যাসের দরুন তার এই অবস্থা। একটু গম্ভীরভাবেই বললেন শরৎচন্দ্র—তোর এমন অবস্থা হবে আগেই জানতুম। ওসব ছাইপাঁশ বেশী না খাওয়াই ভালো।

—না খেয়ে উপায় কি ?

—তবে মর্!— শরৎচন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন—দাঁড়া, একটা ডাক্তার ডেকে আনি।

ডাক্তার এলো। রোগ সাংঘাতিক। পেটে টিউমার হয়েছে। ডাক্তারের মুখের কথা শুনে শরৎচন্দ্র আর বাসায় গেলেন না। উঠে-পড়ে লেগে গেলেন এই বাঙাল-বন্ধুটির সেবায়। বঙ্গচন্দ্রের এই ঘরটিতে যাঁরা থাকতেন সবাই সরে পড়েছেন। এই বিপদের দিনে শরৎচন্দ্রই হলেন তাঁর একমাত্র বন্ধু ও শুশ্রূষাকারী।

বঙ্গচন্দ্র একটু সুস্থ হলে, শরৎচন্দ্র তাঁর বাসায় তাঁকে নিয়ে এলেন। একটা তোলা-উনুন কিনে স্থায়ী রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করলেন। এই সময় বরাবর একদিন যোগেন্দ্রনাথ সরকার এলেন। শরৎচন্দ্রকে হাতে চিমটা নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চীৎকার শুরু করতে দেখে বলে উঠলেন—একি শরৎদা!—সন্নাসী হলেন নাকি ?

শরৎচন্দ্র বললেন—তাই বটে সরকার!— তারপর ঘরের মধ্যে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন—বঙ্গার ব্যাপারখানা ছাখো একবার !

যোগেন্দ্রনাথ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন অর্ধশায়িত অবস্থায় বঙ্গচন্দ্রকে। বললেন—ব্যাপার কি বঙ্গবাবু ?

বঙ্গচন্দ্র ফিক্ করে হেসে বললেন—আপনার শরৎদার কাণ্ড! কতবার বলেছি যে, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা যায় না। উনি তা শুনবেন না। আমার জন্য গিয়েছেন জল গরম করতে। একবার জল গরম করতে উনি উনুন নিভোলেন। আরেকবার পুড়তে-পুড়তে বেঁচে গেলেন।

যোগেন্দ্রনাথ বললেন—সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ, বেচারী পায়ে সামান্য একটু গরম জল ফেলে দিয়েছেন তাতে দোষ কিছুই নেই। বুদ্ধিমান লোকের লক্ষ্যই হচ্ছে সকলের আত্মরক্ষা, তারপর দুনিয়াদারী।

বঙ্গচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন—আত্মানং সততং রক্ষেৎ।

যোগেন্দ্রনাথ সঙ্গে-সঙ্গেই বললেন—ধনৈরপি দারৈরপি চ।

বঙ্গচন্দ্র বললেন—ওই দুটির যা অভাব।

এমন সময় শরৎচন্দ্র বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন—ওরে বঙ্গা, তুই বেটা এবার নিজে মরবি আর আমাদেরও মারবি! অত গলাবাজি করিসনে—বুক ফেটে মারা যাবি রে হতভাগা!

বঙ্গচন্দ্র ছাড়বার পাত্র নন। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন—ওরে, মরি তো আগে, তারপর তোর সহ্য না হলে সহমরণেই যাস।

বঙ্গচন্দ্রের কথার ধরন শুনে শরৎচন্দ্র গরম জলের ডেক্‌চি নিয়ে ঘরে ঢুকে বললেন—থাম্ বঙ্গচন্দ্র, আর রসিকতা করিসনে। তোর জ্বালায়— ব'লে টেবিলের ওপর গরম জলের ডেক্‌চিটা রেখে বঙ্গচন্দ্রের কাছে এসে বললেন—মরিটা আবার কি রে? সারাদেশে আর নাম খুঁজে পাওয়া যায় না! বুঝলে সরকার, কেবল ওই জগৎচন্দ্র,

পূর্ণচন্দ্র, অপন্নাচরণ—ইনি আমাদের এককাটি সরেস—বঙ্গচন্দ্র। মাদ্রাজীদের যেমন কথা বুঝিনে, তোরও তেমনি কথা বুঝিনে। বাঙাল তোদের ওই জন্যেই লোকে বলে রে!—তারপর একটা তোয়ালে ভিজিয়ে গরম জলের সেঁক দিতে লাগলেন বঙ্গচন্দ্রের তলপেটে।

যোগেন্দ্রনাথ বললেন—আপনি আছেন ব'লে বঙ্গবাবুর সেবা হচ্ছে। নইলে বেচারীর অনেক কষ্ট হতো।

শরৎচন্দ্র বললেন—কষ্ট তো ও এম্‌নিতেই পাচ্ছে। ওকে কত বলেছি, ওসব খাসনে। বলে কি জানো, সরকার? না খেলে ইন্‌স্পিরেশন পাইনে।

যোগেন্দ্রনাথ মৃদু হেসে বললেন—আমরা কিছু বুঝিনে বঙ্গবাবুর ব্যাপারখানা।

একটু পরেই শরৎচন্দ্র বারান্দায় এসে সাবুর একটা বাটি এনে টেবিলের ওপর রেখে বললেন—এই সাবু রইলো—খাস। তোর জন্যে লেট্ ক'রে-ক'রে আপিসে গালমন্দ খাচ্ছি।—চল সরকার, এবার বেরিয়ে পড়া যাক্।

নিয়তির এম্‌নি খেলা যে, হাজার সেবা-যত্নের মধ্যেও বঙ্গচন্দ্রের মৃত্যু হলো অল্পদিনের মধ্যেই। বঙ্গচন্দ্রের মৃতদেহটাকে কোলের কাছে নিয়ে চোখের জলে বুক ভাসাতে যাঁরা দেখেছিলেন শরৎচন্দ্রকে, শতমুখে স্বীকার করেছিলেন—শরৎচন্দ্র মানুষ না দেবতা!

বন্ধুমহলের গণ্ডী ক্রমশঃ সীমাবদ্ধ হয়ে এলো শরৎচন্দ্রের। চুকিয়ে দিলেন হাসিঠাট্টা, মেলে ধরলেন লেখার খাতা। উপনিষদের পাঠ নিতে শুরু করলেন রাতের স্তব্ধতায়। শরৎচন্দ্রের ভাগ্যদেবতা যাকে

সুখদুঃখের কষ্টিপাথরে যাচাই করতে চান—তাকে এমনি করে পুড়িয়ে অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রে আরো মহৎ করে তুলতে চাইলেন।

এই বাসাটি নির্জন হলেও, নীচে থাকতেন একজন মিস্ত্রী। বাঙালী ব্রাহ্মণ। সংসারে তাঁর একটি মাত্র কন্যা। মেয়ের বিবাহের বয়স হয়েছে, অর্থের অভাবে বিয়ে দিতে পারছেন না তিনি। ব্রাহ্মণের পদবী ছিল 'চক্রবর্তী'। এই চক্রবর্তী লোকটি কিন্তু ভালো নয়। ইলেকট্রিকের কাজ করে যা অর্থ উপায় করতেন, সবই মদ খেয়ে নষ্ট করতেন। তাঁর দুষ্ট বন্ধুবান্ধব ছিল অনেক। রাত্রে তারা প্রায় আসতো—মদ খেতো, হৈ-হুল্লোড় করতো। শরৎচন্দ্র সবই দেখতেন, কিন্তু কিছু বলতে পারতেন না। এই চক্রবর্তী মিস্ত্রী এক মাতাল বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার করেছিলেন; বন্ধুটি একদিন রাত্রে মদ খেয়ে চক্রবর্তীকে বললে—ওহে, তুমি যদি আমার টাকা না দিতে পারো, তোমার মেয়েটিকে তবে দাও। আমি বিয়ে করবো— ব'লে চক্রবর্তীর মেয়ে শান্তির দিকে এগিয়ে গেল। অসহায় শান্তি কাঠের সিঁড়ি বেয়ে শরৎচন্দ্রের ঘরের ভিতর প্রবেশ করে দরজায় খিল তুলে দিল।

শরৎচন্দ্র সেই সময় বাড়ি ছিলেন না। রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে দেখলেন দরজা বন্ধ। ভাবলেন, হয়তো চোর। দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললেন—ভিতরে কে?

একটু পরেই ভিতর থেকে জবাব এলো—আমি, আমি শান্তি।

তারপর দরজা খুলে শান্তি বেরিয়ে এলো। চোখে তার দুঃখের অশ্রুধারা।

শরৎচন্দ্র ঠিক বুঝতে না পেরে বললেন—হঠাৎ আমার ঘরে! ব্যাপার কি শান্তি?

—আপনি আমাকে বাঁচান !— শরৎচন্দ্রের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়্‌লো শান্তি।

—এত ভয় কেন তোমার ? হয়েছে কি ?

শান্তি তখন ভয়ে কাঁপছিল। বললে—বাবা আমায় ঐ ঘোষাল মাতালটার সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়। টাকা ধার নিয়েচে—তাই।

—বটে ! আচ্ছা, তুমি আজ রাত্রে আমার ঘরে থাকো। কাল সকালে যাহোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

শরৎচন্দ্র বাসা ছেড়ে সেই রাতটা আপিস-বাবুদের মেসে কাটালেন।

পরদিন সকালে এসে চক্রবর্তীর ঘরে ঢুকলেন। চক্রবর্তী তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। গম্ভীর স্বরে ডাক দিলেন শরৎচন্দ্র—চক্কোত্তি, ও চক্কোত্তি ?

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে চক্রবর্তী বললেন—কি হয়েছে ? অত চ্যাঁচাচ্ছো কেন হে বাপু ?

—বলি, বুড়ো হয়ে তো মরতে বসেছো! ভীমরতি না হলে, মেয়েটাকে ক'টা টাকার লোভে জলে ফেলে দিচ্ছ ? ছিঃ চক্কোত্তি, ছিঃ!

চক্রবর্তী এবার উঠে সরোষে বলে উঠলেন—কেন দেব না? মেয়ের আমার বয়েস হয়েছে। ঘোষাল মাতাল হলে কি হবে, টাকা-পয়সার জোর আছে।

—বটে ! বিয়ে অন্য জায়গায় দিতে পারো না ? ঘোষালের টাকা আছে, মুখে ও-কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না ?

—লজ্জাটা আবার কি দেখলে হে ? বলি, অতই যদি তোমার মায়া-দয়া দাদাঠাকুর, তুমিও তো বামুনের ছেলে, গলায় যজ্ঞোপবীত রয়েচে—মেয়েটাকে বিয়ে করে এ গরীবের জাত-কুল বাঁচাও না !

চক্রবর্তীর কথাটা শোনামাত্রই স্তব্ধ হয়ে গেলেন শরৎচন্দ্র। সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেল তাঁর কাছে। কিছুক্ষণ পরে বললেন—তাই করতে হবে হয়তো শেষকালে—ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন শরৎচন্দ্র।

শেষপর্যন্ত শরৎচন্দ্র এই শান্তিদেবীকেই বিবাহ করেন। এই বিবাহে কোনো বন্ধুবান্ধব এলেন না। পরদুঃখকাতর, কোমলপ্রাণ, ছন্নছাড়া শরৎচন্দ্র হলেন সংসারী। জীবন-পথিক এমনি করেই ধরা পড়লেন মায়ার বন্ধনে। মেয়ের বিবাহ দিয়ে নিবারণ চক্রবর্তী কোথায় যে বিদায় নিলেন তার সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ছোট্ট ঘরে ছোট্ট এক সংসার। শরৎচন্দ্রের জীবনে এলো শান্তিশ্রী। শরৎচন্দ্র একদিন শান্তিদেবীকে বললেন—তুমি সুখী হয়েছো শান্তি ?—লজ্জায় শান্তিদেবী কিছুই বলতে পারলেন না।

এমন এক মধুর সন্ধ্যায় স্বামী-স্ত্রীর আলাপ চলেছে—সেই সময়ে ভূপর্যটক গিরীন্দ্রনাথ সরকার বাইরে থেকে ডাক দিলেন—শরৎদা আছেন নাকি ?

শরৎচন্দ্র নেমে এলেন নীচে। বললেন—কে ও ? গিরীন নাকি হে ? আরে এসো, ওপরে চল।

—না দাদা, ওপরে যাবো না।—ব'লে একটু থামলেন। তারপর চুপিচুপি বললেন—আচ্ছা দাদা, আপনাকে আজকাল কই দেখতে পাইনে তো ?

শরৎচন্দ্র বললেন মৃদু হেসে—সময় পাইনে। আপিস থেকে ফিরে এই ঘরেই আসতে হয়। ও একা থাকে।—ছেলেমানুষ।

গিরীন্দ্রনাথ হেসে বলে উঠলেন—আপনি দেখছি মহা স্ত্রৈণ, শরৎদা।

—তাই নাকি হে গিরীন? বেশ বেশ, তোমার কথা শুনতে ভারি মিষ্টি লাগলো। দাঁড়িয়ে কেন, ওপরে চল—

—না দাদা, আজ থাক।

বিদায় নেন গিরীন্দ্রনাথ সরকার।

শরৎচন্দ্রের এই ৩৬নং মিস্ত্রী-পল্লীর বাসায় ভূপর্যটক গিরীন্দ্রনাথ সরকার মাঝে মাঝে আসতেন। এখানে চলতো নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা।

এই মিস্ত্রী-পল্লীতে এক ঘটনা ঘটেছিল। একদিন এক বিধবা মহিলা কাঁদতে কাঁদতে এসে বললেন—বামুনদা গো, শীগ্‌গির চল, আমার ছেলেটা কেমন করছে।

শরৎচন্দ্র বললেন—কি হয়েছে তোমার ছেলের? অত কান্নাই বা কেন?

—বামুনদা, ক'দিন ধরে ছেলেটার জ্বর ছাড়ছে না। আজ বাছা আমার কেমন যেন করছে। চল বামুনদা, একবার চল!

বিধবা স্ত্রীলোকটির আর্তনাদ শুনে শরৎচন্দ্র আর থাকতে পারলেন না, তাঁর হোমিওপ্যাথি-ওষুধের বাক্সটা নিয়ে সোজা চলে এলেন বিধবাটির ঘরে। এসে দেখতে পেলেন একটা দড়ির খাটের ওপর শুয়ে এক যুবক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ছটফট করছে। শরৎচন্দ্র এ রোগের চিকিৎসা করতে পারলেন না। বললেন—আমার দ্বারা এ রোগের চিকিৎসা হবে না। টাকা দিচ্ছি, ডাক্তার ডাকো।

—কি হয়েছে বামুনদা?— বিধবা মহিলাটি উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

—ভয় নেই, সেরে যাবে। এই নাও টাকা।— কয়েকটা টাকা বিধবা মহিলাটির হাতে দিয়ে শরৎচন্দ্র ফিরে এলেন বাড়িতে।

শরৎচন্দ্র এখানে 'দরদী শরৎচন্দ্র' নামেই খ্যাত ছিলেন। অথচ রেঙ্গুনের অনেক বন্ধুবান্ধব শরৎচন্দ্রকে এই নোংরা মিস্ত্রী-পল্লীতে থাকার দরুন ঠাট্টা-তামাসা করতেন। কারণ এই পল্লীর লোক-জনরা চটকল-ধানকলের দিন-মজুরির লোক। তাদের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে সকলেই সন্দিহান ছিল। শরৎচন্দ্র এখানে কম ভাড়ায় বাস করতেন—বিশেষ করে তিনি শহরের বাইরে থাকতেই ভাল-বাসতেন। বন্ধুবান্ধবদের এসব কথায় ভ্রূক্ষেপ করতেন না। এই মিস্ত্রী-পল্লীর লোকেদের সেবা, বিবাহ-অনুষ্ঠান প্রভৃতি, আর তাদের ঝগড়া-বিবাদ সব-কিছুই মিটিয়ে দিতে হতো তাঁকে।

দিনের পর দিন যায়। শরৎচন্দ্রের সুখস্বপ্ন-মাখা ছোট্ট সংসারে একটি পুত্রসন্তান জন্ম নিল। ছোট্ট ছেলেটিকে বুকে নিয়ে কত কথাই না ভাবেন তিনি। মনে পড়ে যায় সেই ছোটবেলাকার কথা। সেই দেবানন্দপুর,—মা-ভাইবোনদের কথা, পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের কথা। প্রবাস-জীবনে এখন এক মায়ার বন্ধনে শরৎচন্দ্র জড়িয়ে পড়লেন। ছেলেটির জন্য গড়িয়ে দিলেন সোনার বালা, পায়ে রুপোর মল, হাতে ঝুমঝুমি। এই হাসি-আনন্দ-মায়ার বন্ধন মাত্র দু'বছরের মধ্যেই ছিন্ন হলো। সর্বনাশা প্লেগ রেঙ্গুন শহরে আবার দেখা দিল।

শান্তিদেবীর মৃত্যুর এক মর্মান্তিক বিবরণ দিয়েছেন ভূপর্যটক ও কন্ট্রাক্টর গিরীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়। তিনি লিখেছেন:

"শরৎচন্দ্রের সংসারে শুধু স্বামী আর স্ত্রী। নব-বিবাহিতা পত্নীকে লইয়া তিনি সুখেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার স্ত্রী প্লেগ-রাক্ষসীর কবলে পড়িয়া শয্যাশায়ী হইলেন। শরৎচন্দ্র এই আকস্মিক বিপদে আত্মহারা হইয়া মনের আবেগে সাধ্যাতিক

ছুটাছুটি করিলেন, কিন্তু তাঁহার পাড়া-প্রতিবেশী কেহই নিজেকে বিপন্ন করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না। অগত্যা তিনি সেবক-সমিতির সাহায্যের জন্য আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—'ভাই গিরীন, আমার বড় বিপদ—স্ত্রীর প্লেগ হয়েছে।'

—কি সর্বনাশ! বল কি শরৎদা? কে দেখছে?

—এখনও ডাক্তার ডাকতে পারিনি, মাস-কাবার, হাতে টাকা-কড়ি কিছুই নেই।

—ভয় নেই, আমি অপূর্ব ডাক্তার কিংবা ডাক্তার দে-কে সঙ্গে নিয়ে এখনই যাচ্ছি।

—ভাই, তুমি সৎকার-সমিতি করে অনেক পুণ্য সঞ্চয় করেছ, আমাকে এ বিপদে রক্ষা কর।

শরৎচন্দ্র গালে হাত দিয়া হতাশভাবে একখানি ইজিচেয়ারে শুইয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ পরে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—কপাল ভাই, সবই কপাল! যেমন ভাগ্য নিয়ে এসে-ছিলাম তাইতো হবে।

আমি সমিতির আলমারি খুলিয়া রোগীর ব্যবহার্য কতকগুলি জিনিসপত্র, কিছু ঔষধ ও অত্যাবশ্যক দু'একটি উপদেশ দিয়া একখানি রিক্সাগাড়ী ডাকিয়া তাঁহাকে বাড়ি পাঠাইয়া দিলাম।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তারের সঙ্গে গিয়া দেখিলাম, রোগিণী একখানি কাঠের তক্তপোশের উপর চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া অচৈতন্য অবস্থায় ছটফট করিতেছেন। তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত, শ্বাস-প্রশ্বাসে কণ্ঠরোধ হইতেছে। একটি বৃদ্ধা মুড়িওয়ালী তাঁহার শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে। ...রোগিণীর লক্ষণ দ্বারা ডাক্তার নিঃসন্দেহে

বুঝিলেন, অবস্থা সাংঘাতিক। আমি কিয়ৎক্ষণ ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। শরৎচন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার স্ত্রীর প্রাণ-রক্ষা করিবার জন্য ডাক্তারবাবুকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার কাতর ভাব দেখিয়া সকলেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

শরৎচন্দ্র রোগশয্যার পার্শ্বে উদাস মনে বসিয়াছিলেন। এমন সময় একবার চকিতের ন্যায় তাঁর স্ত্রীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি ধীরে ধীরে ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন—'ছ্যাখো, তোমার অনেক অবাধ্য হয়েছি, সে সব আমায় ক্ষমা কর।' শরৎচন্দ্র আর্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন—'তুমি অমন করে কথা বললে বড় ভয় পাই যে শান্তি!'

স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া ধরা গলায় শান্তিদেবী কহিলেন—'ছিঃ, ভয় কিসের! আমাকে একটু পায়ের ধুলা দাও, আশীর্বাদ কর।'

কিছুক্ষণ পরেই শরৎচন্দ্র বুঝিলেন, আর আশীর্বাদ করিবার কিছুই নাই! কিছুতেই কিছু হইল না, শান্তিদেবী সংসারের দুঃখ-কষ্টকে তুচ্ছ করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। শরৎচন্দ্র পলকহীন দৃষ্টিতে স্ত্রীর মৃত্যুবিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।"

তারপর পাড়া-প্রতিবেশী কেউ সাহায্য না করায় তিনি ও শরৎচন্দ্র কুরুঙ্গি-কুলীদের একখানি মানুষ-টানা ঠেলাগাড়িতে করে শবদেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে সেই রাত্রেই সৎকার করেন। [এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, কবি নরেন্দ্র দেব তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের স্ত্রী-পুত্রের এই মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছেন। গিরীন্দ্রনাথ সরকার এ কথা তাঁকে পরে জানিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীও বলেছেন শরৎচন্দ্রের একটি পুত্র-সন্তান ছিল। তা ছাড়া শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্র যখন অগ্রদ্বীপে থাকতেন, সেই সময়ে পুত্র

হয়েছে বলে একখানি পত্র লিখে শরৎচন্দ্র তাঁকে জানান। এ কথাটি প্রকাশবাবুর পুত্র অমলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছি।]

স্ত্রী-পুত্রের স্মৃতি-বিজড়িত পরিবেশে থাকতে শরৎচন্দ্রের মন আর চাইল না; পাঠক-মন কখনো কখনো হারবার্ট স্পেনসার ডিকেন্সে ডুব দিয়ে শোক ভুলতে চাইলো—কিন্তু ভরসা কোথায়? লেখার খাতায় ধুলো জমে উঠলো। শেষে ঘরে তালাচাবি লাগিয়ে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন উত্তর-ব্রহ্মে। কিছুদিন বাদেই ফিরে এলেন রেঙ্গুনে। আপাততঃ স্ত্রী-পুত্রের স্মৃতি-বিজড়িত সেই বাসাতেই গিয়ে উঠলেন। কিন্তু এ বাড়িতে তার মন টিঁকতে চাইলো না। অবশেষে বোটাটং ল্যান্সডাউন স্ট্রীটে একটা দোতলা কাঠের-বাড়ি ভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করলেন। এ বাড়িটির চারদিকে সবই কাঠের বাড়ি। সামনে প্রকাণ্ড এক মাঠ। মাঠের অনতিদূরেই ইরাবতী নদী। এই শান্তসুন্দর স্থানটি শরৎচন্দ্রের কাছে খুবই ভালো লাগলো। বন্ধু-বান্ধবদের ভীড় লেগে থাকলেও শরৎচন্দ্রের এখানে ইংরেজী বই পড়া, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি আর সাহিত্য-চর্চা নিয়েই দিন বয়ে চলে।

শরৎচন্দ্রের কোনদিন খ্যাতি ও যশের লোভ ছিল না। এই প্রবাসে নির্জন ঘরে তিনি শুধুই লিখেছেন। কিন্তু তাই বা কতদিন চাপা থাকে! এই সময় 'ভারতী'তে শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' আত্মপ্রকাশ করে (বাংলা ১৩১৪, ইং ১৯০৭ খ্রীঃ)। শরৎচন্দ্রের কাছে তাও ছিল অজ্ঞাত। একদিন আপিসে এক বন্ধুর হাতে 'ভারতী' পত্রিকাখানি দেখে শরৎচন্দ্র বললেন—হাতে ওটা কি হে?

—'ভারতী'। আপনাকে না দেখানই উচিত, শরৎদা।

—তার মানে?

—তার মানে, এইবারে আপনি ধরা পড়ে গেছেন, শরৎদা।

—কিসে ধরা পড়লাম হে ?

—ছোট গল্প আর উপন্যাস আপনি যে লিখতে পারেন তার প্রমাণ আমি পেয়েছি।

আপিসের অন্যান্য বন্ধুরা বিস্ময় প্রকাশ করে শরৎচন্দ্রের কাছে এগিয়ে এলেন।

শরৎচন্দ্র অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ কোলকাতার কোনো এক মাসিকপত্রিকা আপনার নাম ঘোষণা করছে।

শরৎচন্দ্র সত্যিই অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—তাই নাকি হে ? কই দেখি।

'ভারতী'তে নিজের রচনা দেখে শরৎচন্দ্র আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কয়েকটি পাতা উল্‌টিয়ে বললেন—'ভারতী'তে আমার 'বড়দিদি' প্রকাশের কথা আমি ঘুণাক্ষরে জানিনে। ও গল্প আমার ছোটবেলার লেখা। কার কাছে কোন্ সময়ে আমি দিয়েছিলুম তাও মনে নেই। আমি ভাবছি, সৌরীনভায়া কেমন করে এ লেখাটা হস্তগত করলো!

এই 'বড়দিদি' সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় 'ভারতী'তে (১৯০৭ খ্রীঃ) প্রকাশিত হয়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি'। প্রথম কয়েক সংখ্যায় নাম ছিল না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছদ্মনামে এই 'বড়দিদি' গল্পের লেখক—বাংলাদেশের সবাই একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গল্পটি পড়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। জনমতের চাপে 'ভারতী'তে শরৎচন্দ্রের নাম ঘোষণা করা হয়। শরৎচন্দ্র এসবের খবর সত্যিই জানতে পারেননি। চৌধুরী-বাবুর বইয়ের দোকান থেকেই রেঙ্গুনের আপিস-বন্ধুরা

'ভারতী'র সন্ধান পান। এরপর শরৎচন্দ্র 'ভারতী'তে পত্র দিলে, 'ভারতী' তাঁর কাছে প্রতিমাসেই আসতো।

সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভাগ্যদেবতার আশীর্বাদ যেমন একদিকে তিনি পেলেন—তেম্‌নি অন্যদিকে অদৃষ্টের ইঙ্গিতে তাঁর নতুন সংসার পাতবার আহ্বান এলো। এই রেঙ্গুনেই যে ঘটনার মধ্যে পড়ে শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে বিবাহ করেন, তা বড়ই মর্মস্পর্শী। এ বিষয়ে হিরণ্ময়ী দেবী যা বলেছেন—"মাতার মৃত্যুর পর আমার বাবা কৃষ্ণদাস অধিকারী মেদিনীপুর জেলার শ্যামচাঁদপুর গ্রাম ছেড়ে পাটনায় আসেন চাকরির চেষ্টায়। কিন্তু সেখানে ভালো কাজ না পাওয়ায়, একান্ত নিঃস্ব অবস্থায় আমাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চাকরির জন্য রেঙ্গুনে উপস্থিত হন। তখন আমার বয়স দশ কি এগারো। বাবা রেঙ্গুনে যে বাড়িতে বসবাস শুরু করেন সেই বাসায় এক বাঙালী পরিবার বাস করতেন; ক্রমশঃ সেই পরিবারের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। সেই বাড়ির কর্তার সঙ্গে তাঁর [শরৎচন্দ্রের] খুবই আলাপ ছিল। তিনি মাঝে মাঝে বাসায় এসে গল্পগুজব করতেন তাঁর সঙ্গে। তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হলে তিনি [শরৎচন্দ্র] এসে সেবা ও অর্থ-সামর্থ্যে তাঁকে সাহায্য করতেন। আমিও তাঁর রোগশয্যায় সেবা-শুশ্রূষা করতাম। তিনিই অর্থাৎ বাড়ির কর্তা আমার বাবার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। এবং সেই পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে। আমার বাবা বাড়ির কর্তাকে অনুরোধ করেন তাঁর কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করতে। শেষে একদিন রোগশয্যায় তিনি তাঁর হাতদুটি ধরে অনুরোধ করে বলেন—'তুমি যদি হিরণ্ময়ীকে বিবাহ কর তো খুব ভালো হয়। ভদ্রলোক বিদেশ-বিভূঁয়ে একান্ত নিঃস্ব ব্রাহ্মণ।' তিনি এ বিবাহে রাজী হন না। তারপর কয়েক বছর পরে যখন আমার

বাবার চাকরি যায় তখন তিনি একদিন সকালে আমাকে সঙ্গে করে তাঁর বাসায় উপস্থিত হন, এবং তাঁর হাতে সমর্পণ করে বলেন—হয় কন্যাদায় হতে উদ্ধার করুন, নয়তো বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে আমার কন্যার বিবাহের জন্য সমুদয় খরচা দিন। কারণ আমি আজ নিঃস্ব —চাকরি নেই।

তিনি নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আমার বাবা তাঁর কাছ থেকে কোনো সদুত্তর পাওয়ার পূর্বেই তিনি সেখান থেকে অন্তর্হিত হন। পরে তিনি একান্ত উদারতার সহিত নিরুপায় হয়ে আমাকে গ্রহণ করেন। রেঙ্গুনে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ করা তখন সম্ভব হয়নি। কেবল মাল্যদানেই আমাদের বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হয়।" [এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, শরৎচন্দ্রের বিবাহ ব্যাপার নিয়ে অনেকেই অনেকরকম কথা লিখেছেন। নরেন্দ্র দেব তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন— "মেদিনীপুর থেকে হিরণ্ময়ী দেবীকে বিবাহ করে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে ফিরে যান।" এ ঘটনাটি আদৌ সত্য নয়। হিরণ্ময়ী দেবীর বিবৃতি গ্রহণ করবার সময় অনিলা দেবীর মেজ-দেওরের ছেলে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাক্ষীস্বরূপ ছিলেন। এই কথা সত্য কিনা তা অনুসন্ধানের জন্য তাঁর বড়দিদির (রাণুবালা দেবী) কাছে তিনি লেখককে নিয়ে যান। তিনি শরৎচন্দ্রের বাজে-শিবপুরের বাসার অদূরেই তৎকালে বাস করতেন। তিনি ও অনিলা দেবী (শরৎচন্দ্রের দিদি) ছাড়া হিরণ্ময়ী দেবী তাঁদের বিবাহ সম্বন্ধে আর কাহারও কাছে আগে বা পরে কোনো বিবৃতি দেন নাই। শরৎচন্দ্রের এই বিষয়ে কড়া বারণ ছিল। তিনি বলতেন— সমস্ত সমাজ, সংসার বা আত্মীয়স্বজন আমাকে ত্যাগ করে করুক। আমি যে বিবাহ করেছি তা যদি কাহারও গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে আমাকে ত্যাগ করুক—এই আমার শেষ কথা।]

এই সম্পর্কে রাণুবালা দেবীর বিবৃতিটি নিম্নে দেওয়া হলো :

"একদিন ছোটমামা (প্রকাশচন্দ্র) আমার কাছে এসে বললেন—দাদা রেঙ্গুন থেকে সস্ত্রীক কোলকাতায় আসছেন। ভালো একটা বাসা জোগাড় করে দিতে হবে। আমি তখন আমার বড় ভাসুর-পো ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (ইঁদু) বাড়ি খোঁজ করতে বলি। তিনি ৬নং নীলকমল কুণ্ডু লেনে তিনখানি ঘর একতলায় ১৫৲ টাকায় (ব্রজ পালের বাড়ি) ভাড়া করে দেন। বড়মামা (শরৎচন্দ্র) সেখানে মাস পাঁচ-ছয় বসবাস করার পর ৪নং বাজে-শিবপুর ফার্স্ট বাই লেনে (সতীশের মায়ের বাড়ি) ২০৲ কি ২৫৲ টাকায় ভাড়া নিয়ে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন। আমি সেই সময় বড়মামীর (হিরণ্ময়ী দেবী) কাছে বিয়ের সম্বন্ধে কথা পাড়লে তিনি বলেন—রেঙ্গুনেতেই তাঁদের শুধু ফুলের মালা-বদল করেই বিবাহ হয়। কারণ সেখানে আনুষ্ঠানিক বিবাহের কোনো উপায় ছিল না। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৪।১৫ বছর। শিবপুরে আসার সময় থেকেই বড়মামীর হাতে নোয়া দেখি, এবং মাঝে মাঝে বাসায় গিয়ে তাঁকে সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে আসতুম। এ ছাড়া বড়মামীর বাবা কৃষ্ণদাস অধিকারীর অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। সেইজন্য বড়মামা (শরৎচন্দ্র) মাসে মাসে কিছু টাকা ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মারফত মনি-অর্ডার করতেন। বড়মামীর বাবার মৃত্যুসংবাদ মেদিনীপুর থেকে এসে পৌঁছালে, বড়মামী পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। [এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, শরৎচন্দ্রের বিবাহ ব্যাপারে আর কোনো ভ্রান্ত ধারণা থাকতে পারে না। কারণ শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বিশিষ্ট বন্ধু—ভূপর্যটক গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের এই বিবাহের কথা উল্লেখ করেছেন। রাণুবালা দেবীর

বিবৃতি গ্রহণ করার সময় তাঁর পুত্র হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষীস্বরূপ ছিলেন।]

নূতন সংসার। শরৎচন্দ্র ছোট্ট ফ্ল্যাট-বাড়িতে বইপত্র কিনে মনের মতো করে ঘর সাজালেন। বাড়ির বারান্দায়, সিঁড়িতে টবে করে লাগালেন হরেকরকমের ফুলগাছ। কিনে নিয়ে এলেন সিঙ্গাপুরী 'নূরী' পাখী একটা। সব যেন তাঁর মনের মতো হলো। বাড়িটার চারপাশে প্রাকৃতিক দৃশ্যও মন্দ নয়। চারিদিক ফাঁকা ও নির্জন। কিন্তু পাখীটার নাম কি দেওয়া যায় শরৎচন্দ্র ভেবে পেলেন না। একদিন হিরন্ময়ী দেবীকে ডেকে বললেন—বড়বৌ, পাখীটার নাম কি দেওয়া যায় বল তো? (শরৎচন্দ্র স্ত্রীকে কখনো বৌ বা বড়বৌ বলে ডাকতেন।) হিরণ্ময়ী দেবী ভাবনায় পড়লেন। কোনো জবাব না দিতে পারায় শরৎচন্দ্রই এই পাখীটার নাম দিলেন 'বাটুবাবা'। দিনরাত পরিশ্রম করে কথা শেখালেন।

শরৎচন্দ্রের এই বাসাটিতে বন্ধুবান্ধবদের ভীড় সবসময়ই লেগে থাকতো। বাসায় আসতেন—যোগেন্দ্রনাথ সরকার, কুমুদিনীকান্ত কর, নিশাপতি বসু, সতীশচন্দ্র দাস, আর আসতেন ভূপর্যটক গিরীন্দ্রনাথ সরকার, নিশানাথ বসু ও টি. এন. বসাক।

সতীশবাবু এক ছুটির দিনে এসে পরিহাসচ্ছলে বললেন—শরৎদা, আর যে আপনার টিকিটি দেখা যায় না! (শরৎচন্দ্র এই সময় 'চরিত্রহীন' লিখছিলেন। ছুটির দিনে কোথাও না গিয়ে, লেখাতেই দিন অতিবাহিত করতেন।)

শরৎচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন—ছাখো, মানুষের জীবনটা কি শুধু মজলিশ নিয়েই পড়ে থাকবে? তার কি অন্য কাজ নেই?

—তা থাকবেনা কেন ? এই ধরুন না, যতদিন আমরা এক মেসে ছিলাম ততদিন— ব'লে থেমে টেবিলের ওপর খানকয়েক বইয়ের ওপর নজর পড়লে সতীশবাবু বলে উঠলেন—অত বই, কার লেখা শরৎদা ?

—রবিবাবুর। আর আছে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের দর্শন, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞানের বই,—তাতে হলো কি ?

—আপনি সব কথায় উল্টো বোঝেন, শরৎদা। বইপড়ায় খুব আনন্দ পান দেখছি।

শরৎচন্দ্র বললেন—তা পাই। বই-এর মতো জিনিস আর নেই। যত জ্ঞান ওরই মধ্যে। সেইজন্য একটু-আধটু পড়ি।

এমন সময় বাইরের রাস্তা থেকে যোগেন্দ্রনাথ সরকারের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে শরৎচন্দ্র জানলা দিয়ে মুখ বার করে বললেন—আরে, কে ও ? সরকার নাকি হে ? এসো এসো।

সতীশবাবু উঠে পড়লেন। শরৎচন্দ্র বললেন—আরে, এরি মধ্যে উঠলে ? বোসো, চা-টা খাও।

—না দাদা, কাজ আছে—যাই।

—বেশ, যাও। তোমাকে তো ধরে রাখতে পারিনে।

একটু পরে যোগেন্দ্রনাথ সরকার ঘরে ঢুকে বললেন—কি শরৎদা, এত বেলা অবধি করছেন কি ?

শরৎচন্দ্র তামাক সাজতে সাজতে বললেন—খেলা করছি সরকার, খেলা।

—কার সঙ্গে দাদা ?

শরৎচন্দ্র বললেন—আর কার সঙ্গে ! আচ্ছা সরকার, রবিবাবুর 'নৌকাডুবি', 'চোখের বালি' কোথায় পাওয়া যায় বল তো ?

—কেন, যেখানে তাঁর সব বই পাওয়া যায়।

—আমাকে আনিয়ে দিতে পারো?

—সে আর পারবো না কেন?

শরৎচন্দ্র পকেট থেকে একটা পয়সা বার করে বললেন—তুমি একটা পোস্টকার্ড লিখে দাও।

পয়সাটি ফিরিয়ে দিয়ে যোগেন্দ্রনাথ বললেন—পয়সা আর দিতে হবেনা, শরৎদা। ও আমিই লিখে দেব।

—কি বললে সরকার, পয়সা নেবে না? তুমি কি বলতে চাও বইগুলো আনিয়ে কাজ নেই?

যোগেন্দ্রনাথ বললেন—রাগ করলেন শরৎদা? তবে দিন, পয়সা দিন।

শরৎচন্দ্র এবার হেসে বললেন—রবিবাবুর বই পড়তে আমার খুব ভালো লাগে, সরকার। তুমি তাড়াতাড়ি আনার ব্যবস্থা কর।

যোগেন্দ্রনাথ হাসিমুখেই বিদায় নিলেন।

অনেক বেলা অবধি শরৎচন্দ্র বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এম্‌নি গল্পগুজবই করতেন। হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর অনিয়মে খাওয়া-দাওয়ার জন্যে বড়ই দুঃখ বোধ করতেন। অথচ এমন দেখা গেছে—বন্ধুবান্ধব, লেখা ইত্যাদির সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না রেখে স্ত্রীর সঙ্গে নানা সুখ-দুঃখের কথা কয়ে অনেক সময় কাটিয়ে দিচ্ছেন। শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে কেমন স্নেহের চোখে দেখতেন তার এক দৃষ্টান্ত এ থেকে পাওয়া যায়।

একদিন তিনি হিরণ্ময়ী দেবীকে ডেকে বললেন—বড়বৌ, সবই হলো, কিন্তু একটা জিনিস হলো না।

—কি হলো না গো?

—তোমার একখানি ছবি।

—আমার ছবি নিয়ে কি হবে?

—হবে গো, সব হবে বড়বৌ। লাইব্রেরি হলো, ফুলগাছ হলো, কিন্তু ঘরে তোমার ছবি থাকবে না?—তা কি হয় বড়বৌ? চল, তোমার আমার একখানা ফটো তুলে আনিগে।

হিরণ্ময়ী দেবী সেদিন হেসেই বলেছিলেন—ফটো তুলতে নেই গো! বিশেষ করে মেয়েদের।

—ওসব আমি মানিনে। চল, ফটো আমাদের তুলতেই হবে।

শেষ পর্যন্ত ফটোওয়ালা বাড়ি এসে ছবি তোলার আয়োজন করার সঙ্গে সঙ্গেই হিরণ্ময়ী দেবীর পেটে অম্বলের বেদনা অনুভব হলো, যার জন্য ফটোওয়ালাকে ফটো না তুলে ডাক্তার ডাকতে ছুটতে হয়। সেইজন্য হিরণ্ময়ী দেবীর ফটো শরৎচন্দ্র আর কখনো তোলেননি।

শরৎচন্দ্র সংসারী হয়েও হলেন এবার সাহিত্য-সাধক। রবীন্দ্রনাথের বইগুলি পেয়ে শরৎচন্দ্র গভীর অধ্যয়নে নিমগ্ন হলেন। যোগেন্দ্রনাথ সরকারই হচ্ছেন তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু। সাহিত্য-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কথাবার্তা তাঁর সঙ্গেই শরৎচন্দ্র বেশী কইতেন। একদিন তিনি এলে শরৎচন্দ্র বললেন—সরকার, রবিবাবু যেমন কবি, তেম্নি গল্প-লেখকও বটে।

—শরৎদা, আপনার কথা আমি মানি। রবিবাবু একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক, কবি—সব-কিছুই।

—ঠিক বলেছো, সরকার। তবে কি জানো? রবিবাবুর কবিতা বড্ড শক্ত— ব'লে টেবিলের উপর থেকে রবীন্দ্রনাথের একখানি কবিতার বই তুলে নিয়ে 'অসমাপ্ত' কবিতাটির আবৃত্তি শুরু করে দিলেন শরৎচন্দ্র ঃ

"জীবনে যত পূজা হলো না সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।

জীবনে আজো যাহা রয়েছে পিছে
জানি হে জানি তাও হয়নি মিছে।
আমার অনাগত, আমার অনাহত
তোমার বীণাতারে বাজিছে তারা—
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা॥"

তারপর বললেন—কি বুঝলে সরকার ?

—আপনার মতো আমিও কবিতা বুঝিনে। কিন্তু কবিতা লেখা আমার অভ্যাস আছে।

শরৎচন্দ্র বই থেকে মুখ তুলে ড্রয়ার থেকে নিজের লেখা একটি কবিতা বের করে যোগেন্দ্রনাথের হাতে দিয়ে বললেন—সরকার, তোমরা তো কবিতা লেখো, আমার কবিতাটা পড়ে ছাখো তো—ভালো কিনা।

যোগেন্দ্রনাথ পড়ে মুগ্ধ হয়ে বললেন—দাদা! উঃ, আপনি যে এত সুন্দর কবিতা লিখতে পারেন, কই আগে তো জানতুম না ?

—সরকার, তাই বা পারি কই— ব'লে তামাক সাজতে বসলেন শরৎচন্দ্র।

যোগেন্দ্রনাথের নজর এবার টেবিলের ওপর পড়লো ; তিনি মোটা খাতাটি তুলে পাতা উল্টাতে লাগলেন—আশ্চর্য হয়ে গেলেন শরৎচন্দ্রের লেখনী-শক্তি দেখে। বললেন—এটি আবার কি শরৎদা ?

শরৎচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন—তোমার নজরে পড়লো দেখছি—ওটা 'চরিত্রহীন'।

—তার মানে ?

—তার মানে ওটা একটা বড় গল্প।

গল্পের কথা শোনামাত্রই 'চরিত্রহীন'-এর পাণ্ডুলিপির কয়েক পাতা উল্টিয়ে পড়তে শুরু করলেন যোগেন্দ্রনাথ। এমন মুক্তোর মতো পরিষ্কার লেখা কখনো দেখেননি তিনি। অবাক হয়ে গিয়ে বললেন—প্রথম পাতায় অনেক নাম দেখছি,—এরা কারা শরৎদা ?

শরৎচন্দ্র একটা টেবিলে ধারে বসে তামাক খেতে খেতে বললেন—এরা হচ্ছে আমার সব অন্তরঙ্গ বন্ধু। ছ্যাখো সরকার, তোমাকে এসব কথা কিছুই বলিনি। আর কাউকে যেন বোলো না। ছ্যাখো, ভাগলপুরে আমাদের একটা ছোটখাটো সাহিত্য-সভা ছিল। এরা হচ্ছে তারই সভ্য। এই পুঁটু (বিভূতিভূষণ ভট্ট), এই বুড়ি (নিরুপমা দেবী), এই উপীন (উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়), এই সুরেন (সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়), এই গিরীন (গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) আর আমার সৌরেন-ভায়া ('ভারতী'র সম্পাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়) এরা আজকাল কত পত্রিকায় গল্প লিখছে। তা ছাড়া বুড়িও আমার ভালো কবিতা লেখে। তুমি যদি তা পড়তে তাহলে বুঝতে পারতে, সরকার— তামাক খেতে খেতে বললেন—দুঃখ হয় সরকার, বড় দুঃখ হয় !

যোগেন্দ্রনাথ বললেন—শরৎদা, এমন সাধনা নষ্ট করবেন না। বেশী করে লিখুন।

মৃদু হেসে শরৎচন্দ্র বললেন—লিখতে পারি কই সরকার ?

—কেন, এই যে মেলাই লিখেছেন।

—আরে সরকার, তুমিও যেমন! বানিয়ে গল্প সবাই লিখতে পারে। ও তুমিও পারো।

একদিকে বন্ধু-বান্ধবদের এই উৎসাহ, অন্যদিকে লেখা পড়াশুনা আর আপিস এইসবের মধ্যে থেকেও শরৎচন্দ্র ছিলেন প্রকৃত সংসারী মানুষ। স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীর প্রগাঢ় মমতা তাঁর ছন্নছাড়া জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

রেঙ্গুনের যে বাড়িতে শরৎচন্দ্র বাস করতেন তার নীচের ফ্ল্যাটে কয়েকজন বর্মী ভাড়াটে বাস করতো। একবার তাদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ভীষণ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হবার উপক্রম হয়। ঘটনাটি ঘটে আপিস যাবার সময়। হিরণ্ময়ী দেবী যে-ঘরটিতে রান্না করতেন সে-ঘরটির কোনো শ্রী ছিল না। কাঠের বাড়ি। কাঠগুলিতে ঘুণ ধরেছে। রান্না করার সময় মেঝের ফুটো দিয়ে প্রায়ই নীচের ফ্ল্যাটে জল পড়তো। একদিন নীচের তলার বাসিন্দা বিরক্ত হয়ে একটা প্রকাণ্ড শালকাঠ নিয়ে শরৎচন্দ্রের রান্নাঘরে প্রচণ্ড আঘাত করে, যার ফলে সমগ্র রান্নাঘরটির জিনিসপত্র তছনছ হয়ে যায়। হিরণ্ময়ী দেবীর ডাকে শরৎচন্দ্র রান্নাঘরে এসেই অবাক হয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন —এ অবস্থা কেন বড়বৌ?

—নীচের তলায় বোধহয় জল পড়তো, সেই জন্যই।

শরৎচন্দ্র কোনো কথা না বলে ঘরের মধ্যে যা জল ছিল সমস্তই মেঝেয় ঢেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই নীচের ঘরের বর্মী বাসিন্দারা লাঠি নিয়ে শরৎচন্দ্রের উপর চড়োয়া হলো। শরৎচন্দ্র ভয় পাবার লোক নন। ঘরের ভিতর ঢুকে বড় একটা ভোজালি নিয়ে হনহন করে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন—ওটা রেখে দাও,—অমন কাজ কোরো না!

শরৎচন্দ্র কোনো কথা না শুনে নীচে নেমে গেলেন।

তাঁর রণমূর্তি দেখে বর্মী বাসিন্দাদের ঝগড়া করতে আর সাহস হলো না। (সামতাবেড়ের বাড়িতে শরৎচন্দ্রের উক্ত ভোজালিটি এখনো রক্ষিত আছে।)

ব্রহ্মপ্রবাসের দিনগুলি নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে কাটলেও শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্য প্রায়ই ভালো যেতো না। যার জন্যে হিরণ্ময়ী দেবী বড়ই অশান্তিতে থাকতেন। এই সময়ে আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন শরৎচন্দ্র। আপিস কামাই হতো প্রায়ই, যার জন্য আপিসের ফিরিঙ্গী সাহেবরা শরৎচন্দ্রের উপর বিরক্ত হতো। শরৎচন্দ্র ভ্রূক্ষেপ করতেন না আপিসের নিয়মকানুন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে মাস-কয়েকের জন্য ছুটি নিতে হলো। সেটা ১৯১২ সালের কথা। দীর্ঘদিন ব্রহ্মদেশে অবস্থান করে তাঁর মন দুলে উঠলো জন্মভূমি বাংলাদেশে ফিরতে—ভাই-বোনদের সঙ্গে দেখা করতে। অবশেষে বাড়িওয়ালার জিম্মায় শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে রেখে ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে 'চরিত্রহীন'-এর আংশিক পাণ্ডুলিপি নিয়ে কোলকাতায় এলেন। হাওড়ায় খুরুট রোডে (বর্তমান নেতাজী সুভাষ রোড) এক বাড়িতে তিনি বাস করতে লাগলেন। শরৎচন্দ্র এখানেই 'চরিত্রহীন'-এর কয়েকটা পরিচ্ছেদ লেখা সমাপ্ত করেন।

একদিন তিনি সম্পর্কীয় মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাসায় এসে বাড়ির চাকরকে বললেন—বাবু কোথায়?

চাকর জবাব দিলো—তিনি বেরিয়ে গেছেন।

অগত্যা শরৎচন্দ্র উপেনবাবুর দেখা না পেয়ে একটা চিঠি লিখে চলে এলেন বেলুড়-মঠে মেজভাই প্রভাসচন্দ্রের (স্বামী বেদানন্দ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। বাসার ঠিকানা তাঁকে শরৎচন্দ্র দিয়ে এলেন।

এদিকে উপেন্দ্রনাথ বাড়ি এসে জানতে পারলেন শরৎচন্দ্রের আগমনের কথা। একটা চিঠিও তাঁকে দিল চাকর। বহুদিন পরে প্রবাসী শরৎচন্দ্রের আগমন-বার্তা তাঁর কাছে কম আনন্দের কথা নয়। ছুটলেন বেলুড়-মঠে প্রভাসচন্দ্রের কাছে, তিনি হয়তো ঠিকানা বলতে পারেন।

তাঁকে দেখে আশ্চর্য হলেন প্রভাসচন্দ্র; বললেন—উপীন-মামা! হঠাৎ যে এখানে? কেমন আছেন?

—ভালো। শরৎ কোথায় থাকে জানিস?

—জানি। সে জায়গা কি চিনতে পারবেন উপীন-মামা?

—বল্ না।

প্রভাসচন্দ্রের নির্দেশমতো উপেন্দ্রনাথ হাওড়ার খুরুট রোডে উপস্থিত হলেন। অল্পপরিসর একটা নির্জন গলি। একটি বাড়ির সুমুখে এসে কড়া নাড়লেন। দরজা খুলে গেল; বেরিয়ে এলো একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি। জিজ্ঞাসা করল—কাকে চাই?

—এখানে কি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আছেন? যিনি বর্মা থেকে এসেছেন?

—ও, দাদাঠাকুর?— লোকটা একগাল হেসে চীৎকার করে ডাক দিয়ে উপেন্দ্রনাথের আগমন-বার্তা জানালো। শরৎচন্দ্র উপরের ঘরে বিছানায় বসে তাঁর 'চরিত্রহীন'-এর পাণ্ডুলিপি দেখছিলেন। উপেন্দ্রনাথকে দেখে শরৎচন্দ্র অবাক হয়ে বললেন—আমি এখানে আছি কেমন করে জানলে উপীন?

উপেন্দ্রনাথ বললেন—প্রভাস বলে দিল—তুমি এই বাড়িতে বাস কর। ওসব কি শরৎ?

মৃদু হেসে শরৎচন্দ্র বললেন—'চরিত্রহীন'-এর পাণ্ডুলিপি।

—ওগুলো আমাকে দাও।

—কি হবে উপীন ?

হাতে তুলে নিয়ে দু'চার পাতা উল্টিয়ে দেখে উপেন্দ্রনাথ বললেন—পড়বো। এমন সুন্দর জিনিস ছাড়তে আছে ?

শরৎচন্দ্র বললেন—ওগুলো বাড়ি নিয়ে যাও। পোড়ো। একদিন নিয়ে আসবো।

—আচ্ছা, তাই হবে। ভালো আছ তো শরৎ ?

শরৎচন্দ্র বললেন—শরীর ভালো নয়, উপীন।

—সেকি ! ট্রিটমেণ্ট করাও।

—তাই করাতে হবে।

উপেন্দ্রনাথ উঠে পড়লেন। শরৎচন্দ্রও তাঁকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন ট্রাম-লাইন পর্যন্ত।

এদিকে উপেন্দ্রনাথ 'সাহিত্যে' 'চরিত্রহীন' প্রকাশ করবার জন্য সুরেশ সমাজপতি মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করলেন। সমস্ত ব্যবস্থা করে পরদিন বেলা বারোটার সময় তিনি শরৎচন্দ্রের বাসায় উপস্থিত হলেন। শরৎচন্দ্র বিছানায় বসে একটি ইংরেজী বই পড়ছিলেন। বললেন—কি উপীন, এত সকালে ? খেয়ে-দেয়ে এসেছ তো ?

—হ্যাঁ, সে ভাবতে হবে না তোমায়। খাওয়া আমার হয়েছে। এখন তোমায় আমার সঙ্গে যেতে হবে—সুরেশ সমাজপতির বাড়িতে।

—কেন, কী দরকার উপীন ?

—দরকার আছে। এতে চেনা-অচেনার কিছু নেই। চল।

শরৎচন্দ্র গম্ভীরভাবে বললেন—আমি লিখি, তিনি কেমন করে জানলেন উপীন ?

—শুধু বলিনি, পড়িয়েছি।

—পড়িয়েছ ? আমার 'চরিত্রহীন' ?

—হ্যাঁ।

—কী সর্বনাশ ! অতবড় সাহিত্যিকের হাতে আমার 'চরিত্রহীন' তুলে দিয়েছ ? ছিঃ উপীন, অন্যায় কাজ করেছ।

—অত ভাবতে হবেনা, শরৎ। এখন দুর্গা-দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়া যাক্।

শেষ পর্যন্ত দুজনে বেরিয়ে পড়লেন সমাজপতি মহাশয়ের বাসার দিকে।

সমাজপতি মহাশয় বাড়িতেই ছিলেন। সেই ঢালা-বিছানা-পাতা বাইরের ঘরটিতে। অভ্যাসমতো তাকিয়া ঠেসান দিয়ে কাগজ-পত্রাদি দেখছিলেন সমাজপতি। উপেন্দ্রনাথের প্রবেশ ঠিক এই সময়ে—পিছনে শরৎচন্দ্র।

—বোসো, উপেন। কিন্তু তোমার সেই মানুষটি কই ?—সমাজপতি মহাশয় বললেন।

—আজ্ঞে, ইনিই হচ্ছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শরৎচন্দ্র নমস্কার করে বসলেন সেই ঢালা বিছানায়।

সমাজপতি মহাশয় বললেন—উপেন, কাল তোমার সামনে পাতা উল্টিয়ে পড়লাম। কিন্তু আমি মত পাল্টিয়ে ফেলেছি।

—কি রকম ?

—সাহিত্যে 'চরিত্রহীন' নিষিদ্ধ। কারণ বেরুলে, পাঠকমহল আমার 'সাহিত্য' আর চাইবে না। পত্রিকা অচল করতে পারি না, উপেন।—সমাজপতি মহাশয় বেশ গম্ভীরভাবেই বলে উঠলেন।

উপেন্দ্রনাথকে কিছু বলতে না দেখে শরৎচন্দ্র বললেন সমাজপতি মহাশয়কে—আমি জানি, আপনি কি জন্যে প্রকাশ করবেন না।

সমাজপতি মহাশয় মৃদু হেসে বললেন—সাবিত্রী একটা মেসের ঝি। তাকে নিয়ে অতটা বাড়াবাড়ি করা ভালো নয়।

শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন—বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণকান্তের রোহিণী-চরিত্র কি আপনার কাছে খুব ভালো লাগে?

—সে কথা আলাদা, শরৎবাবু। সে চরিত্রকে আপনার সাবিত্রী-কিরণময়ীর সঙ্গে তুলনা করা মস্ত ভুল।

শরৎচন্দ্র আর কোনো কথা বললেন না। সমাজপতি মহাশয় মৃদু হেসে শান্তস্বরে বললেন—শরৎবাবু, এতে রাগ করবার কিছুই নেই। আমি আশা করছি 'সাহিত্যে' আপনি অন্য কিছু দেবেন। আমি সাদরে তা গ্রহণ করবো।

শরৎচন্দ্র উঠে পড়লেন ক্ষুণ্ণমনে। দুজনে বাইরে বেরিয়ে এলেন। ট্রাম-রাস্তার কাছে এসে শরৎচন্দ্র দুঃখ করে বললেন—উপীন, আমি আগেই ভেবেছিলাম, আমার 'চরিত্রহীন' ওঁদের কাছে মস্ত একটা গোলমেলে ঠেকবে।

উপেন্দ্রনাথ বললেন—বেশ তো, অন্য এক জায়গায় চেষ্টা করা যাবে।

পরদিন শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীন'-এর পাণ্ডুলিপি নিয়ে হাজির হলেন উপেন্দ্রনাথের বাসায়। তারপর উভয়ে 'চরিত্রহীন' প্রকাশের ব্যবস্থা করবার জন্য 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের বাসায় হাজির হলেন। সকালের দিকে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁদের আগমন দেখে অবাক হয়ে গেলেন ফণীবাবু। বললেন—কী সৌভাগ্য! আপনি শরৎবাবু আমার বাসায়? বসুন বসুন—কি খবর বলুন?

উপেন্দ্রনাথ বললেন—আপনার কাছে আসার উদ্দেশ্য আছে, ফণীবাবু।

—কী উদ্দেশ্য বলুন, উপেনবাবু ?

উপেন্দ্রনাথ 'চরিত্রহীন'-এর পাণ্ডুলিপিটা ফণীবাবুর হাতে তুলে দিয়ে বললেন—যদি এটা প্রকাশ করেন।

—নিশ্চয় নিশ্চয় ; আমি ছাপবো। কোনো ভাবনা নেই, শরৎবাবু।

উপেন্দ্রনাথ বললেন—'চরিত্রহীন' এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। কয়েকটা পরিচ্ছেদ লেখা হয়েছে মাত্র। ও এখন শেষ করবে রেঙ্গুনে ফিরে।

—বেশ বেশ, চট করে সেরে ফেলুন, শরৎবাবু। কলম কিছুতেই থামাবেন না।

তারপর অন্দর-মহলে চলে গেলেন লুচি-সন্দেশের অর্ডার দিতে।

এই 'যমুনা' এক অখ্যাত পত্রিকা। এই পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের 'বোঝা' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের কাছে তা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এখানে বলা আবশ্যক যে, প্রমথনাথ ভট্টাচার্য পরিকল্পিত 'ভারতবর্ষে' এবং ফণীন্দ্রনাথ পালের অখ্যাত 'যমুনা' পত্রিকায় লেখা দেবার তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন। এরপর বড়দিদি অনিলা দেবী আর অগ্রদ্বীপে ছোটভাই প্রকাশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে ফিরে যান।

রেঙ্গুনে এসে 'চরিত্রহীন' শেষ করতে উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। শুধু লেখা আর লেখা ! আপিসের কাজেও মন নেই। সেইজন্য আপিসের ফিরিঙ্গী সাহেবদের সঙ্গে প্রায়ই বচসা হতো। শরৎচন্দ্র কিছুই ভ্রূক্ষেপ না করে এই 'চরিত্রহীন' নিয়েই দিনের পর দিন কাটিয়ে দিলেন।

'চরিত্রহীন' লেখা একদিন শেষ হলো। তারপর শুরু হলো 'নারীর ইতিহাস'। আপিস-বন্ধুর দল শরৎচন্দ্রের লেখনী-শক্তি দেখে

:সিত প্রশংসা করতে শুরু করলেন। এদিকে 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদকের তাগাদা—শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীন'-এর পাণ্ডুলিপি 'যমুনা'য় পাঠানো স্থির করলেন। হলোই-বা 'যমুনা' অখ্যাত পত্রিকা। তাঁর লেখা যদি পাঠক-মহল ভালো বলে গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই সে-পত্রিকার কদর বাড়বে দিন-কে-দিন।

শরৎচন্দ্র এইবার নবপ্রেরণায় লিখতে শুরু করলেন 'নারীর ইতিহাস'। লেখা আর লেখা!—এই হলো তাঁর জীবনের ব্রত। হিরণ্ময়ী দেবী ভাবতেন আশ্চর্য এই মানুষটি। দুনিয়ায় এমন আত্ম-ভোলা মানুষ আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সেই মনপ্রাণ একদিন গেল ভেঙে। অসুস্থ হয়ে পড়লেন আবার তিনি। অবশেষে লেখা আর পড়াশুনা তাঁকে একেবারেই ছেড়ে দিতে হলো। এবার তিনি কি করবেন তা ভাবতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি স্থির করলেন—তাঁকে চিত্রশিল্পী হতে হবে।

এক ছুটির দিনে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর সোজা চলে এলেন যোগেন্দ্রনাথ সরকারের বাসায়। ডাক দিলেন—সরকার, বাসায় আছ নাকি হে?

যোগেন্দ্রনাথ বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন—কি খবর, দাদা?

—খবর ভালো। চট করে জামাটা গায়ে দিয়ে এসো দেখি।

ছুটির দিনে শরৎচন্দ্রের আগমনের হেতুটা কি বুঝতে পারলেন না যোগেন্দ্রনাথ। জামা গায়ে দিয়ে বাইরে এসে বললেন—চলুন শরৎদা কোথায় যাবেন?

—আগে দোকানে চল, তারপর দেখবে— ব'লে শরৎচন্দ্র একটা রং-তুলির দোকানে এলেন।

যোগেন্দ্রনাথ অবাক হয়ে গিয়ে বললেন—এ-সব কি হবে দাদা?

—পরশু রবিবারে একবার আমার বাসায় গিয়ে দেখো—কী হয় এ-সব দিয়ে।

শরৎচন্দ্র বিদায় নিলেন।

শরৎচন্দ্র যে বাসায় থাকতেন তার চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য ছিল চমৎকার। খোলা জানলার বাইরের দৃশ্যগুলি শরৎচন্দ্র হুবহু তাঁর ক্যানভাসে তুলে নিলেন। এমনি করে সকালে-সন্ধ্যে একের পর এক ছবি সৃষ্টি করে চললেন। তাঁর প্রথম ছবিটির নাম 'রাবণ-মন্দোদরী', পরের ছবিটির নাম দিয়েছিলেন 'মহাশ্বেতা'। এই 'মহাশ্বেতা'ই শরৎচন্দ্রের শিল্পী-জীবনের অনন্যসাধারণ সৃষ্টি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের কথামতো রবিবার দিন যোগেন্দ্রনাথ সরকার শরৎচন্দ্রের বাসায় এলেন। কয়েকবার এই বাসাটিতে তিনি এসেছেন। আজ যেন সে-বাসাটি চিনতে পারা যায় না। সিঁড়ির পাশে টবে বসানো কৃষ্ণকলি আর তুলসীর চারা। এসব তাঁর চোখে কোনদিন পড়েনি। আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ।

শরৎচন্দ্র বললেন—কি ভায়া, অত তাকিয়ে দেখছো কি?

—দেখছি আপনার এই বাসাটি। কতবার এসেছি, আজ কিন্তু সবই অদ্ভুত লাগছে।

শরৎচন্দ্র মুচকে হেসে বললেন—এটা হিঁদুর বাড়ি। এসো, ওপরে এসো।

উপরের ঘরে প্রবেশ করে যোগেন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন শরৎচন্দ্রের কাণ্ডকারখানা। ক্ষুদ্র গৃহটির সম্মুখে বিস্তৃত ময়দান। ময়দানের প্রান্তসীমায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি পুজনডং-এর খাঁড়িটি। রেঙ্গুন থেকে বের হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকের জনপথের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করেছে।

শরৎচন্দ্র বললেন—সরকার, অত বাইরে দেখছো কি? ঘরটা ঠিক আর্টিস্টিক বলে মনে হয় না?

—খুব হয়। কই দেখান আপনার ছবি।

শরৎচন্দ্র স্টুডিয়ো-ঘরের পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে বললেন—এই ছ্যাখো সরকার—

যোগেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের আশ্চর্য শিল্পদক্ষতা দেখে বলে উঠলেন—এ শিক্ষায় আপনার গুরু কে দাদা?

—আমি নিজেই— ব'লে বাম হাতের তর্জনী দিয়ে নিজের কপালটি দেখিয়ে মুচকে হাসলেন শরৎচন্দ্র।

এমন সময় রাস্তার উপর থেকে শোনা গেল—ওহে চাটুজ্যে, আছ নাকি?

শরৎচন্দ্র জানলার কাছে এসে বাইরে তাকিয়ে বললেন—আরে কে ও? বসাক নাকি হে? আরে, এসো এসো।

অল্পক্ষণের মধ্যে বসাক মশায় এসে হাজির হলেন। তাঁর হাতে একটি লাঠি। যোগেন্দ্রনাথকে দেখে একগাল হেসে বলে উঠলেন—আরে, সরকার যে! কতক্ষণ?

—এই হলো কতক্ষণ—

—বেশ বেশ— ব'লে বসাক মশায় একটা টুলের উপর বসে বললেন—মাঝে মাঝে এদিকে এসো হে! বেশ খোলা জায়গা। কি বল চাটুজ্যে?

শরৎচন্দ্র তামাক সেবন করতে করতে বললেন—সে ওই সরকার জানে। কিন্তু—আমি আশ্চর্য হচ্ছি, এই রবিবারের ছুটির দিনে এত সকালে কি করে এলে বসাক?

—এলুম তোমার ছবি-আঁকা দেখতে। বেশ এঁকেছো
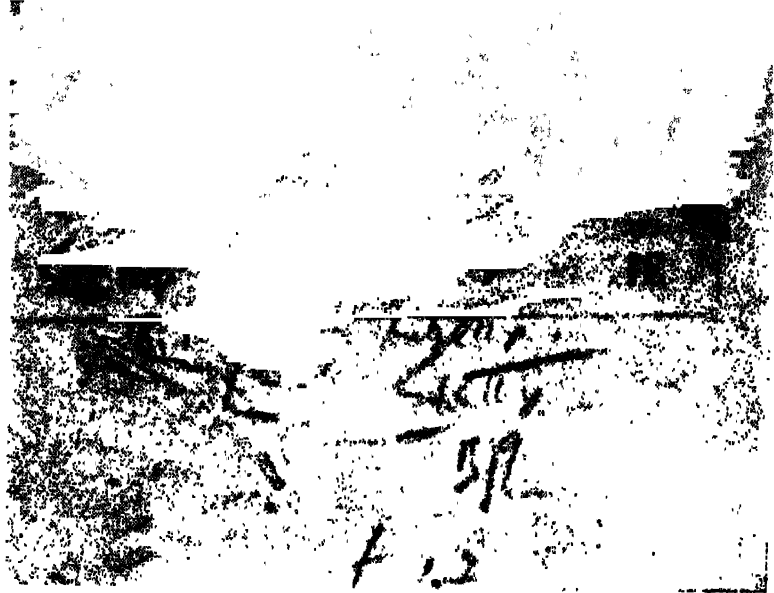
শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত রেখাচিত্র (অপ্রকাশিত)

হে চাটুজ্যে!— ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে থেকে বলে উঠলেন বসাক।

শরৎচন্দ্র বসাক মশায়ের কথা শুনে হো-হো করে হেসে বললেন—কাগজ কলম আনবো নাকি?

—কেন বল তো চাটুজ্যে?

—একটা সার্টিফিকেট দিতে হবে না?

—বটে! রসিকতা রাখো, চাটুজ্যে।

শরৎচন্দ্র টিপ্পনী কেটে বললেন—আরে, তোমার একটা সই থাকলে বর্মা-মুল্লুকে অনেক প্রশংসা পাবে। কি হে সরকার, সত্যি কিনা বল না?

যোগেন্দ্রনাথও একটু বিদ্রূপের সুরে বললেন—শুধু সই নয়, টি. এন. বৈসাক লিখে দিলেই যথেষ্ট।

বসাক মশায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন—আমার সার্টিফিকেটের তেমন কদর হবেনা, চাটুজ্যে। মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। চোখে ভালো লাগলেই ছবির প্রশংসা করি।

সত্যি-সত্যিই শরৎচন্দ্রের এই চিত্রশিল্পের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সবাই করেছিলেন। এবং অনেকেই বলেছিলেন এগজিবিশনে পাঠিয়ে দিতে। শরৎচন্দ্র তাতে রাজী হননি।

একদিন আপিসে এসে শরৎচন্দ্র অবাক হয়ে গেলেন তাঁর সীটে বসাক মশায়কে বসে থাকতে দেখে। রক্তবর্ণ চক্ষুদুটি সারা আপিসটাকে যেন শাসাচ্ছে। শরৎচন্দ্র বুঝতে পারলেন সব। বসাক মশায় এই আপিসের বহুদিনের একজন চাকুরে। হয়তো আপিসের কাজের ত্রুটির জন্য সাদা-চামড়ার দল তাকে অকথ্য কিছু বলেছে। শরৎচন্দ্র শান্ত-সুরে বললেন—কি হে বসাক, অমন মুখ রাঙা করে? হলো কি?

বসাক মশায় বললেন—আমাকে একটা পরামর্শ দাও দিকি চাটুজ্যে ?

—পরামর্শ! সেটা আবার কি বসাক ?

—দ্যাখো চাটুজ্যে, তোমরা হচ্ছো লেখাপড়া-জানা লোক। আমাকে তোমরা কোর্টের আর্দালি বলো, দারোয়ান বলো, যাই বল না কেন,—তোমরা আমার স্বগোত্রীয়। কিন্তু ঐই শালার দেশের প্রতি ঘেন্না ধরেছে। শুধু কি তাই চাটুজ্যে! ভাবছি সাদা-চামড়ার দলগুলি কবে নিপাত যাবে।

শরৎচন্দ্র বললেন বুঝিয়ে—এই তিরিশ বছর তো বর্মা-মুল্লুকে আছো, আর কেন ? দেশে যাওনা ?

বসাক মশায়কে জোর করে দেশে পাঠিয়ে দিতে চাইলেও, তিনি যেতেন না। বসাক মশায় এখানে এক বর্মী মহিলাকে নিয়ে ঘরসংসার করতেন। দেশে তাঁর স্ত্রী-পুত্র সবই ছিল। অথচ তাদের প্রতি তাঁর কোনো দৃষ্টি ছিল না। শরৎচন্দ্র একদিন দুঃখ করে যোগেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন—ওহে সরকার, সতীর দীর্ঘশ্বাস যাবে কোথায়! সে দীর্ঘশ্বাসের আগুনের হাওয়া ওর হাড়ে লেগে ওকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তো মারছেই, আরও মারবে। এখন হয়েছে কি ?

মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। সুন্দর পরিবেশের মধ্যে মমতাময়ী সহধর্মিণীর একান্ত সান্নিধ্যে শরৎচন্দ্রের জীবনে বৈশ্বানরের তাণ্ডবলীলা একদিন মহা বিপ্লব বাধিয়ে তুললো।

অগ্নিদেবতা শরৎচন্দ্রের সর্ব্বস্ব কি ভাবে গ্রাস করেছিলেন তার এক ঘটনার কথা জানতে পারা যায়।

তখন রাত বেশী হয়নি। শরৎচন্দ্র যে ফ্ল্যাটে বাস করতেন তার পাশেই থাকতো এক ধোপা। হঠাৎ ধোপার ঘরে আগুন লেগে যায়। লোকজনের চীৎকার উঠেছে। শরৎচন্দ্র বুঝতে পারলেন, এ আগুন তাঁর ফ্ল্যাটটিকেও গ্রাস করবে। সহসা ধোপার বউ-এর ক্রন্দন শুনতে পেলেন—'ও বাবা গো! আমার ছাগল পুড়ে গেল…' শরৎচন্দ্র জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন অগ্নিদেবতা শত শিখায় লেলিহান হয়ে ছুটে আসছেন। তাড়াতাড়ি কিছু জিনিসপত্র একটা টিনের তোরঙ্গের মধ্যে পুরে নীচে ফেলে দিলেন। তারপর বাড়ির কাছেই ১৪নং লোয়ার পুজনডং স্ট্রীটে আরেকটি কাঠের বাড়িতে হিরণ্ময়ী দেবীকে নিয়ে চলে এলেন। নিজের ঘরের জিনিস উদ্ধার করতে যাবেন—ধোপা বউ-এর ক্রন্দন শুনে বিচলিত হয়ে পড়লেন; বললেন—কি হয়েছে তোমার?

—আমার ছাগল-ছানাটা।

—কোথায়?

—ঐ আগুনের মধ্যে।

শরৎচন্দ্র ছুটে যাবেন, এমন সময় হিরণ্ময়ী দেবী দূর থেকে বলে উঠলেন—ওগো, যেয়ো না—দাঁড়াও!

শরৎচন্দ্র কোনো মানা শুনলেন না। সেই আগুনের মধ্যে থেকে ছাগল-ছানাটিকে উদ্ধার করে আনলেন। তারপর নিজের ঘরের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখতে পেলেন, অগ্নিদেব তাঁর ঘরটি কেমন গ্রাস করেছেন! পাগলের মতো ছুটে গিয়ে দাঁড়ালেন হিরণ্ময়ী দেবীর পাশটিতে। নূতন ফ্ল্যাটের দ্বিতল বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন—তাঁর লাইব্রেরী, 'মহাশ্বেতা', 'রাবণ-মন্দোদরী', লেখার খাতা সবই পুড়ে যাচ্ছে। দুঃখ করে তাই বললেন—বড়বৌ, আমার লাইব্রেরী,

মহাশ্বেতা, চরিত্রহীন, নারীর ইতিহাস—এরা যে সব পুড়ে গেল !—বলতে বলতে তাঁর চক্ষুদুটি অশ্রুপূর্ণ হয়ে এলো।

এই আগুনে পুড়ে-যাওয়া বাড়িটির অদূরে একটি প্রকাণ্ড মাঠ ছিল। সতীশচন্দ্র দাস তাঁর বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে হাওয়া খাচ্ছিলেন। সহসা শরৎচন্দ্রের বাসার কাছে আগুন লেগেছে দেখে ছুটে এলেন—দেখতে পেলেন সে বাসা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। নূতন বাসায় শরৎচন্দ্র মৌন হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—দেখছেন ঐ আগুনকে—কি যেন সব তিনি হারিয়ে ফেললেন !

সত্য-সত্যই ওই আগুন শরৎচন্দ্রকে সম্পূর্ণ অসহায় করে দিয়েছিল। তাঁর ছোটবেলাকার বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা ১৯১২ সালের চিঠিখানি পড়লেই তা বোঝা যায় ঃ

প্রমথ,

আমার সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিয়াছ। তাহা সংক্ষেপে এই—চাকরি করি, ৯০৲ টাকা মাহিনা পাই, ১০৲ টাকা এলাউন্স। একটা ছোট্ট দোকানও আছে। দিনগত পাপক্ষয় ; কোনমতে কুলাইয়া যায় ; এইমাত্র। সম্বল কিছুই নাই।

...

পড়িয়াছি বিস্তর, প্রায় কিছুই লিখি নাই। গতবৎসর শারীর-বিদ্যা, প্রাণী-বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কতক পড়িয়াছি।

...

আগুনে পুড়িয়াছে সমস্তই। লাইব্রেরী এবং 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। 'নারীর ইতিহাস' প্রায় ৪০০।৫০০ পাতা লিখিয়াছিলাম ; তাও গেছে।

...

ছবি বলিতে অয়েল পেন্টিং অনেকগুলি করিয়াছিলাম। আমার সাধের 'মহাশ্বেতা' তাহাও তো ভস্মসাৎ হইয়াছে। শুধু আঁকিবার সরঞ্জামগুলি বাঁচিয়া গিয়াছে।

এখন আমার কি করা উচিত যদি বলিয়া দাও তো, তোমার কথামতো দিনকতক চেষ্টা করিয়া দেখি। Novel, history, painting কোন্‌টা? কোন্‌টা আবার শুরু করি বল তো?

ইতি—তোমার স্নেহের শরৎ

নিঃস্ব শরৎচন্দ্র। আয় বাড়াতে এই সময়ে শরৎচন্দ্রকে একটা চায়ের দোকান খুলতে হলো। আপিসে একদিন এসে শরৎচন্দ্র বন্ধুবান্ধবদের ডেকে বললেন—ওহে, আমি একটা চায়ের দোকান খুলেছি।

বন্ধুরা অবশ্য কেহ বিশ্বাস করলেন না। কিন্তু শরৎচন্দ্রের পীড়াপীড়িতে আপিসের ছুটির পর বন্ধুবান্ধব তাঁর চায়ের দোকান দেখতে এলেন। তাঁর বাড়ির অনতিদূরেই একটা কাঠের বাড়ির নীচেই চায়ের দোকান। সকলের মন কৌতূহলী হয়ে উঠলো। একজন বলে উঠলেন—তাহলে তো শরৎবাবুকে চাকরি ছেড়ে দিতে হবে। নিজে না বসলে চায়ের দোকান দু'দিনেই উঠে যাবে।

শরৎচন্দ্র বললেন—না হে, না, বসতে হবে না। জানো, আমি কি বন্দোবস্ত করেছি? এক টিন দুধে কত চিনি মিশোতে হবে, তাতে কত পেয়ালা চা হবে, আমি সব ঠিক করে নিয়েছি। সকালবেলা দুধের টিন কিনে দেবো; সারা দিন কত টিন দুধ খরচ হলো, সন্ধ্যাবেলায় হিসেব করলেই পয়সার হিসাব ধরা যাবে।

শরৎচন্দ্রের বুদ্ধির প্রশংসা সেদিন সকলকেই করতে হয়েছিল। সত্যি কথা কি, রেঙ্গুনে চায়ের দোকান লাভজনক ব্যবসা। এক একটা চায়ের দোকান দু'তিন হাজার টাকায় বিক্রি হতো। (কোনো কারণবশতঃ শরৎচন্দ্রকে পরে চায়ের দোকানটি বিক্রি করতে হয়েছিল।)

ঠিক এই সময়ে ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'ভারতী'তে নিরুপমা দেবীর 'অন্নপূর্ণার মন্দির' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। শরৎচন্দ্র পত্রিকাখানি রেঙ্গুনে পেতেন। যোগেন্দ্রনাথ সরকার একদিন শরৎচন্দ্রের বাসায় এসে তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বললেন—দেখেছেন শরৎদা, 'ভারতী'তে নিরুপমা দেবীর 'অন্নপূর্ণার মন্দির'? আচ্ছা, আপনি কেন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছেন বলুন তো?

শরৎচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন—সরকার, বুড়ি (নিরুপমা দেবী) ভালোই লেখে হে। ওর পদ্যও যেমন, তেমনি উপন্যাস লেখার ক্ষমতাও আছে। তা ছাড়া বুড়ির দাদা পুঁটু (বিভূতিভূষণ ভট্ট) একজন দার্শনিক। এরা দু'ভাইবোন বাদে যারা আমাকে লেখক বলে খাতির করে, তারা হচ্ছে আমার উপীন মামা, সুরেন মামা, গিরীন মামা। তা ছাড়া সৌরীন-ভায়া তো আছেই। আমার বড় আনন্দ যে, আমার এইসব অন্তরঙ্গ বন্ধুদের লেখা কাগজে বের হচ্ছে।

যোগেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে বললেন—আচ্ছা শরৎদা, ওঁদের লেখা বেরুচ্ছে আর আপনি তাঁদের সাহিত্যের গুরু হয়ে খেই হারিয়ে বসে আছেন কেন বলুন তো?

শরৎচন্দ্র ম্লান হেসে বললেন—সরকার, লিখবো এমন বল পাই কই? জীবনে অনেক কিছুই করবো ভেবেছিলাম। যদি সত্যি আমার লেখা ভালো হতো, সম্পাদকরা আগ্রহ করেই নিতে চাইতো। বুঝলে সরকার, আমি নিরুপায়।

যোগেন্দ্রনাথ বললেন—আপনার এসব কথার কোনো অর্থই হয় না। সব পারেন আপনি।

—কি বললে সরকার?— ম্লান হেসে শরৎচন্দ্র বললেন—স্বচক্ষে না দেখেছি এমন তো নয়? নূতন লেখকরা সম্পাদকের দোরে

যেরকম ধর্না দেয়, তা দেখলে লেখক-বেচারিদের ওপর 'পিটি' হয়। কোলকাতায় তো অনেক কাগজ আছে, ফণীবাবুই ('যমুনা'র সম্পাদক) যা চেনেন। সমাজপতি মশায়ের 'সাহিত্য' ভয়ানক একটা ব্যাপার তার। সেখানে লেখা পাঠাতে সাহস হয় না।

যোগেন্দ্রনাথ বিস্ময়ের সুরে বলে উঠলেন—আপনি কী যে বলেন, শরৎদা! আপনার মধ্যে যে-শক্তি রয়েছে, অনেকের মধ্যে তাও নেই। আমি জোর করেই তা বলছি।

শরৎচন্দ্র বললেন—সরকার, আমাকে পিটিয়ে সাহিত্যিক করতে চাও, না? তাই বুঝি তোমাদের এত সহানুভূতি আর উৎসাহ। দুঃখ শুধু এই সরকার, আমার দ্বারা বোধ হয় আর কিছু হবে না! দেখা যাক্, 'রামের সুমতি'টা কেমন হয়।

যোগেন্দ্রনাথ সরকার উৎসাহ দিয়ে বলে উঠলেন—দেখবো বইকি, শরৎদা। আপনি 'রামের সুমতি'টা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলুন। বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবের সমস্ত সভ্যই আপনার 'রামের সুমতি' শুনতে উদ্‌গ্রীব।

—ওকি সরকার, এ কথা তুমি ও-মহলে প্রকাশ করেছো?

—তাতে হয়েছে কি শরৎদা? আপনি যে লেখক, ওরা তা জানে।

আপিসের টিফিনের পর যোগেন্দ্রনাথ 'রামের সুমতি'র কথা পুনরায় প্রচার করলেন দাদামশায়ের কাছে। দাদামশাই পূর্বে একসঙ্গেই এখানে কাজ করতেন। বর্তমানে এই আপিসের অন্য একটি ডিপার্টমেণ্টে বদ্‌লি হয়েছেন। টিফিনের পর শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে রসিকতা ক'রে বললেন—হ্যাঁ ভাই শরৎ, এই বুড়ো-দাদাকে গান শোনাতিস, তাও বন্ধ করলি? শুনছি, তুই নাকি খুব সাহিত্যিক হয়ে পড়েছিস? সত্যি করে বল্ তো দাদা?

শরৎচন্দ্র মুচকে হেসে বললেন—এ কথা কোথা থেকে জানলেন দাদামশাই? নিশ্চয় সরকার বলেছে?

—তা বলবেই তো। ওরা তো লুকোচুরি জানে না। তা যাই হোক দাদা, দু'চারখানা বই পড়তে-টড়তে দিস।

আপিসের আর একটি বাবু নিশানাথ বসু বললেন—বুঝলেন দাদামশাই, শরৎবাবু আমাদের শুধু লেখক নন, একজন নাম-করা লেখক-ই।

—তাই হোক আমাদের শরৎ-ভাই। তা, হ্যাঁরে শরৎদা—এই বুড়ো দাদামশাইকে একেবারে ভুলে যেতে হয়? মাঝে মাঝে মেসে তো যেতে পারিস?

দাদামশাই চলে গেলে শরৎচন্দ্র যোগেন্দ্রনাথকে বলে উঠলেন—তোমাকে না মানা করেছি সরকার? এমন ঢাক পিটিয়ে তোমরা আনন্দ পেতে পারো, কিন্তু আমার অবস্থাটা কী হয় বল তো?

এইবার শরৎচন্দ্র 'রামের সুমতি' লেখা সমাপ্ত করতে পূর্ণ উদ্যমে লেগে পড়লেন। একদিন তা শেষ হলো। যোগেন্দ্রনাথ সরকারও একদিন পাণ্ডুলিপিটি হস্তগত করে বাড়ি নিয়ে গেলেন পড়তে। পড়া শেষ হলে, আপিসে এসেই যোগেন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে শরৎচন্দ্রকে বলে উঠলেন—'রামের সুমতি' পড়তে পড়তে আমার চোখে জল এলো, শরৎদা। বেচারী রামের প্রতি যেমন মায়া হয়, বৌদি নারায়ণীর প্রতিও তেমনি। দেখবেন শরৎদা, আমি আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি, 'রামের সুমতি' বাংলাদেশে হৈ-চৈ বাধিয়ে দেবে।

—তাই নাকি হে সরকার?

—আপনি যতই না মানুন। আমরা বলছি, জাত-লেখক বলতে আপনি-ই যা।

শরৎচন্দ্র এই সময়ে অনেকগুলি লেখায় হাত দিয়েছিলেন। নূতন করে 'চরিত্রহীন' প্রায় অর্ধেকের উপর লেখা হয়ে গেছে। শরৎচন্দ্র সেদিন চৌধুরীমশায়ের বইয়ের দোকানে গিয়ে 'রামের সুমতি' 'যমুনা'য় পাঠিয়ে দিলেন। 'যমুনা'তে 'রামের সুমতি' কতখানি সাড়া জাগিয়েছিল তা জানতে পারলেন একদিন ফণীন্দ্রনাথ পালের চিঠি পেয়ে।

শরৎচন্দ্র সেইদিন থেকে নিজেকে পূর্ণাঙ্গ লেখক বলে মনে করলেন।

দেখতে দেখতে 'যমুনা'র পাতায় 'বিন্দুর ছেলে' ও 'পথনির্দেশ' আত্মপ্রকাশ করলো। বাংলাদেশে ও-ছুটি নিয়েও বেশ হৈ-চৈ পড়ে গেল। শুধু কি তাই? অজস্র চিঠিও শরৎচন্দ্রের কাছে আসতে লাগলো। বাংলার সমস্ত মাসিকপত্র শরৎচন্দ্রের লেখা পাবার জন্য তাগাদা শুরু করে দিলো। ঠিক এইসময়েই প্রমথ ভট্টাচার্যের চিঠি এলো—'ভারতবর্ষ' নামে নূতন এক পত্রিকা তাঁরা বের করছেন।

সেদিন আপিসে গিয়ে শরৎচন্দ্র যোগেন্দ্রনাথকে কিছু বললেন না। কোর্ট-বাজারে যেখানে চা খেতেন সেখানে গিয়ে যোগেন্দ্রনাথকে চিঠিখানি দেখিয়ে বললেন—ওহে সরকার, মস্ত একটা সুখবর। আজ প্রমথর চিঠি পেলাম। সে লিখেছে হরিদাস চট্টোপাধ্যায় (বিখ্যাত পুস্তক-বিক্রেতা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র) 'ভারতবর্ষ' নামে একটা কাগজ বের করবেন। বিলাতের 'স্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিন' বা 'উইণ্ডসর ম্যাগাজিন'-এর মতোই বলা চলে— ব'লে পত্রখানি হাতে তুলে দিলেন শরৎচন্দ্র।

যোগেন্দ্রনাথ পত্রটি পাঠ করে বলে উঠলেন—এ যে দেখছি বরেণ্য কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় সম্পাদক! লেখকের সংখ্যা

অনেক। নামকরা ও অচেনা। তালিকায় দেখছি সৌরীন্দ্রমোহন মুখুজ্যে, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী প্রভৃতির নাম। যাক্ শরৎদা, এতে লিখলে আপনার নাম হবে।

—এসব কথা থাক্, সরকার। পাঠোদ্ধার ক'রে কি বুঝলে ?

যোগেন্দ্রনাথ বললেন—পাঠোদ্ধারে আপনি যা বুঝেছেন, আমিও তার বেশী কিছু বুঝিনি। আমার কথাটা ফেলবার নয়, শরৎদা।

শরৎচন্দ্র একটু আক্ষেপের সুরেই বললেন—ওহে, সে কথা কি আমি অস্বীকার করছি ? কিন্তু লিখব অত পরিশ্রম করে—তার উপর সম্পাদক কলম চালাবে, এ কেমন হয় ?

—নেহাত কাঁচা হলে তো কাটবেই। তা ছাড়া আপনার লেখা যে কাঁচা আমার তো তা মনে হয় না।

শরৎচন্দ্র বললেন—প্রমথ-ভায়া আমার সাহিত্য-রসিক। এখন ওর কথা না শুনলে, হয়তো রাগ করবে। অনেক চিঠি, টেলিগ্রাম সে করেছে। দেখা যাক্, গঙ্গার জল কতদূর গড়ায়।

শরৎচন্দ্র ভাবলেন অতবড় পত্রিকায় তাঁর ঠাঁই হওয়া শক্ত। সেই ভেবে শরৎচন্দ্র প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে একদিন একটি পত্র লিখলেন :

একটা অহঙ্কার করবো মাপ করবে ? যদি কর তো বলি। আমার চেয়ে ভাল Novel কিংবা গল্প এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবে না ; যখন এই কথাটা মনে জ্ঞানে সত্য বলে মনে হবে, সেইদিন প্রবন্ধ বা গল্প-উপন্যাসের জন্য অনুরোধ কোরো। তার পূর্বে নয়। এই আমার এক বড় অনুরোধ তোমার উপর রইলো। এ বিষয়ে আমি অসত্য খাতির চাই না ; আমি সত্য চাই।

ইতি—তোমার স্নেহের শরৎ। (৪ঠা এপ্রিল, ১৯১৩)

শরৎচন্দ্রের চিঠি পেয়ে প্রমথনাথ কিন্তু নিরাশ হলেন না। ক্রমাগত চিঠি ও তার পাঠাতে শুরু করলেন। শরৎচন্দ্র প্রায়

সঙ্গে সঙ্গেই 'চরিত্রহীন'-এর পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিলেন 'ভারতবর্ষের' কর্তৃপক্ষের কাছে। এর কিছুদিন পরে 'ভারতবর্ষ' আত্মপ্রকাশ করলো পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতিকৃতিসহ। সম্পাদক হলেন মাসিক বসুমতী পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক জলধর সেন মহাশয়। প্রমথনাথ প্রথম সংখ্যাটি শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠালেন। পত্রিকাখানি হাতে পেয়ে শরৎচন্দ্র অবাক হয়ে গেলেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অকস্মাৎ মৃত্যুতে। আপিসে এসে পত্রিকাখানি যোগেন্দ্রনাথকে দেখিয়ে বললেন—সরকার, পত্রিকাটি নেহাত মন্দ হবে না। কিন্তু আসল মালিক-ই চলে গেল হে!

যোগেন্দ্রনাথ বললেন—সম্পাদক কে হলেন শরৎদা?

—জলধর সেন মহাশয়। ইনি একজন মস্তবড় সাহিত্যিক, সরকার।

কিন্তু এদিকে প্রমথ ভট্টাচার্যের চিঠি পেয়ে শরৎচন্দ্র খুবই অনুতপ্ত হলেন। কারণ 'ভারতবর্ষের' কর্তৃপক্ষ 'চরিত্রহীন' ছাপতে চান না। শরৎচন্দ্র পূর্বেই জানতেন, এ বই বাংলাদেশের কেহই ছাপবে না। (অবশ্য 'চরিত্রহীন' 'ভারতবর্ষ' কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় ফণীবাবু ১৯১৭ সালের কার্তিক থেকে বৈশাখ মাসের 'যমুনা'র সংখ্যাগুলিতে কিছু অংশ পরে ছাপেন।)

শরৎচন্দ্র উৎসাহ পেয়ে অখ্যাত পত্রিকা 'যমুনা'য় পাঠিয়ে দিলেন 'বিন্দুর ছেলে' ও 'পথনির্দেশ'। বই দুটি 'যমুনা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকলো। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক খ্যাতি তখন বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি তার কিছুই জানতে পারলেন না। এদিকে 'ভারতবর্ষের' কর্তৃপক্ষ শরৎচন্দ্রের কাছে লেখা পাঠাবার জন্য টেলিগ্রাম ও পত্র দিয়ে তাগাদা শুরু করে দিলেন।

এই সময়ে শরৎচন্দ্র 'বিরাজ বৌ' লিখতে শুরু করেন আহার-নিদ্রা ভুলে। একদিন তা শেষ হলো। অবশ্য তখন এ বইখানির নামকরণ হয়নি। যোগেন্দ্রনাথকে একদিন তা পড়তে দিলেন। পড়া শেষ করে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন যোগেন্দ্রনাথ।

একদিন চৌধুরী-মহাশয়ের দোকানে 'বিরাজ বৌ'-এর প্রথম কিস্তি 'ভারতবর্ষে' পাঠাবার সময় শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন যোগেন্দ্রনাথকে—আচ্ছা, কী নাম দেওয়া যায় বল তো সরকার?

যোগেন্দ্রনাথ বললেন—কেন?—'বিরাজমোহিনী'।

—বেশ নাম। তার চেয়ে 'বিরাজ বৌ' নাম দেওয়াই ভালো। ছাখো সরকার, মোহিনী-চরিত্র তেমন ইম্পর্টাণ্ট নয়।

যোগেন্দ্রনাথ মৃদু হেসে বললেন—এই যেমন ধরুন-না শরৎদা, যোগেন চাটুজ্যের 'কনে বৌ', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজ বৌ',—আর তৃতীয়টি হবে শরৎ চাটুজ্যের 'বিরাজ বৌ'।

শরৎচন্দ্র হো-হো করে হেসে বললেন—ঐ তো তোমাদের কেমন একটা রোগ! তাঁদের 'কনে বৌ', 'মেজ বৌ' যত খুশী থাক্ তাতে আমার কিছু লোকসান নেই।— কথাটা শেষ করে নীল পেন্সিল দিয়ে লিখে দিলেন—'বিরাজ বৌ'—গল্প।

যোগেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন—ওকি শরৎদা, উপন্যাসকে গল্প বলে ছেড়ে দিচ্ছেন? প্রমথ ভট্টাচার্য মহাশয় কি গল্প পাঠাতে বলেছিলেন?

—তোমার কথাই থাক্, 'বিরাজ বৌ' গল্প নয়, উপন্যাস।— পেন্সিল দিয়ে লিখে দিলেন শরৎচন্দ্র।

তারপর একটা চায়ের দোকানে বসে চা খেতে খেতে যোগেন্দ্রনাথ বললেন—দেখুন শরৎদা, 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে'র যত না নাম
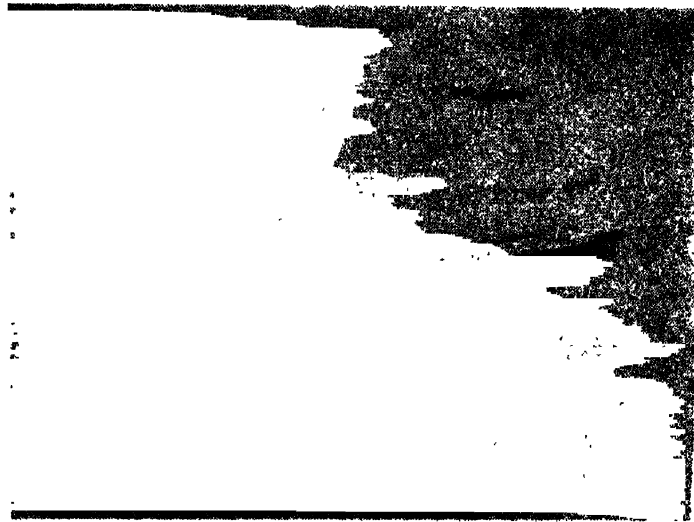
'চরিত্রহীন'-এর লেখক শরৎচন্দ্র

'বিরাজ বৌ'-এর লেখক শরৎচন্দ্র

হোক, 'বিরাজ বৌ'-এর মূল্য তার চেয়ে যথেষ্ট। প্রমথবাবু যা বলেছেন তা সত্য, শরৎদা। 'ভারতবর্ষ' এক বিখ্যাত পত্রিকা হবে। তা ছাড়া অতবড় একটা পাবলিশার—আপনার বরাত এবার খুলে গেল দেখছি, শরৎদা।

—কি রকম, সরকার ?

—বুঝতে পারছেন না ? 'ভারতবর্ষের' কত তাগাদা ? ফণীবাবুর 'যমুনা' তো আছেই। তা ছাড়া প্রফেসার সত্যেন ভদ্রের 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী' নামে একখানি ইংরেজী কাগজে আপনাকে লিখতে হবে। সত্যি শরৎদা, আপনার এখন চতুর্দিকে জয়গান।

চা খাওয়া শেষ হ'লে তাঁরা দুজনেই বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। রাস্তায় চলতে চলতে শরৎচন্দ্র বললেন—ছ্যাখো সরকার, লিখি তো অনেক। কিন্তু আমার 'গুরুশিষ্য সংবাদ' রচনাটি পড়লে তোমরা হয়তো তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবে।

যোগেন্দ্রনাথ বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—এত জিনিস থাকতে 'গুরুশিষ্য সংবাদ' কেন ?

—হ্যাঁহে হ্যাঁ, কাল আপিসে নিয়ে যাব। তোমরা সব পড়ে মতামতটা জানিয়ো। নইলে কাগজে পাঠাতে পারছি না।

লেখার জগতে প্রবেশ করে শরৎচন্দ্র অনেক সময় নিজের সংসারটির কথা ভুলে যেতেন। এর জন্য হিরণ্ময়ী দেবী কম দুঃখ বোধ করতেন না। অনিয়মে খাওয়া, অধিক রাত পর্যন্ত লেখা এসব যেন তাঁর মজ্জাগত স্বভাব হয়ে দাঁড়ালো। সংসারের কোথায় অভাব তাও লক্ষ্য করতেন না। হিরণ্ময়ী দেবী দুঃখ করে বলতেন—হ্যাঁগা, বাজারে না গেলে খাবে কি ?

শরৎচন্দ্র হাসিমুখে জবাব দিতেন—তুমি তো আমার ঘরে লক্ষ্মী, 'ম্যানেজ' করে নাও না।

আশ্চর্য হয়ে যেতেন হিরণ্ময়ী দেবী আত্মভোলা মানুষটির কথা শুনে। অথচ শরৎচন্দ্রকে অনেক সময় দেখা গেছে অকারণে রাশি রাশি বাজার করে আনতে।

আপিসে 'গুরুশিষ্য সংবাদ' রচনাটি নিয়ে গেলে, লেখাটি পড়ে যে যার অভিমত প্রকাশ করলেন। কুমুদিনীকান্তবাবু বললেন—এবার দেখছি শরৎদার কপাল মন্দ।

নিশানাথবাবু বললেন—কোথায় উপন্যাস লিখবেন, তা নয় 'গুরুশিষ্য সংবাদ'!

শরৎচন্দ্র শুধু নীরব হয়ে শুনেই যান সকলের অভিমত।

যোগেন্দ্রনাথ বললেন—সত্যি শরৎদা, আপনাকে সবাই গালমন্দ করবে।

শরৎচন্দ্র বললেন—তা করুক, সরকার। অমন গায়ে মাখতে নেই। তা ছাড়া ভাবছি কি জানো, সরকার—রবিবাবুকে এতে খুঁচিয়েছি।

যোগেন্দ্রনাথ বললেন—আপনি যা ভালো বোঝেন!

শরৎচন্দ্র মুচকি হেসে বললেন—তোমাদের কথাই ঠিক। আমার মতে কাগজে না পাঠানোই ভালো।

অবশ্য শরৎচন্দ্র লেখাটি পাঠিয়ে দিলেন 'যমুনা' পত্রিকায় তাঁর বড়দিদি অনিলা দেবীর নামে।

বাংলার কোনো পত্রিকা এটির তেমন সমালোচনা করেনি। কেবলমাত্র 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী' শরৎচন্দ্রের ছদ্মনামের স্বরূপটি প্রকাশ করলে গায়ের ঝাল মিটিয়ে। শরৎচন্দ্র তা পড়ে মনঃক্ষুণ্ণ হননি।

দেখতে দেখতে শরৎচন্দ্র 'পরিণীতা'য় হাত দিলেন। এই উপন্যাসটি লিখতে তাঁকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। 'বিরাজ বৌ' তখনও 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। শরৎচন্দ্রের কাছে 'বিরাজ বৌ'-এর জনপ্রিয়তার কোনো কথা এসে পৌঁছল না। একদিন কিন্তু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের এক সুদীর্ঘ উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপত্র এলো। শরৎচন্দ্র আনন্দে আত্মহারা হলেন।

এমনি করেই দিন চলতে লাগলো, কিন্তু ভাগ্যদেবতা অলক্ষ্যে হাসলেন। শরৎচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়লেন। লেখায় বুঝি এবার ভাঁটা পড়লো। এই সময়ে তাঁর হার্টের রোগ ধরে। বুক ধড়ফড়, মাথা-হাত-পা ঘামা—এইসবের জন্য শরৎচন্দ্র ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়লেন। আপিসে ছুটি নিলেন কিছুদিনের জন্য। এই অবসরে লিখতে শুরু করেন 'পণ্ডিতমশাই'। পরে 'ভারতবর্ষে' পাঠিয়েও দিলেন প্রকাশের জন্য।

হিরণ্ময়ী দেবীর সেবায় শরৎচন্দ্র একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন। এই সময়ে হিরণ্ময়ী দেবী ঠাকুরপূজায় আর বারব্রতে দিন কাটাতেন।

অসুস্থ শরৎচন্দ্রকে দেখতে একদিন যোগেন্দ্রনাথ সরকার এলেন। শরৎচন্দ্রের বিছানার পাশে বসে নানা কথার মধ্যে একটা বড় প্রশ্ন তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—আচ্ছা শরৎদা, আপনি তো এত সুন্দর সুন্দর গল্প লিখলেন, এদের প্লট তৈরি করতে আপনাকে মেহনত করতে হয় না?

শরৎচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন—মোটেই না। এই তো রাস্তা দিয়ে ভীড় ঠেলে চলেছি, এরই মধ্যে পাঁচ সাত দশ মিনিটে আমি প্লট একটা মনে মনে গড়ে ফেলি। লিখতে গিয়ে তার আকার ও গঠন দুটোই অনেকটা বদলে যায়। কিন্তু মূল প্লটটা ঠিকই থাকে।

যোগেন্দ্রনাথ বললেন—আমার তো প্লট মাথায় খেলে না।

—তাহলে গল্প লিখতে যেয়ো না। কবিতা লেখা ভালো।

তারপর একটু থেমে শরৎচন্দ্র বললেন—ত্যাখো, গল্পের প্লট-তৈরিই বড় কথা নয়। আসল কথা হোলো বক্তব্য বিষয়টিকে ফুটিয়ে তোলা চাই। অনেক সময় এক্সপীরিয়েন্স-এর ওপরই ভালোমন্দ নির্ভর করে।

সরস্বতীর বরপুত্র শরৎচন্দ্রের ভাগ্যলক্ষ্মী সত্যিই সুপ্রসন্ন হলেন। ইতিমধ্যে তাঁর উপন্যাসগুলি একটির পর একটি পুস্তকাকারে ছাপা শুরু হয়ে গেছে। বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী বলে তিনি এখন সুপরিচিত। সাহিত্যিক-মহলে তাঁর সম্মান ও প্রতিপত্তিও কম নয়।

॥ ছয় ॥

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে শরৎচন্দ্র কয়েক মাসের ছুটি নিয়ে কোলকাতায় এলেন। সপরিবারে চোরবাগানে পরিচিত একটা বাসায় বসবাস শুরু করলেন। তখন তাঁর চেহারাখানা দর্শনযোগ্য। গায়ে চায়না কোট, পরনে মোটা ধুতি, মাথায় একরাশ উস্কোখুস্কো চুল, পায়ে তালতলার চটি—রাস্তায় ঘুরে বেড়ান। কোলকাতার পথেই একটা বাচ্চা কুকুর আট আনা দিয়ে কিনলেন। [এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে যখন বাজে-শিবপুরে বসবাস শুরু করেন, সেই সময়ে রাণুবালা দেবী (অনিলা দেবীর দেওর-ঝি) জিজ্ঞাসা করলে শরৎচন্দ্র বলেন—সপরিবারে একবার কোলকাতায় এসে, রাস্তা থেকে 'ভেলু'কে আট আনা দিয়ে কেনেন।] তারপর সাবান দিয়ে তার

গা ধুইয়ে দোকান থেকে একটা চেন ও বক্‌লস কিনে গলায় বেঁধে, এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এই কুকুরটির নাম দিলেন 'ভেলু'। ভেলুই তাঁর সব—চব্বিশঘণ্টার সঙ্গী। এদিকে শরৎচন্দ্রের আগমনে তাঁর বাসায় যেমন ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের ভীড়, তেমনি মাসিকপত্রিকার কর্ণধারদের ঘন ঘন আসা-যাওয়া চলতে লাগলো। শরৎচন্দ্রের বাসায় প্রায়ই সাহিত্য-মজলিস বসতে লাগলো। সাহিত্য-বৈঠকের ফাঁকে ফাঁকে শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে পালিয়ে পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে গিয়ে গল্পগুজব করতেন। তন্মধ্যে কৈলাস বসু স্ট্রীটের প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের এবং সাহিত্যিক-বন্ধু সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি অন্যতম। আবার কখনো-বা বড়বোন অনিলা দেবীর বাড়িতে গিয়ে সুখদুঃখের কথা কইতেন। ভাইবোনদের খবরও নিতেন। কোলকাতায় শরৎচন্দ্রের দিন বেশ আনন্দেই অতিবাহিত হতে লাগলো।

একদিন ভেলুকে সঙ্গে নিয়ে শরৎচন্দ্র উপস্থিত হলেন 'যমুনা' পত্রিকার আপিসে। ফণীবাবু তখন ছিলেন না। সহঃ-সম্পাদক হেমেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় তখন প্রুফ দেখছিলেন। শরৎচন্দ্রকে তিনি কখনো দেখেননি। রুক্ষ-সুক্ষ চেহারার ভদ্রলোকটিকে কুকুর হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন—কাকে চাই?

—ফণীবাবুকে।

—তিনি বাইরে গেছেন। বসুন— ব'লে একটা ভাঙা বেঞ্চ দেখিয়ে দিয়ে শরৎচন্দ্রকে বসতে বললেন হেমেন্দ্রকুমার।

শরৎচন্দ্র ভাঙা বেঞ্চটার উপর বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে ফণীবাবু আপিসে প্রবেশ করে অবাক হয়ে বলে উঠলেন—আরে, শরৎবাবু যে! আপনাকে এখানে কে বসতে বললে?

শরৎচন্দ্র হেমেন্দ্রকুমারকে দেখিয়ে বললেন—ওই উনি।

ফণীবাবু গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন—হেমেন, এখানে বসাতে গেলে কেন! একটা চেয়ারে বসাতে পারলে না?

হেমেন্দ্রকুমার বললেন—আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

—ইনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ফণীবাবুর মুখের কথাটা শোনামাত্র লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলেন হেমেন্দ্রকুমার। শরৎচন্দ্রকে এই প্রথম তিনি দেখলেন।

আরেক দিনের ঘটনা। 'যমুনা' পত্রিকার আপিসে শরৎচন্দ্র গল্পগুজবে মত্ত আছেন। এমন সময় এক বন্ধুর মুখে সেখানে শরৎচন্দ্র আছেন শুনে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক রায়বাহাতুর জলধর সেন শরৎচন্দ্রকে দেখতে এলেন।

ফণীবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে বলে উঠলেন—এই যে দাদা, আসুন!

এই কথা শুনে শরৎচন্দ্রও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—দাদার সঙ্গে আমার নূতন করে পরিচয় করতে হবে না। আমি ওঁর বহুদিনের পরিচিত।

জলধর সেন মহাশয় অবাক হয়ে বলে উঠলেন—হঠাৎ যে 'দাদা' ব'লে সম্বোধন করলেন?

শরৎচন্দ্র মৃত্থ হেসে বললেন—পরিচয়ের কথাটা তাহলে খুলে বলি। আপনার বোধহয় মনে আছে যে কয়েক বৎসর আগে আপনি কুন্তলীন-পুরস্কারের রচনা-প্রতিযোগিতার পরীক্ষক ছিলেন। 'মন্দির' নামে একটি গল্পকে প্রথম স্থান দিয়েছিলেন।

জলধর সেন মহাশয় বললেন—প্রায় দেড়শো গল্প এসেছিল। তার মধ্যে 'মন্দির' গল্পটি আমার সবচাইতে ভালো লেগেছিল। মনে আছে, সেই গল্পটির উপর ছোট একটু মন্তব্যও লিখেছিলাম—'এই লেখকটি যদি চর্চা করেন তাহলে ভবিষ্যতে যশস্বী হবেন।'

কিন্তু সে গল্পের লেখক তো ভাগলপুরের শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

শরৎচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন—সে গল্পটি আমি-ই লিখেছিলাম মামা সুরেনের নামে। সুতরাং আপনার সঙ্গে পরিচয় আমার অনেকদিনের।

কোলকাতায় এসে শরৎচন্দ্র নব উৎসাহ ও উদ্দীপনা পেলেন। বন্ধুবান্ধবদের ভীড়ও ক্রমশঃ বাসায় বাড়তে লাগলো। 'বড়দিদি'র লেখক শরৎচন্দ্রকে দেখবার জন্য এম্‌নি ভীড় প্রায়ই লেগে থাকতো। মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও এখানে প্রায়ই আসতেন। একদিন শরৎচন্দ্র লুকিয়ে পালিয়ে এলেন 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। দেখা করে সুবিধা হলো না। 'সাহিত্যের' ভয়ানক শাসন দেখে পালিয়ে এলেন। ওখানে তাঁর স্থান হওয়া শক্ত। বাসায় এসে দেখলেন সেই বন্ধু-বান্ধবদের ভীড়। সেই ঘন ঘন চা-তামাক-খাওয়া আর গল্পগুজব।

একদিন শরৎচন্দ্র এক বন্ধুর মুখে শুনতে পেলেন রেঙ্গুনের বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ সরকারের পত্নী-বিয়োগের খবর। শরৎচন্দ্র শুনে দুঃখ পেলেন ; সান্ত্বনা দিয়ে একখানি পত্র লিখলেন—"জানিতে পারিলাম তোমার স্ত্রী মারা গেছে। বলিবার কিছু নাই। শুধু, ছেলেমেয়েদের মা-বাপ দুই-ই হয়ে থেকো। সমাজের কাছে, ধর্মের কাছে, বিবেকের কাছে। আশীর্বাদ করি, শান্তি লাভ কর—সুখী হও।"

কিছুদিন পরে ছেলেমেয়েদের নিয়ে যোগেন্দ্রনাথ সরকার কোলকাতায় এলেন। তারপর চোরবাগানে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ করতে এলেন। শরৎচন্দ্র আনন্দে অধীর হয়ে বলে উঠলেন

—ওহে সরকার নাকি হে, আরে এসো এসো! ওরে, শীগ্‌গির করে চা নিয়ে আয়, খাবার নিয়ে আয়—

যোগেন্দ্রনাথের দুঃখ-কাহিনী পূর্বেই শুনেছেন, তাই শরৎচন্দ্র আর কোনো কিছু বললেন না। আদর-আপ্যায়নের পর বন্ধুকে এগিয়ে দিতে শরৎচন্দ্র রাস্তায় নেমে, গেঞ্জির ওপর কোঁচার খুঁটটি গায়ে জড়িয়ে কথা বলতে বলতে রাস্তার অনেকদূর এলে, যোগেন্দ্রনাথ বললেন—এভাবে রাস্তায় বেরোলেন, কতজনে আপনাকে হয়তো চেনে—দেখলে কি মনে করবে?

—কী আর মনে করবে! আর ক'জনেই বা এখানে এ-মূর্তির সঙ্গে পরিচিত?

হাসতে-হাসতে যোগেন্দ্রনাথ বিদায় নিলেন। কিছুদিন পরে তিনি রেঙ্গুনে পুনরায় ফিরে যান।

শরৎচন্দ্রের এখানে বেশ দিন কাটছিল। একদিন অপ্রত্যাশিত-ভাবে রেঙ্গুন থেকে আপিসের জরুরী তার এলো।

প্রমথ ভট্টাচার্য বললেন—কিসের তার?

—আপিসের। আমাকে যেতে হবে এক্ষুনি।

—হঠাৎ যে?— উপেন্দ্রনাথ বললেন।

—ওদেশে সবই হঠাৎ—সবই অদ্ভুত।

তারপর বললেন—বড়-বৌকে তোমরা পরে জাহাজে তুলে দিয়ো।

শরৎচন্দ্র সেইদিনই রেঙ্গুনের উদ্দেশে পাড়ি দিলেন।

॥ সাত ॥

শরৎচন্দ্র ফিরে এলেন রেঙ্গুনে। সাহিত্য-লক্ষ্মীর আশীর্বাদ সমভাবে বর্ষিত হতে থাকলো তাঁর মাথার ওপর—তিনি নবোৎসাহে বই-লেখা শুরু করলেন। দেখতে দেখতে 'মেজদিদি', 'দর্পচূর্ণ', 'আঁধারে আলো', 'পল্লীসমাজ', 'চন্দ্রনাথ' আত্মপ্রকাশ করলো। তা ছাড়া শরৎচন্দ্র এই সময়ে কতকগুলি সমালোচনা ও প্রবন্ধ ছদ্মনামে লেখেন।

বই-লেখার অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়লো। স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীর অভাব তিনি বিশেষভাবে অনুভব ক'রে, ভেলুকে দিয়ে সত্বর তাঁকে রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করার জন্য কোলকাতায় বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে একখানি চিঠি দেন। প্রমথনাথও তাঁর নির্দেশমতো একজন বিশ্বস্ত লোকের সঙ্গে হিরণ্ময়ী দেবীদের পাঠিয়ে দেন।

এদিকে স্বদেশী-যুগের বক্তা সুরেন্দ্রনাথ সেন কার্যব্যপদেশে রেঙ্গুনে এলেন। তাঁকে সম্বর্ধনা করার জন্য বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবের সদস্যরা উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। শরৎচন্দ্রকে এই সম্বর্ধনা-সভার সভাপতি করার কথা উঠলো। বন্ধুরা যোগেন্দ্রনাথ সরকারকে ভার দিলেন তাঁর স্বীকৃতি আদায়ের জন্য।

শরৎচন্দ্রের বাসায় একদিন তিনি এলেন। বললেন—শরৎদা, বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবে সাহিত্য-সভা হচ্ছে। তা ছাড়া, বক্তা সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এসেছেন। আপনাকে সভাপতি হতে হবে।

শরৎচন্দ্র মৃদু হেসে শান্তকণ্ঠে বললেন—অত বাড়াবাড়ি ভালো নয়,

সরকার। আমি এমন কি সাহিত্যিক? সভাপতির আসন পাবার আমি যোগ্য নই।

যোগেন্দ্রনাথ ছাড়বার পাত্র নন। অবশেষে শরৎচন্দ্র রাজী হলেন।

সত্যি-সত্যিই, সেদিনকার অনুষ্ঠানে শরৎচন্দ্রের সভাপতির আসন পাওয়ায় সকলেই আনন্দিত। দাদামশাই এলেন। তাঁর স্নেহের শরৎদাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলে উঠলেন—'জয়, শরৎচন্দ্র কি জয়!' ঘরসুদ্ধ লোক সঙ্গে সঙ্গেই জয়ধ্বনি করে উঠলো। শরৎচন্দ্র লজ্জিত হয়ে পড়লেন। সাহিত্য-জীবনে এই তাঁর প্রথম সভাপতির আসন গ্রহণ করা। সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় প্রধান অথিতির আসন গ্রহণ করলেন। বয়োবৃদ্ধ দাদামশাইকেও উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হলো। সভাপতি ও প্রধান অতিথিকে মাল্যদানের পর 'ভাষার জয়' ও 'কণ্ঠসঙ্গীত' নামক দুটি গান হলো। প্রথমটি যোগেন্দ্রনাথ সরকারের রচনা। দ্বিতীয়টি অন্য জনের। অনেকে প্রবন্ধ পড়লেন যোগেন্দ্রনাথ 'প্রতাপাদিত্য' নামে স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করলেন। কুমুদিনীকান্ত কর মহাশয়ও একটি রচনা পড়লেন। সেদিন শরৎচন্দ্র যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে রেঙ্গুন-প্রবাসী বাঙালীরা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে প্রকৃতভাবে চিনতে পারলো। পরে এই অভিভাষণ 'যমুনা' ও 'ভারতবর্ষে' ছাপানোর জন্য উক্ত দুইটি পত্রিকার কর্তৃপক্ষ শরৎচন্দ্রকে চিঠি লেখেন। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

একদিকে আপিস-যাওয়া, অন্যদিকে সাহিত্য-সাধনা। এই দুয়ের মধ্যে পড়ে ১৯১৬ সাল থেকে শরৎচন্দ্রের আবার স্বাস্থ্যহানি ঘটলো। আপিস-যাওয়া বন্ধ। শুধু ছেলেমানুষের মতো বিছানায় শুয়ে-থাকা

ডাক্তার দেখালেন। তবুও তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারলেন না। ভয় হয়, আবার কি-একটা অসুখ ধরবে! ডাক্তার তাঁকে নির্দেশ দিলেন কিছুদিনের জন্য চেঞ্জে যেতে।

শরৎচন্দ্র এই সময়ে তাঁর দুঃখের কথা জানিয়ে হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে একখানি পত্র লেখেন :

ভায়া,

আমি এবার বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। সুদূর হইতে প্রমথ ভায়ার বাতাস লাগিল কি না বুঝিতে পারিতেছি না। এ আবার আরো খারাপ। এ শুনি বর্মা-দেশের ব্যারাম—দেশ না ছাড়িলে কোনদিন এও ছাড়ে না। তাই দু'য়ের এক বোধ করি অনিবার্য হইয়া উঠিতেছে। কি জানি ভগবানই জানেন। ভয় হয় হয়তো বা চিরকাল পঙ্গু হইয়া যাইব। যদি অদৃষ্ট আমার চিরকালের মত ভাঙ্গিয়াও থাকে, তাহাও যদি ঠিক জানিতে পারি তা হইলে ধীরে ধীরে এই মহাদুঃখ বোধ করি সহিয়া যাইবে।

... ছেলেবেলায় ভগবানকে বড় ভালবাসিতাম—মাঝে মাঝে বোধ করি সম্পূর্ণ হারাইয়াছিলাম। আবার শেষ বয়সে যদি তিনি দেখা দিতে আসেন তাই ভাল।

শরৎচন্দ্রের এই চিঠিখানি পাওয়ামাত্রই হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শরৎচন্দ্রকে ১০০৲ টাকা মাসিক আয়ের ভরসা দিয়ে এক চিঠি লিখলেন। শরৎচন্দ্রও তাঁর শারীরিক ও আর্থিক অবস্থা জানিয়ে হরিদাসবাবুকে আরেকখানি পত্র লিখলেন :

ভায়া,

আমি পীড়িত। এখানে সারিবে বলিয়া আর ভরসা করি না। দেহের আর সমস্ত বজায় রাখিয়াও জগদীশ্বর আমাকে যদি পঙ্গু করিয়াই শাস্তি দেন তাই ভাল। আমি এক বৎসরের ছুটি লইয়াই যাইব। আপনি আমাকে তিনশত টাকা পাঠাইয়া দিবেন।

আপিসে 'জয়েন' করলেন শরৎচন্দ্র। কিছুদিন পরে হরিদাসবাবুর তিনশত টাকা মনি-অর্ডার তাঁর হস্তগত হলো। আপিসে এসে শরৎচন্দ্রের কাজের কোনো উৎসাহ না দেখে আপিসের ইনচার্জ, সেকশন-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়লেন। শরৎচন্দ্র তা ভ্রূক্ষেপ করলেন না, আপন খুশীমতো কাজ আর গল্প-গুজব নিয়েই আপিসে সময় কাটিয়ে দিতে লাগলেন।

শরৎচন্দ্র একদিন যোগেন্দ্রনাথকে বললেন—সরকার, একটা সুখবর আছে।

—কি শরৎদা ?

—হরিদাস-ভায়া মোটা টাকা ইনসিওর করে পাঠিয়েছে। তোমার কথাই ঠিক, সরকার। জীবনের অনেকদিন তো কাটিয়ে গেলাম এখানে, আর ভালো লাগে না।

আপিসের হিন্দুস্থানী সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট বিনোদলালজী শরৎচন্দ্রের বই-এর সঙ্গে সুপরিচিত। তিনি বাংলা ভালো পড়তে ও লিখতে জানতেন। (যেদিন 'বিরাজ বৌ' হিন্দীতে বের হলো, তা পড়ে তিনি শরৎচন্দ্রকে অনেক উৎসাহ দিয়েছিলেন।) শরৎচন্দ্রের একবৎসরের ছুটির কথা শুনে তিনি উৎসাহ দিয়ে বললেন—চাটার্জি-সাব, বাংলা-মুল্লুকেই চলে যান,—মনে রাখবেন ওটা আপনার দেশ। এখানে কিছু হবে না।

শরৎচন্দ্র শেষ পর্যন্ত একবৎসরের ছুটির জন্য দরখাস্ত করলেন।

এই সময়ে অর্থাৎ ১৯১৬ সালে জাপান থেকে আমেরিকা-যাত্রা-পথে রবীন্দ্রনাথ ৭ই মে রেঙ্গুনে উপস্থিত হন। চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য।

গিরীন্দ্রনাথ সরকার, কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের পুত্র—ব্যারিস্টার

নির্মলচন্দ্র সেন ও অন্যান্য বন্ধুরা শরৎচন্দ্রকে ধরে বসলেন একটা অভিনন্দন-পত্র রচনা করবার জন্য। শরৎচন্দ্র সেই অভিনন্দন-পত্র রচনা করে দেন।

পরদিন ৮ই মে স্থানীয় জুবিলী-হলে নগরবাসীর পক্ষ থেকে নির্মলচন্দ্র সেন অভিনন্দন-পত্রটি পাঠ করেন। শরৎচন্দ্র সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো ঃ

জগদ্‌বরেণ্য শ্রীযুত সার্‌ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাইট, ডি-লিট মহোদয়

শ্রীকরকমলেষু—

কবিবর,

এই সুদূর সমুদ্রপারে বঙ্গমাতার ক্রোড়বিচ্যুত সন্তান আমরা আজ হৃদয়ের গভীরতম শ্রদ্ধা ও আনন্দের অর্ঘ্য লইয়া, আমাদের স্বদেশের প্রিয়তম কবি, জগতের ভাব ও জ্ঞানরাজ্যের সম্রাট—আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

আপনি অপূর্ব কবি-প্রতিভাবলে নব নব সৌন্দর্য ও নব নব আনন্দ আহরণ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এবং নব সুরে, নব রাগিণীতে বঙ্গহৃদয়কে এক নব-চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছেন।

আপনার কাব্য-কলার সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া প্রাচ্য-হৃদয়ের এক অভিনব পরিচয় অধুনা প্রতীচ্যের নিকট সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই পরিচয়ের আনন্দে প্রতীচ্য আজ প্রাচ্যের কবিশিরে সাহিত্যের যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা-মুকুট পরাইয়া দিয়াছে, তাহার আলোকে জননী বঙ্গবাণীর মুখশ্রী মধুর স্মিতোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

আপনার কাব্যবীণায় সহস্র অনির্বচনীয় সুরে ভারতের চিরন্তন বাণী, সত্য-শিব-সুন্দরের অনাদি গাথা ধ্বনিত হইয়া এক বিশ্বব্যাপী আনন্দ, অপরিসীম আশা ও অসীম আশ্বাসে মানব-হৃদয়কে আকুল ও উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। এই বিশাল সৃষ্টির অণুপরমাণু যে এক আনন্দে নিত্য পরিস্পন্দিত হইতেছে, এবং এক

অপরিচ্ছিন্ন প্রেমসূত্রে যে এই নিখিল জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, আপনার কাব্যে সেই পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছি, এবং আপনাকে—কোন দেশ বা যুগ-বিশেষের নয়—সমগ্র বিশ্বের কবি বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি। আপনার কথায়, কাব্যে, নাট্যে ও সঙ্গীতে যে মহান্ আদর্শ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, এক লোকাতীত রাজ্যের আলোকে আপনার নয়ন উদ্ভাসিত, এক অমৃত সত্তার আনন্দরসে আপনার হৃদয় অভিষিক্ত।

আপনার অকৃত্রিম একনিষ্ঠ আজন্ম বাণী-সাধনা আজ যে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্বর্ণ-উপকূলে আপনাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তথাকার আনন্দ-গীতি নিখিল মানব-হৃদয়কে নব নব আশা ও আশ্বাসে পরিপূর্ণ করিয়া আপনার সুমোহন কাব্যবীণায় নিত্যকাল ঝঙ্কৃত হইতে থাকুক; ইহাই বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রার্থনা। ইতি—

রেঙ্গুন,
২৫শে বৈশাখ
১৩২৩ বঙ্গাব্দ

ভবদীয় গুণমুগ্ধ
রেঙ্গুন-প্রবাসী বঙ্গসন্তানগণ

এদিকে ছুটি মঞ্জুর প্রথমতঃ বড়ই কঠিন হয়ে পড়ে। আপিসের বড়কর্তা বার্নার্ড-সাহেবের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের একদিন খুব বচসা হলো। বাক্‌যুদ্ধে শরৎচন্দ্র পরাজয় স্বীকার করলেন না বটে, কিন্তু মল্লযুদ্ধে পরাস্ত হলেন। তাঁর এই অপমান সহ্য হলো না; চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে শরৎচন্দ্র ১৯১৬ সালের মে মাসে রেঙ্গুন ত্যাগ করলেন। জাহাজঘাটে শরৎচন্দ্রকে বিদায় দিতে সমস্ত বন্ধুবান্ধবরাই এসেছিলেন।

ব্রহ্ম-প্রবাস এমনি করেই একদিন শেষ হলো।

যোগেশচন্দ্র মজুমদার ১৩৬৪ সালের 'যুগযাত্রী' পত্রিকার শ্রাবণ থেকে আশ্বিন সংখ্যায় তাঁর 'স্মৃতিকথা' প্রবন্ধে লিখেছেন:—"একবার

শীতকালে (সম্ভবতঃ ১৯২০ সালে) যখন তিনি মাতুলালয়ে কিছুদিনের জন্য বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য আসেন, সেই সময় আমিও নিজ কর্মস্থল সিমলা-শৈল হইতে ছুটি লইয়া ভাগলপুরে আসি। তাঁহার সহিত বহুদিন পরে দেখা হওয়ায় দুজনেই খুব আনন্দিত হই। তাঁহার বর্মাপ্রবাস সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হয়। কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার চাকরি-ত্যাগের কথা উঠে। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর পক্ষে ভবিষ্যতের কোনও চিন্তা না করিয়া হঠাৎ কর্ম-পরিত্যাগ যে খুবই দুঃসাহসিক ব্যাপার, সে কথা উল্লেখ করি। কি উপলক্ষ করিয়া তিনি চাকরি ছাড়িয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে জানিবার কৌতূহল হইয়াছিল। আমার ঔৎসুক্য-প্রকাশে তিনি চাকরি-ত্যাগের যে সরস বর্ণনা দিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া পরম কৌতুক বোধ করিয়াছিলাম।

শরৎচন্দ্র বলিলেন যে, তিনি আপিসে প্রবেশ করিয়া কিছুদিনের মধ্যেই কার্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিলেন। কিন্তু সুনামের কি ভয়ঙ্কর পরিণাম হইতে পারে, তাহা তিনি গোড়ায় অনুধাবন করিতে পারেন নাই। দেখা গেল, যে-বিভাগে তিনি কার্য করিতেন তাহার কঠিন কাজগুলি তাঁহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িতে লাগিল। কার্যে তাঁহার অবহেলা ছিল না, বরং যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে কার্যগুলি সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন। কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিলেন যে, চট্টগ্রাম বন্দর লইয়া একটি 'কেস্' গড়িয়া উঠে। এই বন্দরটি লইয়া বর্মা ও বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের মধ্যে বহু বৎসর হইতে বড় মন-কষাকষি চলিতেছিল। এমন কি, কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের রেলওয়ে-বোর্ডও এ-বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ছিল। আমি শেষোক্ত আপিসে কার্য করিতাম বলিয়া 'আপনাদের রেলওয়ে বোর্ড' বলিয়া ব্যাপারটি উল্লেখ করিলেন। দীর্ঘদিন ধরিয়া যে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে উহার মীমাংসা

যে কবে হইবে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী কেহ করিতে পারিতেন না। এমন কি, যে ব্যক্তি কার্যকালের প্রারম্ভে কেস্‌টিতে হাত দিয়াছিলেন তাহার কার্যকাল শেষ হইয়া আপিস হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেও উহার শেষ হইবার কোনও লক্ষণ দেখা দিল না। পরে উহা পঞ্চতন্ত্রে বর্ণিত মস্তকে চক্রধারী ব্যক্তির ন্যায় শরৎচন্দ্রের মস্তকে ভর করিল। তিনি এই কঠিন ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করিয়া তাঁহার উপরওয়ালার সন্তুষ্টি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন—এরূপ মনে হইল না। বরং একদিন আপিসে আসিতে সামান্য বিলম্ব হওয়ায় এংলো-ইণ্ডিয়ান সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টটি তাঁহাকে কয়েকটি অনুচিত কথা শুনাইয়া দিলেন। মন্তব্য কিছু রূঢ় হইয়া থাকিবে। শরৎচন্দ্রও তাঁহাকে অনুরূপ মন্তব্যে অভিনন্দিত করিলেন। শেষে কথা ছাড়িয়া ব্যাপারটি হাতাহাতিতে পর্যবসিত হইল এবং ফলে দুইজনেরই বক্ষদেশ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। উভয়ে মিলিয়া যখন সেই অবস্থায় একাউণ্টেণ্ট-জেনারেলের কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাদের নাটকীয় বেশ দেখিয়া তিনি কি প্রকার ভীত হইয়াছিলেন—শরৎচন্দ্র তাহার একটি সরস বর্ণনা করিলেন। তিনি যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, বিচার সেইরূপই হইল। তিনি নিজ কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়া চিরদিনের জন্য দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইলেন। এই সময় তাঁহার শরীর ভালো যাইতেছিল না। সুতরাং তিনি বর্মা ত্যাগ করিলেন।”

॥ আট ॥

রেঙ্গুন থেকে ফিরে শরৎচন্দ্র বাজে-শিবপুরের ৬নং নীলকমল কুণ্ডু লেনে পাঁচ-ছয়মাস বাস করবার পর ৪নং বাজে-শিবপুর ফার্স্ট বাই লেনে একখানি একতলা কোঠাবাড়ি (সতীশের মায়ের বাড়ি) কুড়ি-পঁচিশটাকায় ভাড়া নিয়ে তাঁর নূতন জীবন-পর্ব শুরু করলেন।

বাড়িটি মন্দ নয়। ছোট্ট আঙিনা, তাতে একটা পিয়ারা-গাছ। একটুকরা ফুলের বাগানও আছে। ছোটভাই প্রকাশচন্দ্রকে অগ্রদ্বীপ থেকে কাছে এনে রাখলেন। এই সময়ে পাড়ার দুই যুবক—অনুরূপ চট্টোপাধ্যায় আর প্রতুল মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের কাছে প্রায় সবসময়ই থাকতেন।

শরৎচন্দ্র এতদিন পরে সত্যকারের সংসারী হয়ে পড়লেন। একদিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি ছোট্ট আঙিনায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন শরৎচন্দ্রের বাসভবনটি। সেই সুদূরের মানুষটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাঁর মনপ্রাণ উৎসুক হয়ে উঠলো। বাড়িতে ছিল সেই 'ভেলু'। নূরী-পাখী 'বাটু-বাবা'র চীৎকারে শরৎচন্দ্র বেরিয়ে এলেন বাইরে; নজর পড়লো হরিদাসবাবুর ওপর; আনন্দে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন হরিদাসবাবুকে—আরে, ভায়া যে!— তারপর চাকরকে ডেকে বললেন—ভোলা, ও ভোলা, বাইরে চেয়ার দে।

হরিদাসবাবু হেসে বললেন—ঠিক আছে। চলুন আপনার ঘরে বসা যাক্।

শরৎচন্দ্র সেই সাবেকী আমলের লম্বা-হাতলের ইজি-চেয়ারে বসলেন। হরিদাসবাবুকে বসালেন নূতন-কেনা একটা চেয়ারে।

হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্রের বাসাটিকে ভালো করে নিরীক্ষণ করে বললেন—বাসাটি আপনার বেশ ভালোই লাগছে।— তারপর নুরী-পাখীটির দিকে তাকিয়ে বললেন—বেশ পাখীটি তো? কথা বলে নাকি?

—তা বলে। বাটু-ব্যাবা খুব শান্ত।

হরিদাসবাবু কুকুর ভেলুর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন—তার চেয়ে শান্ত ঐ কুকুরটা।

—হ্যাঁ, ভেলুও আমার খুব শান্ত। কিন্তু ওর দোষ হচ্ছে অচেনা কেউ এলে চেঁচিয়ে বাড়ী মাৎ করে তোলে।

একটু পরেই চা জলখাবার এলো। জলযোগ করতে করতে হরিদাসবাবু বললেন—'বিরাজ বৌ' কাগজখানার যথেষ্ট সম্মান বাড়িয়েছে। সত্যি শরৎবাবু, আপনার মধ্যে প্রতিভা আছে। কাগজ তো বের করলাম, এখন আপনাদের মতো প্রতিভাবান ব্যক্তিদের দয়া হলে তবেই সব সার্থক হবে।

শরৎচন্দ্র জবাব দেন নম্রভাবে—সেকি ভায়া! আমার দ্বারা যদি কিছু হয় তার জন্য আমি নিশ্চয় সজাগ থাকবো।

এই বাজে-শিবপুরের বাসায় যেমন প্রকাশচন্দ্রকে এনে রেখেছিলেন, তেমনি মেজভাই প্রভাসচন্দ্রও (স্বামী বেদানন্দ) মাঝে মাঝে আসতেন। আসতেন বড়দিদি অনিলা দেবী আর তাঁর স্বামী পঞ্চানন মুখুজ্যে। মাঝে মাঝে এমন মিলনে বাজে-শিবপুরের বাসা কত আনন্দেই না মুখর হয়ে উঠতো! আরো মুখর হলো, ছোটভাই প্রকাশচন্দ্রের সঙ্গে কনকলতা দেবীর বিবাহ নিয়ে। শরৎচন্দ্র সত্য-সত্যই সেদিন ঘোরতর সংসারী হয়ে পড়লেন। ভাগলপুরের

মাতুলালয় থেকেই প্রকাশচন্দ্রের বিবাহ হয়। শরৎচন্দ্রের নির্দেশমতো মাতুল মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পাত্রীর সন্ধান করতে থাকেন। তেমন পছন্দসই পাত্রী না পাওয়ায়, অবশেষে মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জামাতা প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায় মুঙ্গেরের সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কন্যা কনকলতা দেবীকে পছন্দ করেন। কনকলতা দেবীর পিতার অবস্থা বিশেষ ভালো ছিল না। শরৎচন্দ্র একান্ত উদারতার সহিত ভাগলপুরের মাতুলালয়ে গিয়ে ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্রের সাথে কনকলতা দেবীর বিবাহ-কার্য সম্পন্ন করেন। বাজে-শিবপুরে আসার পর শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর গায়ের গহনা খুলে কনকলতা দেবীকে সাজিয়ে দেন।

সাহিত্য-সাধক শরৎচন্দ্রের খ্যাতি তখন চতুর্দিকে। মাসিক আয় তখন পাঁচশত টাকা। শরৎচন্দ্র এই সময়ে নানা পত্রিকার আমন্ত্রণে লিখতে শুরু করেন। 'ভারতবর্ষে' তাঁর 'পণ্ডিতমশাই', 'মেজদিদি', 'দর্পচূর্ণ', 'আঁধারে আলো' দেখতে দেখতে একের পর এক প্রকাশিত হয়ে গেল। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক জলধর সেন মহাশয় লেখার জন্য শরৎচন্দ্রের বাসায় পুনরায় তাগাদা দিতে এলেন। ভেলুর রক্তচক্ষু এড়িয়ে জলধর সেন মহাশয় হাজির হলেন একেবারে শরৎচন্দ্রের লেখার টেবিলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বসে থাকেন লেখা নিয়ে যাবার জন্যে। শরৎচন্দ্রের মুক্তার মতো ঝরঝরে লেখার দিকে তাকিয়ে থাকেন জলধর সেন মহাশয়। ঘরের আসবাবপত্রের চাইতে শরৎচন্দ্রের লেখবার সরঞ্জামগুলি দেখবার মতো। অতীতের স্মৃতি জলধর সেনের মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে। একদিন এই অখ্যাত লেখকটির লেখা ('মন্দির') বিচার করে আশীর্বাদ করেছিলেন—আজ সেই আশীর্বাদ সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে। শরৎচন্দ্র এখন যশের উচ্চশিখরে।

শরৎচন্দ্রের এই বাজে-শিবপুরের বাসায় যেমন সাহিত্যিকরা আসতেন, তেমন পাড়া-প্রতিবেশীরাও সন্ধ্যেবেলায় তাঁর বাসায় আসর জমিয়ে তুলতেন। বন্ধুবৎসল কোমলপ্রাণ শরৎচন্দ্রের বৈঠকী-গল্প শুনে প্রতিবেশীরা কম আনন্দ পেতেন না। তা ছাড়া শরৎচন্দ্রের প্রকাশিত উপন্যাসগুলি নিয়েও অনেকে নানা প্রশ্ন করতেন। শরৎচন্দ্র হাসিমুখেই তার উত্তর দিতেন।

একদিন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শৈলেশ বিশী মহাশয় এলেন শরৎচন্দ্রের বাসায় বেড়াতে। তিনি এই শিবপুরের বাসার এক কাহিনী তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় লিখেছেন ঃ

"তাঁর বাড়ির উঠোনে একটা পেয়ারা-গাছ ছিল। আষাঢ় কি শ্রাবণ মাস। আমি গিয়ে দেখি গাছ-ভরা পেয়ারা পেকে আছে। আমি আর লোভ সামলাতে না পেরে পেয়ারা পেড়ে নিলুম; একটা তখুনি খেতে লাগলুম, আর একটা পকেটে পুরলুম। শরৎদা আমাকে পেয়ারা খেতে দেখে, ঘর থেকে বেরিয়ে চাকরকে ডেকে গম্ভীরভাবে বললেন—ভোলা, ও ভোলা, সব পেয়ারা পেড়ে ফেল। পেয়ারা পাড়া হলে, আদেশ দিলেন—সব পেয়ারা পাড়ায় বিলিয়ে দাও। আমি ভাব্যাচ্যাকা খেয়ে গেলুম। কি অপরাধ করেছি বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। তিনি বললেন—তুমি না-ব'লে কেন পেয়ারা পাড়লে, না-হয় সব পেয়ারা তুমিই নিয়ে যাও।

আমি বললাম—এরকম অবিচার আমার প্রতি কেন করছেন?

তিনি বললেন—তা হলে দেখবে এসো। এই বলে তিনি আমাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি তাকের উপর চার-পাঁচটা ছোট ছোট কাঁসার-বাটি সাজানো। তার মধ্যে কোনটায় আছে বেদানার দানা; কোনটায় আনারসের টুকরো, পেস্তা, বাদাম,
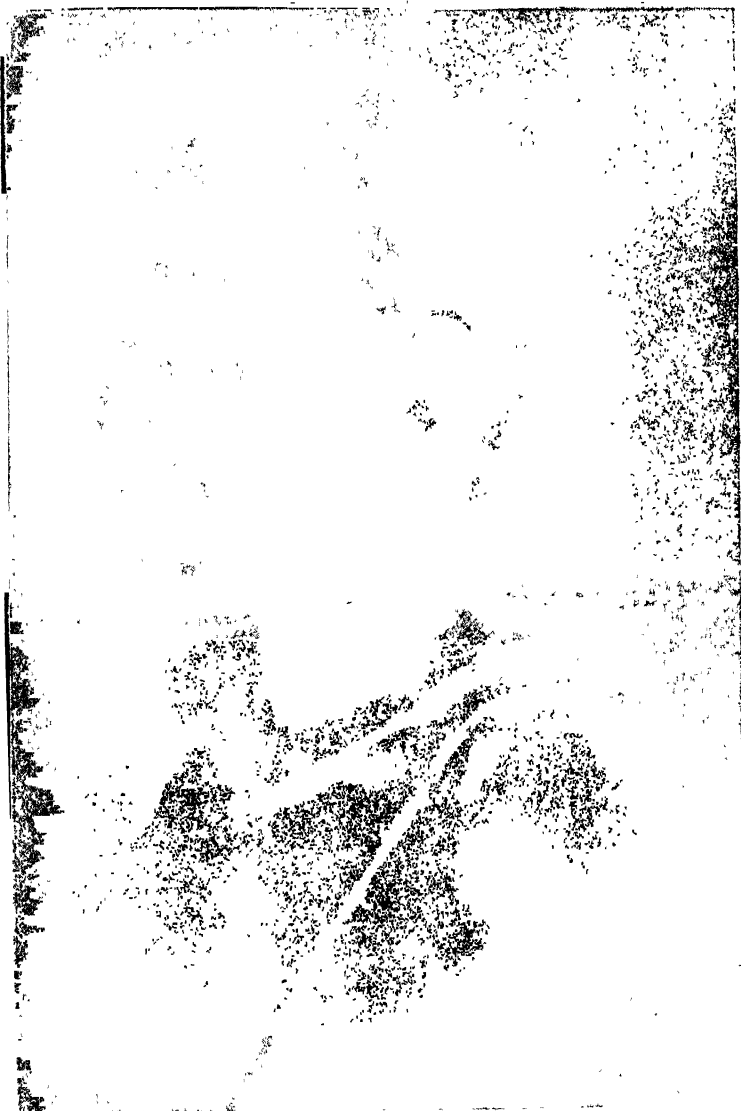
গৃহী শরৎচন্দ্র

কিসমিস। তিনি বললেন—এসব বাটুর খাবার। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাটু ওসব খায়। বাটুর খাবার আগে এ-বাড়ির ফল কেউ খেতে পারে না। তুমি যখন তার আগে ফল খেয়েছ তখন ওগুলো পাড়ায় সব বিলিয়ে দিক্‌গে।

আমি এই কথা শুনে আধ-খাওয়া পেয়ারা যেটা পকেটে ছিল সেটা জানালা গলিয়ে ফেলে দিলাম।

উনি বাটুর কাছে গিয়ে 'বাটু', 'বাবা বাটু' ব'লে তার গায়ে হাত বুলিয়ে ঠোঁটে চুমু খেয়ে তার মাথাটি গালের সঙ্গে ঠেকিয়ে, যেমন করে ছোট ছেলেকে আদর করে সেরকম করে আদর ক'রে, তাকে আস্তে আস্তে সব ফলগুলি খাওয়ালেন। তখন তাঁর মন শান্ত হোলো।"

পশুপাখীর প্রতি এত দরদ ক'টা লোকের থাকে? শরৎচন্দ্রের সেই দরদ ছিল। অসহায়, মূক এইসব প্রাণীর দুঃখ-ভালবাসা তিনি যেন কোনো এক আশ্চর্য ক্ষমতায় অনুভব করতে পারতেন। আর সেই মনের স্পর্শ পেয়েই তাঁর সাহিত্য হলো দরদী, সহানুভূতিপূর্ণ, সমবেদনাময় এবং জনগণ-মনের সাহিত্য।

এখন শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসগুলি পুস্তকাকারে ছাপা হয়ে গেছে। বাংলার সাহিত্যানুরাগী পাঠক তার রসাস্বাদন করে ধন্য হলো। দেখতে দেখতে 'ভারতবর্ষের' পাতায় 'অরক্ষণীয়া', 'শ্রীকান্ত,প্রথম পর্ব', দেবদাস' প্রভৃতি প্রকাশিত হতে লাগলো।

'ভারতবর্ষে' লেখার সমারোহ দেখে 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল এলেন একদিন বাজে-শিবপুরে। আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন 'যমুনা' তখন নিষ্প্রভ। শরৎচন্দ্রের কাছে এসে তিনি জিদ ধরে বসলেন—এবার 'যমুনা'য় কিছু একটা দিতে হবে আপনাকে।

শরৎচন্দ্র বললেন—আপনাকে ভালো একটি লেখা দেব।

ফণীন্দ্রনাথ পাল খুশী হলেন—এবারে যদি তাঁর পত্রিকাখানি বাঁচানো যায়। এই 'যমুনা'য় ১৯১৭ সালের ১লা জুলাই 'নিষ্কৃতি' প্রকাশিত হয়; 'নিষ্কৃতি'র পর 'চরিত্রহীন'ও অংশতঃ প্রকাশিত হয়।

দিনের পর দিন যায়। শরৎচন্দ্র একটির পর একটি বই লিখে চলেছেন। এদিকে ফণীবাবুর কাগজ 'যমুনা'য় 'চরিত্রহীন' বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, শরৎচন্দ্র পুস্তকাকারে তা প্রকাশ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। 'চরিত্রহীন' কিছুদিন বাদে প্রকাশিত হলো। এই 'চরিত্রহীন' নিয়ে তখনকার গোঁড়া সমাজ 'ধর্ম গেল, সমাজ গেল' ব'লে চীৎকার শুরু করে দিয়েছিলেন। শুধু কি তাই? শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধবাদী দল নানা কাগজে 'চরিত্রহীন'-এর সমালোচনা শুরু করে দিল।

এই সময়ে বাজে-শিবপুরে যে ঘটনাটি ঘটেছিল তার সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্। শরৎচন্দ্রের বয়স তখন একচল্লিশ। শরৎচন্দ্র ঘরের বারান্দায় বসে থেলো-হুঁকোয় ধুমপান করছিলেন, এমন সময়ে তিন-চারজন যুবক একখানি সদ্য-প্রকাশিত 'চরিত্রহীন' নিয়ে শরৎচন্দ্রের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। শরৎচন্দ্র তাদের আগমন-বার্তা কি জন্য জিজ্ঞাসা করলে, একজন কটূক্তি বর্ষণ করে বলে উঠলো—দেখুন, এইরকম বই লিখলে এ-পাড়ায় আপনার থাকা চলবে না। এটা ভদ্রপাড়া মনে রাখবেন।

শরৎচন্দ্র কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, আর একজন সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলো—সাবিত্রী আর কিরণময়ী ছাড়া সমাজে আর কি ভালো চরিত্র দেখতে পাননি?

শরৎচন্দ্র এদের আস্ফালন দেখে মনে মনে হাসলেন। বললেন তাদের বসতে।

আরেকজন কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে বললো—আপনার এই বই-এর কী পরিণাম হওয়া উচিত এই দেখুন—ব'লে বইখানি পুড়িয়ে দিল।

শরৎচন্দ্র যুবকদের কাণ্ডকারখানা দেখে দুঃখ পেয়ে বললেন—ছাখো, সাবিত্রী একটা মেসের ঝি। সে মেসের সর্বময়ী ; স্নেহ-যত্নে সবাইকে সে আপনার করে নিয়েছে। সতীশও তার আপনার হলো। সতীশ কত বার কত ভাবে তাকে কাছে টেনেছে। সাবিত্রী চিরকাল তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। অথচ সাবিত্রী সতীশকে কতখানি ভালবাসতো —কই সে তো নিজেকে জড়ায়নি! সরোজিনীর সঙ্গে সতীশের বিবাহ দিয়ে তাকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করলো।

এই সময় আরেকজন বলে উঠলো—আচ্ছা, কিরণময়ীর সম্বন্ধে আপনার মতামত ?

শরৎচন্দ্র বলতে শুরু করলেন—ছাখো, কিরণময়ীর চরিত্রে আমি নারী-জীবনের ব্যর্থতা দেখাতে চেয়েছি। কিরণময়ী আর হারানবাবুর বিবাহ-জীবন বড়ই করুণ। স্বামীর ভালবাসা সে পেল না। বাড়ির মধ্যে স্বামী আর শাশুড়ী। একজন দার্শনিক, প্রাণপণে স্ত্রীকে পড়িয়েই সুখী। আরেকজন ঘোর স্বার্থপর, পুত্রবধূকে খাটিয়েই সুখী। কিরণময়ী দুটি বিরুদ্ধ প্রকৃতির পুরুষ ও নারীর প্রেমহীন মিলনকে হিন্দু-সমাজবিধির নির্বন্ধ বলে মেনে নিতে পারলো না। এইখানেই কিরণময়ীর জীবনের ট্রাজেডি আরম্ভ হলো।

শরৎচন্দ্র তাদের অনেক তথ্য দিয়ে যা বোঝাতে চাইলেন, তারা কি তা বুঝলো ? যারা মনেপ্রাণে মেনে নিয়েছে এ-সাহিত্য সমাজের কাছে অস্পৃশ্য, পাপপূর্ণ—তারা তো সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে ঘৃণা করবেই।

তারা চলে গেলে শরৎচন্দ্র গভীর দুঃখ পেয়ে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে

রইলেন পোড়া বইখানির দিকে। হিরণ্ময়ী দেবীও ছলছল চক্ষে কাছে এসে দাঁড়ালেন। সুখদুঃখের ভাগী এই বড়বৌ।

শরৎচন্দ্র স্ত্রীকে বললেন—বড়বৌ, ওদের ওপর আমার না আছে অভিমান, না আছে রাগ। ওরা যা করে, না জেনেই করে। আমি যা করি, তা জেনেই করি। আমার জাগ্রত-জীবন সত্যই আমার অবলম্বন। সে রয়েছে এই বুকেই!

নির্ভীক শরৎচন্দ্র সমস্ত বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে তাঁর সৃষ্টিধারা অব্যাহত রাখলেন। সি. আর. দাশ মহাশয়ের (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ) মাসিকপত্রিকা 'নারায়ণে' লিখবার একদিন তিনি আমন্ত্রণ পেলেন। শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিলেন—'স্বামী' ('স্বামী' নামকরণ করেন দেশবন্ধু)। শরৎচন্দ্রের এই লেখা পড়ে চিত্তরঞ্জন এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, লেখার জন্য কত দক্ষিণা দেবেন ঠিক না করতে পেরে, টাকার অঙ্ক খালি রেখে শুধুমাত্র সই করে একজনকে দিয়ে একটা চেক শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেইসঙ্গে একটা পত্র :

"যে অসামান্য শিল্পীর রচনা 'নারায়ণ' বক্ষে ধারণ করবার সৌভাগ্য লাভ করলে, তার মূল্য-নিরূপণের স্পর্ধা আমার নেই। ব্ল্যাঙ্ক-চেক পাঠালুম, আপনি ইচ্ছামত অঙ্ক এতে বসিয়ে নেবেন। সেজন্য কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ বোধ করবেন না।"

শরৎচন্দ্র পত্রবাহককে বললেন—তোমার বাবুকে বোলো, আমি লেখার দক্ষিণা মাত্র ১০০৲ টাকাই লিখলাম।

শরৎচন্দ্র ইচ্ছা করলে, টাকার ঘরে সেদিন যে-কোনো অঙ্ক বসিয়ে নিতে পারতেন। নির্লোভ শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেশবন্ধুর অন্তরঙ্গতা সেদিন থেকে বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

বাজে-শিবপুরে একদিন ছেলেবেলাকার সাথী মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এলেন দেখা করতে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে শরৎচন্দ্র বলে উঠলেন—সুরেন-মামা! এতদিন পরে? আজকাল কর কি সুরেনমামা?

—স্কুল-মাস্টারি। তা তুমি কেমন আছ?

—দেখতেই তো পাচ্ছ সুরেন-মামা—

বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে শরৎচন্দ্র গল্প করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্রনাথ উঠে বললেন—চল, তোমার লেখার টেবিলে যাওয়া যাক্।

দুজনে ঘরে ঢুকলেন।

অবাক হয়ে সুরেন্দ্রনাথ বললেন—এত কলম কিসের শরৎ?

—ভালো কলম আর কাগজ না হলে আমার লেখা হয় না।

সুরেন্দ্রনাথ লেখবার ঘরটির দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন। তাক-ভর্তি নানান বই—দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব এবং শরৎচন্দ্রের প্রকাশিত পুস্তকগুলি যেন ঘর আলো করে রেখেছে। সুরেন্দ্রনাথ সব দেখে বললেন—বেশ ভালোই হলো, শরৎ। লেখা কিন্তু ছেড় না। বাংলাদেশে সাহিত্যিক বলতে তুমিই যা একজন। একদিকে রবীন্দ্রনাথ, অন্যদিকে তুমি।

মামাটিকে যে আদর-আপ্যায়ন করতে হবে, শরৎচন্দ্র এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলেন। চাকর ভোলাকে ডেকে বললেন—ভোলা, ও ভোলা, বাড়িতে বলে দে সুরেন-মামা এসেছেন। আজ এখানে খাওয়া-দাওয়া করে তবে যাবেন।

—ওকি শরৎ, ও তোমার কি আবদার! আমি এখুনিই যাবো, কাজ আছে।

—তা হয় না, সুরেন-মামা।

অগত্যা ভাগ্নের কথা সুরেন্দ্রনাথকে রক্ষা করতেই হলো।

আত্মীয়-স্বজনের ভীড় এমনি প্রায়ই লেগে থাকতো। এসবের মধ্যে থেকেও শরৎচন্দ্রের লেখনী-শক্তি অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চললো। 'ভারতবর্ষে' 'দত্তা' ও 'শ্রীকান্ত, দ্বিতীয় পর্ব' প্রকাশিত হলো। এদিকে তাঁর 'শ্রীকান্ত, প্রথম পর্ব' বাজারে খুব নাম কিনেছে। অনেকেই বলাবলি করলো, এটা শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনী।

এই 'শ্রীকান্তের' জনপ্রিয়তার একটা গল্প শুনতে পাওয়া যায় :

এক ভদ্রলোক মীরাট না লক্ষ্নৌ কোথা থেকে যেন কি-একটা কাজে কোলকাতায় আসেন কিছুদিনের জন্য। তিনি যে-বাড়িতে এসে ওঠেন, সেটা তাঁর দূরসম্পর্কীয় এক আত্মীয়ার বাড়ি। আত্মীয়ার বাড়িতে লেখাপড়ার খুব বেশী চলন ছিল না। মেয়েরা কিছু ব্রত-কথার ছড়া মুখস্থ জানতেন আর ছেলেরা সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন। এহেন একটি সংসারে আশ্চর্য একটা কাণ্ড ঘটলো।

একদিন ভদ্রলোক রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করে শুতে যাবেন এমন সময় তাঁর এক আত্মীয়া বললেন—ছোটমামা, আমার একটা কাজ করে দেবেন ?

—কী কাজ ?

—আগে বলুন, করে দেবেন কিনা।

—কী কাজ না জেনে কি করে বলি।

আত্মীয়াটি বললেন—আমাদের বাড়ির রাস্তার মোড়ে যে লাল বাড়িটা রয়েছে সেখানে শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে আসেন গল্প করতে। আজও এসেছেন তিনি। আপনি একবার যাবেন তাঁর কাছে।

ভদ্রলোক প্রথমতঃ প্রবাসী বাঙালী, দ্বিতীয়তঃ তাঁর পেশা ছিল কন্ট্রাক্টারি। সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর না আছে সদ্ভাব, না আছে সম্পর্ক। শরৎচন্দ্রের নাম-ই তিনি শোনেননি।

তিনি বললেন—শরৎচন্দ্র ? কে শরৎচন্দ্র ?

মেয়েটি অবাক হয়ে বললে—শরৎচন্দ্র—আমাদের শরৎচন্দ্র।

ভদ্রলোক কিছুই বুঝলেন না। বোকার মতো ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে রইলেন। আত্মীয়াটি প্রথমে কি ভাবে শরৎচন্দ্রের পরিচয় দেবে তা হাজার চেষ্টাতেও ঠিক করতে না পেরে অবশেষে বললে—ওই-যে যিনি 'শ্রীকান্ত'।

ভদ্রলোক চুন-সুরকির কথা বললে যতটা বুঝতেন, তার চেয়ে ঢের বেশী বুঝলেন এই একটিমাত্র কথায়। একগাল হাসি ফুটিয়ে তখন তিনি বললেন—ও, সেই বাউণ্ডুলে ছেলেটা! শ্রীকান্ত বুঝি নাম পাল্টিয়েছে ?

আত্মীয়াটির এতক্ষণ পরে খেয়াল হলো; বললে—উনিই তো 'শ্রীকান্ত' লিখেছেন।

ভদ্রলোক এবার বুঝলেন সব।

এই গল্পটি থেকে আমরা বুঝতে পারি শরৎচন্দ্রের নামের সঙ্গে তত পরিচয় না থাকলেও, তাঁর লেখার সঙ্গে সকলের পরিচয় ছিল। এই যে একজন লেখককে ঘরের মানুষ করে নেবার আগ্রহ, এ থেকেই বোঝা যায় বাঙালী তাঁকে কত স্নেহের চক্ষে দেখতো।)

এদিকে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য যাতে বাংলার প্রতি ঘরে পৌঁছায় তার জন্য বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির তাঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশ করবার জন্য শরৎচন্দ্রের বাসায় একজন কর্মচারী পাঠালেন। কর্মচারীটি

বললেন—আপনার অনুমতি পেলে আমরা সুখী হবো, এবং এর জন্য আপনাকে আমরা প্রচুর অর্থ দেব।

প্রস্তাব শুনে শরৎচন্দ্র বললেন—বাজারে তো আমার বই আছে, গ্রন্থাবলী ছাপিয়ে লাভ কি?

কর্মচারীটি বললেন—দেখুন, এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ হলে, বহু লোক তা পড়তে পারবে। এই দরিদ্র দেশে অত দাম দিয়ে কিনে পড়ার সাধ থাকলেও, সাধ্য নেই।

শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র মত দিলেন। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির তখনকার মতো শরৎচন্দ্রকে কয়েক হাজার টাকা দিয়েছিলেন। সেটা ১৯১৯ সালের কথা।

এই টাকা পেয়ে শরৎচন্দ্র যতটা খুশী হয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশী আনন্দ পেলেন—তাঁর প্রতিটি বই দেশের সবাই অল্পমূল্যে পড়তে পারবে ভেবে।

এই সময়ে শরৎচন্দ্রকে আমরা গরীব-দুঃখীদের অভাবমোচন করতে দেখতে পাই।

একদিন তিনি হাওড়ার হাটে গিয়ে কয়েকশত টাকার কাপড় কিনে নিয়ে এলেন। এই সময়ে জলধর সেন মহাশয় লেখার তাগাদা দিতে এসে দেখতে পেলেন শরৎচন্দ্রের ভৃত্য ভোলা ধুতি-শাড়ী বাঁধছে শরৎচন্দ্র টেবিলের উপর টাকা, দুআনি, আধুলি গুনতে বসে গেছেন।

জলধর সেন মহাশয় মৃদু হেসে বললেন—এগুলো সব কি হবে দাদা? বাড়িতে কি কোনো ব্রত-ট্রত আছে নাকি?

—না, তা নয়। আমি এই দশটার ট্রেনে দিদির বাড়ি যাচ্ছি।

—দিদির বুঝি কোনো ব্রত আছে? আর কাঙালী-বিদায়ের জন্য বোধকরি ঐ আনি, দুআনি, আধুলি?

শরৎচন্দ্র জবাব দেন—না দাদা, দিদির ব্রত-প্রতিষ্ঠা নয়। দিদির গাঁয়ের আর তার চারপাশের গাঁয়ের গরীব মানুষদের কী দুর্দশা! তাদের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, চালে খড় নেই—ব'লে চাকর ভোলাকে বললেন—ভোলা, ও ভোলা, বাড়িতে বলে দে জলধর-দাদা এসেছেন—

জলধর সেন মহাশয় বললেন—থাক্, ভায়া। এসেছিলাম এইদিকে। যাক্, ভায়ার ব্যাপার দেখে যাওয়া গেল।

হাসিমুখেই বিদায় নিলেন জলধর সেন মহাশয়। পরদুঃখকাতর শরৎচন্দ্র সেদিন গোবিন্দপুরে গিয়ে সে-সব বিলিয়ে দিয়ে এসেছিলেন।

১৯১৯-২০ সালের কথা। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তখন ভাগলপুরে ওকালতি করতেন। কার্যোপলক্ষে কয়েকদিনের জন্য তিনি কোলকাতায় এসেছেন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তিনি এলেন বাজে-শিবপুরে। বাজে-শিবপুরের এই ছোট্ট বাড়ি তাঁর চোখে যেমন সুন্দর দেখাচ্ছিল, তার চেয়ে আরো মজার হলো 'ভেলু'। বহুদিন আগে চোরবাগানের বাড়িতে ভেলুকে দেখেছিলেন।

ভেলু তখন ঘুমোচ্ছিল। উপেন্দ্রনাথের পদশব্দে সে উঠে পড়লো; রাগে সারা বাড়িটা চেঁচিয়ে মাৎ করে দিলো। ভেলুর চীৎকার শুনে শরৎচন্দ্র বাইরে বেরিয়ে উপেন্দ্রনাথকে দেখে বললেন—আরে! এসো এসো উপীন। কবে এলে?

—যেতেই তো চাই। কিন্তু যাওয়ার পথে তোমার ভেলুর বিষম বাধা।

শরৎচন্দ্র ভেলুর গায়ে হাত দিয়ে আদর করে বললেন—খবরদার

ভেলু! দুষ্টুমি কোরো না। উনি আমার মামা। মামাকে কামড়াতে নেই, বুঝলে?

উপেন্দ্রনাথ ঘরের বারান্দায় একটা চেয়ারে এসে বসলেন। তারপর একটু রহস্য করেই বললেন—শুনতে পাই, ভেলু তার বাবাকে দু-দু'বার কামড়েছে। আর মামাকে যদি কামড়ায়, তাতে এমন কি আর দোষ!

শরৎচন্দ্র বললেন—দু'বার নয়, চারবার।— তারপর ডাক দিলেন —ভোলা, ও ভোলা!

ভোলা মনে করেছিল তামাক দিতে হবে। কাছে এসে বললে— কি বাবু? তামাক?

—আরে, তামাক-টামাক নয়। বাড়িতে বলে দে ভাগলপুর থেকে উপীন-মামা এসেছেন। এখানেই নাওয়া-খাওয়া করবেন।

ভোলা চলে গেলে উপেন্দ্রনাথ বললেন—একবার আমাকে জিজ্ঞাসাও করলে না, শরৎ? ব্যবস্থাটা একতরফাই করলে?

আলোচনায় একটা পূর্ণচ্ছেদ টেনে শরৎচন্দ্র বললেন—এসব ব্যবস্থা একতরফাই হয়। যেহেতু অপরপক্ষে আপত্তি করলেও, সে আপত্তি মোটেই টেঁকে না।

আহারাদি সারতে বেলা হলো। ভোজনটা ভালোই হয়েছিল সেদিন।

একটু জিরিয়ে নিয়ে শরৎচন্দ্র বললেন—চল উপীন, একটা সওদা করে আসি।

—কী সওদা?

শরৎচন্দ্র বললেন—শুনেছি, রেক্-শূ্য যেমন আরামের তেম্‌নি মজবুত। হোয়াইট-ওয়ের দোকানে তাই একজোড়া কিনবো।

—কিসে যাবে ?

—চল, স্টীমারে যাওয়া যাক্।

স্টীমার-ঘাটে যেতে পোয়াটাক ধূলিবহুল পথ অতিক্রম করতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের পায়ের তালতলার শতচ্ছিন্ন চটিটা শ্রীহীন হয়ে পড়লো।

উপেন্দ্রনাথ বললেন—শরৎ, তোমার পায়ের অবস্থা যা, অত দামী রেক্-শ্যূ তোমাকে ওরা দেখাবেই না।

—বল কি উপীন ?

—তোমার জুতোর অবস্থা আরো খারাপ হলো।

—হোক্‌গে, চল তো আগে ঢুকি। যদি ওরা কিছু বলে, চারখানা দশটাকার নোট মুখের কাছে ধরে বলবো 'হিয়ার ইজ দা মানি'!

শেষ পর্যন্ত তাঁরা দামী রেক্-শ্যূ হোয়াইটওয়ে-লেড-ল-এর দোকান থেকে কিনে তবে বাড়ি ফিরলেন।

শরৎচন্দ্রের বেশভূষার রকম-ফের ছিল। তিনি কখনো দামী কাপড়, গায়ে সিল্কের জামা, পুজো-আহ্নিকের সময় তসরের ধুতি ইত্যাদি পরতেন, আবার কখনো বা সাধারণ বেশভূষায় সাহিত্য-বৈঠকে, সমাজ-সেবায় যোগ দিতেন। আবার মুদীর দোকানে কাঠের বেঞ্চিতে বসে কড়ি-বাঁধা থেলো-হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে তেল-নুন-ডালের গল্প ফেঁদে সকলের সুখদুঃখের সমভাগী হয়ে যেতেন 'বামুনদাদা'।

এই সময়ে 'পার্বণী' পত্রিকার সম্পাদক—রবীন্দ্রনাথের জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'পার্বণী'তে শরৎচন্দ্রের একটি উপন্যাস প্রকাশ করবার জন্য বাজে-শিবপুরে এলেন। শরৎচন্দ্র তখন 'ছবি' ও 'গৃহদাহ' লিখতে আরম্ভ করেছেন। এই দুটি লেখার প্রথমটি 'পার্বণী'তে, দ্বিতীয়টি 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়।

এদিকে শরৎচন্দ্র 'বসুমতী'র কাছ থেকে গ্রন্থাবলীর জন্য আরো কিছু অর্থ পেলেন। চারিদিক থেকে যখন অর্থ আসতে শুরু করলো, শরৎচন্দ্র ভাবলেন এইবার যদি পিতৃভিটে উদ্ধার করা যায়। শেষ পর্যন্ত স্বগ্রাম দেবানন্দপুরে এলেন। তাঁর পিতার কনিষ্ঠ মাতুল অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় অনেকদিন গত হয়েছেন। তাঁর বংশধরেরা শরৎচন্দ্রকে মাত্র লেখক হিসাবে চিনতেন। শরৎচন্দ্র তাঁদের কাছে পিতৃভিটে উদ্ধারের কথা পাড়লে, তাঁরা রাজী হলেন না। অগত্যা শরৎচন্দ্রকে নিরাশ হয়েই ফিরতে হয়।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' শিশির পাবলিশিং হাউস থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো।

॥ নয় ॥

এবার শরৎচন্দ্র রাজনীতিতে যোগ দিলেন চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে। সেটা ১৯২১ সালের কথা। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ-আন্দোলন শুরু হলে, শরৎচন্দ্র কংগ্রেসে যোগ দিলেন। সমস্ত বিলাসী সাজপোশাক বর্জন করে কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী মোটা খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবি ও চাদর ধারণ করলেন। সকলের অনুরোধে শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়ে ভিড়লেন কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজে। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বন্ধু হলেন—শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, কিরণশঙ্কর রায়, ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও তুলসীচরণ গোস্বামী প্রভৃতি। রাজনীতিতে মেতে শরৎচন্দ্র সব-কিছুই ভুলে যেতে বসলেন।

উপন্যাস-রচনার কাজে ভাঁটা তো পড়লোই, উপরন্তু শখের দাবা-খেলা, মাছ-ধরা, কোলকাতার সাহিত্যিক আড্ডাগুলিতে যাওয়া-আসা বন্ধ হলো। গোবিন্দপুরে দিদির বাড়ি যাওয়া, বিকালে তাঁর আদরের ভেলুকে নিয়ে বেড়ানো বন্ধ করলেন। পোষা-পাখী 'বাটু-বাবা'কে আদর করে ছোলা ফল ইত্যাদি খাওয়ানার ভার ছোটভাই প্রকাশচন্দ্রের উপর ছেড়ে দিলেন। কংগ্রেসের কাজে দিনের পর দিন মেতে উঠলেন।

১৯২১ সালের শেষের দিকে সম্রাট পঞ্চম জর্জের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স-অব-ওয়েলস ভারতবর্ষ-ভ্রমণে এলেন। গভর্নমেণ্ট ভেবেছিল এই চালে ভারতে অসহযোগ-আন্দোলনের জোয়ার প্রশমিত হবে। কিন্তু তা হলো না। ২৪শে ডিসেম্বর কোলকাতায় প্রিন্স-অব-ওয়েলসের আগমনে শহরে পূর্ণমাত্রায় হরতাল প্রতিপালিত হলো। বিশাল কোলকাতা মহানগরী যেন শ্মশানের মতো দেখতে হয়েছিল। গভর্নমেণ্টের পক্ষে এ অবস্থা মোটেই মনঃপূত হলো না। ইউরোপীয়ান সম্প্রদায় একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে গভর্নমেণ্টকে কঠোর দমন-নীতি অবলম্বন করবার জন্য অনুরোধ করলে। সেই সূত্রে চারিদিকে ধরপাকড় লেগে গেল। যেমন গ্রেপ্তার তেমনি কারাদণ্ড। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, লালা লাজপত রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মৌলানা আজাদ প্রভৃতি বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং হাজার হাজার কংগ্রেস-কর্মী গ্রেপ্তার বরণ করলেন।

এমনি গ্রেপ্তারের হিড়িক দেখে শরৎচন্দ্র একদিন চিত্তরঞ্জন দাশের শিষ্য ও সেক্রেটারি হেমন্তকুমার সরকারকে জিজ্ঞাসা করলেন—ওহে হেমন্ত, জেলখানাতে আফিম খেতে দেয় ?

হেমন্ত সরকার বললেন—আজ্ঞে, না।

—তামাক খেতে দেয় ?

—আজ্ঞে, তাও দেয় না।

—তবে বাপু, আমার জেলে যাওয়া হবে না।

হেমন্তবাবু হেসে বললেন—কি রকম ?

শরৎচন্দ্র বললেন—আরে দূর-দূর ! জেলখানাটা মোটেই দেখছি ভদ্রলোকের স্থান নয়, ও আমার পোষাবে না। গভর্নমেণ্ট যদি গুলী-গোলা চালিয়ে দেয়, তার মুখে গিয়ে দাঁড়াতে পারি। কিন্তু ওই ভেড়ার গোয়ালে ব'সে-ব'সে দিনরাত্রি কড়িকাঠ গুনে গুনে মাসের পর মাস কাটানো আমার দ্বারা হবে না।

শরৎচন্দ্র জেলে গেলেন না, কিন্তু কংগ্রেসের সমস্ত দায়িত্ব ঠিকভাবেই পালন করে যেতে লাগলেন।

এই সময়ে একদিন মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাজে-শিবপুরে এলেন হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভাগিনেয় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। পরনে খদ্দর দেখে সুরেন্দ্রনাথ বললেন—শরৎ, তুমি যে একেবারে কংগ্রেসী বনে গেলে ?

শরৎচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন—ঠিক বলেছ, সুরেন-মামা। আচ্ছা সুরেন-মামা, কংগ্রেস-কর্মীদের ধর্ম হলো দেশের কাজ করা। তার চেয়ে বড় কাজ—চরকায় সূতা-কাটা। ভালো চরকা কোথায় পাওয়া যায় বল তো ?

সুরেন্দ্রনাথ বললেন—আমার জানাশুনা এক দোকান আছে বৌ-বাজারে। আর আমাদের এক ছাত্র আছে, সে চরকায় ভালো সূতা কাটতে পারে। ভাবনা কি শরৎ ?

—তাহলে চল, ভালো একটা চরকা কিনে আনি।

যেমন কথা তেমন কাজ। চরকায় সূতা-কাটা আর সকাল থেকে

রাত্রি পর্যন্ত কংগ্রেসের কাজ করে বেড়ানো। ফলে শরৎচন্দ্র কংগ্রেস-কর্মীদের কাছে হলেন দাদা ও পরম বন্ধু।

এদিকে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক জলধর সেন লেখার জন্য তাগাদা শুরু করে দিলেন। লেখা দিলেই টাকা। কিন্তু কে কার কথা শোনে! জলধর সেন বারে বারে ফিরে যান।

যতই দিন যায়, বাংলাদেশে অসহযোগ-আন্দোলন আরো ঘোরালো হয়ে উঠলো। আইন-অমান্য অনুসন্ধান কমিটি যখন দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই সময় দেশবন্ধু কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করলেন।

কংগ্রেস কর্তৃক কাউন্সিল-প্রবেশ-নীতি অনুমোদিত হওয়ায়, বাংলাদেশেও কাউন্সিলের জন্য প্রতিনিধি-নির্বাচন শুরু হলো। প্রত্যেক কেন্দ্রে যখন প্রার্থী দাঁড় করানো হচ্ছে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ হাওড়ায় শরৎচন্দ্রের নাম প্রস্তাব করলেন।

শরৎচন্দ্র হেসে দেশবন্ধুকে বললেন—আপনি ক্ষেপেছেন? আমি দাঁড়াবো কাউন্সিল-ইলেক্‌শানে?

দেশবন্ধু বললেন—কেন দাঁড়াবেন না?

—সেকি হয়? আমি সামান্য গ্রন্থকার মানুষ, আমি কাউন্সিলের ইলেক্‌শানে দাঁড়াবার যোগ্য? লোকে বলবে কি?

দেশবন্ধু ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন—আপনি কী বলছেন শরৎবাবু?

শরৎচন্দ্র বললেন—ঠিক বলছি। দেশের জন্য আমি কী করেছি? আমি জেলে যাইনি, ওকালতি-ব্যারিস্টারি ত্যাগ করিনি—দেশের জন্যে আমি তো কোনো নির্যাতন বরণ, কোনো ত্যাগ-স্বীকারই করিনি। আপনি আমাকে ভালবাসেন—সে আপনার আমার ব্যক্তিগত কথা। আপনি নিজে কবি ও সাহিত্যিক, আমাকে সাহিত্যিক

হিসাবে ভালবাসেন। বন্ধুত্বের জন্য আমি আপনার প্রিয়জন হতে পারি, কিন্তু দেশের লোক আমাকে প্রিয়জন মনে করবে কেন? তা ছাড়া আমার নিজের সামান্য সাহিত্য-সাধনাকে আমি রাজনীতির মূলধন করতে চাই না। বিশেষতঃ, কাউন্সিলে যা কাজ—ইংরেজী বক্তৃতা শোনা আর ইংরেজী বক্তৃতা দেওয়া—তুটোতেই আমার অত্যন্ত অরুচি। আপনি আমাকে রেহাই দিন!

শরৎচন্দ্র শেষ পর্যন্ত কাউন্সিল-নির্বাচনে দাঁড়াননি। এর জন্য চিত্তরঞ্জন দাশ কম দুঃখিত হননি।

একদিন জলধর সেন মহাশয় লেখার তাগাদা দিতে এলেন। শরৎচন্দ্রের সেদিন মন ছিল প্রসন্ন—তিনি কিছু লিখছিলেন। জলধর সেন মহাশয় আনন্দিত হলেন; হাতের লাঠিটা সজোরে মেঝেয় ঠুকে বলে উঠলেন—বেশ, বেশ। তাহলে শরৎ, এতদিনে আবার কলম ধরেছো? লিখছো তাহলে?

শরৎচন্দ্র মুখ তুলে বললেন—হাঁ দাদা, লিখছি।

জলধর সেন মহাশয় পাশে এসে চেয়ারে বসে বললেন—কী এটা আরম্ভ করলে ভাই?

একটু হেসে শরৎচন্দ্র বললেন—গল্প-উপন্যাস নয়, দাদা। দেশবন্ধু জেল থেকে বেরুলেন, মির্জাপুর পার্কে তাঁর সম্বর্ধনা-সভা হবে, তারই অভিনন্দন-পত্র রচনা করছি।

—নাঃ, আর তোমাকে আমরা বিরক্ত করবো না। আমরা তোমাকে হারিয়েছি!

রাজনীতির আবর্তে পড়ে শরৎচন্দ্রকে ১৯২২-২৩ সালে সিরাজগঞ্জ

কনফারেন্সে যোগ দিতে হলো। ফিরে আসবার সময় সুভাষচন্দ্র জিদ ধরলেন—দাদা, এবার আপনাকে জেলে যেতেই হবে।

শরৎচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন—ছ্যাখো সুভাষ, জেলে যেতে তো আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমার ওই—

সুভাষচন্দ্র বললেন—ও ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে। আমরাই করে দেবো।

শরৎচন্দ্র বললেন—সে না-হয় যতদিন আমার সঙ্গে রইলে ততদিন। তারপর তুমি বেরিয়ে এলে কি হবে ?

সুভাষচন্দ্র তখন বোঝাতে চাইলেন—তাঁদের প্রথম প্রথম জেলে গেলে ব্লেডের অভাবে দাড়ি কামাতে না পেরে কী কষ্টই-না হতো। তারপর জেলে যাবার সময় জুতোর শুকতলাতে লুকিয়ে ব্লেড নিয়ে যাওয়া হতো।

কিন্তু জুতোর মধ্যে লুকিয়ে আফিম নিয়ে যাওয়া শরৎচন্দ্রের মনঃপূত হয়নি ব'লে জেলে যাওয়া আর হয়নি।

রাজনৈতিক কর্মের মধ্যেও শরৎচন্দ্র নিত্য পূজা-আহ্নিক করতেন। তাই দেখে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর গৃহদেবতা রাধাকৃষ্ণ-মূর্তি উপহার দিলেন একদিন। রাজনীতির আবর্তের মধ্যে থেকে দেশবন্ধুর পরম বন্ধু হয়ে, শরৎচন্দ্রের রচনায় বুঝি এখানেই ভাঁটা পড়লো।

অকস্মাৎ নিদারুণ সংবাদ এসে পৌঁছল—দেশবন্ধু নেই !

সেদিন শরৎচন্দ্রের মনের অবস্থা যে কী হয়েছিল, তার এক মর্মস্পর্শী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সুসাহিত্যিক শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় (বাংলার অসহযোগ-আন্দোলন-যুগের খ্যাতনামা কর্মী) মহাশয়ের 'শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন' পুস্তকে :

"দিনকয়েক পরে শিবপুরে শরৎচন্দ্রের বাসায় গেলুম। দরজা ঠেলে ভিতরে গিয়ে দেখি বারান্দায় ইজিচেয়ারে তিনি শুয়ে আছেন, পদতলে প্রবোধবাবু বসে আছেন। আমি প্রবোধবাবুর কাছে নিঃশব্দে বসলুম। চোখের জল হুহু করে বেরিয়ে এল, প্রবোধবাবু অমনি আমার মাথাটিকে তাঁর বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। তাঁর চোখের জল টপটপ করে আমার মাথার উপর পড়তে লাগলো। আমার মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে তিনি বলে উঠলেন—আর কি, সব শেষ!

শরৎচন্দ্র শুয়ে শুয়ে শোকের আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলেন। অকস্মাৎ কেঁদে উঠলেন—হ্যাঁ, সব শেষ!

খানিক বাদে আবার কেঁদে উঠলেন—আমরাই শেষ করলুম তাঁকে! এত মার কি সহ্য হয়!

আবার কিছুক্ষণ নীরব থেকে সহসা হুহু করে কেঁদে উঠে বললেন—'বিদায় দিয়েছ যারে নয়নজলে, এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে'?

হঠাৎ অধীর উত্তেজনায় উঠে বসলেন, চীৎকার করে বললেন—বেশ করেছেন! কাঁদতে কাঁদতে সেদিন তিনি বিদায় নিয়েছিলেন, সেদিন তো তাঁর সঙ্গে আমরা কাঁদিনি, হাত ধরে বলিনি তো তাঁকে, ওগো আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি, আমরা তোমাকে চাই, আমরা শুধু তোমারি। তাইতো তিনি শোধ নিয়েছেন! তাঁকে আমরা কাঁদিয়েছি—তিনি আমাদের কাঁদালেন। সুদে আসলে শোধ নিয়েছেন। বেশ করেছেন। We didn't deserve him, প্রবোধ, we didn't deserve him··· কান্নার ভারে আবার ইজিচেয়ারে লুটিয়ে পড়লেন।"

চিত্তরঞ্জন দাশের মহাপ্রয়াণের পর শরৎচন্দ্রের মন গেল ভেঙে—ভাবলেন নোংরা রাজনীতিতে থেকে কি হবে। শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র রাজনীতি থেকে অবসর নিলেন।

শরৎচন্দ্রের রাজনীতিতে প্রবেশ করার শুরু থেকে অনেকেই অনুযোগ করে এসেছেন—আপনি সাহিত্যিক, রাজনীতির নোংরামি আপনার জন্য নয়।

তার উত্তরে শরৎচন্দ্র বলতেন—এটা তোমাদের ভুল। রাজনৈতিক আলোচনায় যোগ দেওয়া প্রত্যেক দেশবাসীর কর্তব্য। বিশেষতঃ, আমাদের দেশ হলো পরাধীন। এ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন প্রধানতঃ স্বাধীনতার আন্দোলন। মুক্তির আন্দোলন। এই আন্দোলনে সাহিত্যসেবীদের সর্বাগ্রে যোগ দেওয়া উচিত।

॥ দশ ॥

রাজনীতির হাট থেকে বিদায় নিয়ে শরৎচন্দ্র স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে চাইলেন। নির্জনতাই এখন তাঁর কাছে কাম্য হয়ে উঠলো। কিন্তু তাই-বা হয় কই? এইসময়ে জলধর-দাদার তাগাদায় 'ভারতবর্ষে' 'দেনা-পাওনা' প্রকাশিত হতে থাকলো। 'নারীর মূল্য' অংশতঃ 'যমুনা'য় প্রকাশিত হলো।

সাহিত্য-সাধক শরৎচন্দ্রকে ১৯২৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'জগত্তারিণী স্মৃতি-পদক' উপহার দিলেন। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনে এই পুরস্কার হলো এক পরম সাহিত্য-স্বীকৃতি।

এদিকে 'বসুমতী সাহিত্য-মন্দির' শরৎচন্দ্রের পঞ্চম খণ্ড গ্রন্থাবলী

প্রকাশ করলেন (১৯২৪ খ্রীঃ)। গরীব দেশবাসী শরৎ-সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ করতে লাগলো আরো বেশী করে।

বন্ধু-বান্ধবদের ভীড়—নানা সাহিত্য-সভা—এম্‌নি ভাবেই দিন চলে। দেখতে দেখতে জলধর-দাদার তাগাদায় 'ভারতবর্ষে' 'নববিধান' প্রকাশিত হলো। 'পথের দাবী'র লেখাও এগিয়ে চললো।

যখন চারদিক থেকে অর্থ ও খ্যাতি আসছে সেই সময় শরৎচন্দ্র বাড়ি করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। দীর্ঘদিন বাসা ভাড়া করে থেকেই বা লাভ কি ?

হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রকে ৪নং বাজে-শিবপুর ফার্স্ট লেনের বাড়িটি ক্রয় করতে বলেন। বাড়িটা পুরনো থাকায়, তিনি ক্রয় করেননি। নানা দিক চিন্তা ক'রে শরৎচন্দ্র তাঁর দিদি অনিলা দেবীর কথামতো ভগ্নীপতি পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে রূপনারায়ণ নদের তীরে তাঁদের সামতার জায়গাটুকু পছন্দ করলেন।

এই জায়গা কেনবার জন্য শরৎচন্দ্রকে হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট যেতে হলো।

হরিদাসবাবু বললেন—কী সৌভাগ্য ! আজ যে আমার বাসায় ?

—ভায়ার কাছে আসার কারণ আছে।

—কি রকম ?

—আমি এবার একটা বাড়ি করবো ভাবছি।

—কোথায় ? কেমন জায়গা ?

—আমার দিদির বাড়ির কাছে, সামতায়।

হরিদাসবাবু এই কথা শুনে জায়গা কেনার জন্য শরৎচন্দ্রকে

এগারোশো টাকা দেন। জায়গা ক্রয় ক'রে শরৎচন্দ্র এবার অর্থসঞ্চয় করতে লাগলেন নানান পত্র-পত্রিকায় লিখে।

একদিন 'বাতায়ন' পত্রিকার সম্পাদক অবিনাশ ঘোষাল এলেন শরৎচন্দ্রের কাছে। 'বাতায়নে' লেখা প্রকাশের ইচ্ছা থাকলেও, শরৎচন্দ্রের লেখার দক্ষিণা দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব, তবুও তাঁর আসাযাওয়া ছিল। কথায় কথায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা দাদা, আপনার প্রকৃত সাহিত্য-জীবন শুরু হয় কবে থেকে ?

শরৎচন্দ্র বললেন—ছাখো অবিনাশ, আমার সত্যিকারের সাহিত্য-জীবন যা বলতে তা ১৯১৩ সাল থেকেই আরম্ভ। তখন ফণীবাবুর কাগজখানা ('যমুনা') মরো-মরো। আমি মাত্র সবে রেঙ্গুন থেকে এসেছি। ফণীবাবু আমাকে তাঁর কাগজে লিখবার জন্য অনুরোধ করলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল আমি লিখলে তাঁর কাগজখানা বেঁচে যাবে। আমি রাজী হয়ে কিছু লেখা দিয়েছিলুম। কিন্তু পরে আমি পণ্ডশ্রম করতে রাজী হলুম না। এই 'যমুনা'তেই 'চরিত্রহীন'-এর খানিকটা বেরিয়েছিল।

অবিনাশ ঘোষাল তাঁর কাছে এমনি অনেক প্রশ্ন মাঝে মাঝে করতেন। শরৎচন্দ্রকে তার জবাব দিতে হতো।

পিতৃভিটে (দেবানন্দপুর) উদ্ধার করতে না পারায় শরৎচন্দ্র খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। আত্মীয়-স্বজনদের কাছে শরৎচন্দ্র প্রায়ই বলতেন—আমি পিতৃভিটে উদ্ধার করতে পারিনি বটে, কিন্তু সবাই তো কিছু-না-কিছু অংশ পায়। অথচ আমি একগাছা ঝাঁটার মতো তুচ্ছ জিনিসও পাইনি। এ দুঃখটা আমার চিরকালের জন্য মনে জেগে রইলো। তা কি সহজে ভোলা যায় !

অবশেষে সামতাবেড়ে-পানিত্রাসে শরৎচন্দ্র বাড়ি তৈরি করতে শুরু করলেন। এটা ১৯২৫ সালের কথা। মাঝে মাঝে সামতাবেড়েতে গিয়ে বাড়ি-তৈরির কাজে সহায়তা করা আর বাজে-শিবপুরের বাসায় বসে 'পথের দাবী' লেখা এই হলো তাঁর প্রধান কাজ। (বড় গ্রাম সামতার বর্ডারে বাড়ি করেছিলেন বলে শরৎচন্দ্র গ্রামটির নাম দিয়েছিলেন সামতাবেড়ে। কিন্তু আসলে এটি ক্ষুদ্র গ্রাম গোবিন্দ-পুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল।)

এই সময়ে 'বসুমতী' ও 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার আমন্ত্রণে কয়েকটি ছোট গল্প তাঁকে লিখতে হয়। এই গল্পগুলির মধ্যে 'হরিলক্ষ্মী' 'বার্ষিক বসুমতী'তে এবং 'বঙ্গবাণী'তে 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ' প্রকাশিত হয়। এদিকে 'পথের দাবী' শেষ করতে কিছু বাকী আছে।

'বঙ্গবাণী' পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ কুমুদ রায়চৌধুরী একদিন শরৎচন্দ্রের বাসায় হাজির হলেন। 'বঙ্গবাণী'তে শরৎচন্দ্রের একটি উপন্যাস প্রকাশের জন্য তিনি বহুদিন ধরে চেষ্টা করছেন।

কুমুদ রায়চৌধুরী বললেন—আপনার কাছে বহুবার পত্র দিয়েছি, এসেওছি, এবার যা-হোক কিছু একটা দিন।

সেদিন তিনি-ই এই 'পথের দাবী'র সন্ধান পেলেন শরৎচন্দ্রে লেখার ঘরে সোজা প্রবেশ করেই।

শরৎচন্দ্র বললেন—দেখুন, ও প্রকাশ করায় বিপদ আছে।

কুমুদ রায়চৌধুরী হেসে বললেন—সে দেখা যাবে। জেলটা না-হয় আমিই খাটবো।

'বঙ্গবাণী'র ইচ্ছা এতদিন পরে পূর্ণ হলো।

শরৎচন্দ্র 'বঙ্গবাণী'র কাছ থেকে একপয়সাও গ্রহণ করেননি।

এদিকে তার প্রিয় কুকুর ভেলু অসুস্থ হয়ে পড়লো। শরৎচন্দ্র বিলম্ব না করে বেলগাছিয়া পশু-চিকিৎসালয়ে ভেলুকে রেখে মুন্সীগঞ্জের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। ঢাকায় পৌঁছে শরৎচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-সাহিত্যের অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে উঠলেন।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ও ১১ই এপ্রিল এই দু'দিন মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন হয়। সভাপতিরূপে যে অভিভাষণটি শরৎচন্দ্র প্রদান করেছিলেন, তা নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

"আমি জানি, সাহিত্য-শাখার সভাপতি হবার যোগ্য আমি নই, এবং আমারই মতো যাঁরা প্রাচীন, আমারই মতো যাঁদের মাথায় চুল এবং বুদ্ধি দুই-ই পেকে সাদা হ'য়ে উঠেছে তাঁদেরও এ-বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নেই। কারো মনে ব্যথা দিবার আমার ইচ্ছা ছিল না, তবুও যে এই পদগ্রহণে সম্মত হয়েছিলাম, তার একটিমাত্র কারণ এই যে, নিজের অযোগ্যতা ও ভক্তিভাজনগণের মনঃপীড়া, এত বড় বড় দুটো ব্যাপারকে ছাপিয়েও তখন বারংবার এই কথাটাই আমার মনে হয়েছিল যে, এই অপ্রত্যাশিত মনোনয়নের দ্বারা নবীনের দল আজ জয়যুক্ত হয়েছেন। তাঁদের সবুজ পতাকার আহ্বান আমাকে মানতেই হবে, ফল তার যাই কেননা হউক। আর এ প্রার্থনাও সর্বান্তঃকরণে করি, আজ থেকে যাত্রাপথ যেন তাঁদের উত্তরোত্তর সুগম এবং সাফল্যমণ্ডিত হয়।

ষোল বৎসর পূর্বে বাঙ্গলার সাহিত্যিকগণের বার্ষিক সম্মিলনের আয়োজন যখন প্রথম আরব্ধ হয়, আমি তখন বিদেশে। তারও বহুদিন পর পর্যন্তও আমি কল্পনাও করিনি যে, সাহিত্য-সেবাই আমার পেশা হয়ে উঠবে। প্রায় বছর দশেক পূর্বে কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিকের আগ্রহ ও একান্ত চেষ্টার ফলেই আমি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়ে পড়ি।

বাঙ্গলার সাহিত্য-সাধনার ইতিহাসে এই বছর দশেকের ঘটনাই আমি জানি।

সুতরাং এ-বিষয়ে বলতেই যদি কিছু হয়, ত এই স্বল্প কয়টা বছরের কথাই শুধু বলতে পারি।

মাসকয়েক পূর্বে পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলেছিলেন, এবারে যদি তোমার লক্ষ্ণৌ সাহিত্য-সম্মিলনে যাওয়া হয়, ত অভিভাষণের বদলে তুমি একটা গল্প লিখে নিয়ে যেও। অভিভাষণের পরিবর্তে গল্প? আমি একটু বিস্মিত হ'য়ে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি শুধু উত্তর দিয়েছিলেন, সে ঢের ভাল।

এর অধিক আর কিছু তিনি বলেননি। এতদিন বৎসরের পর বৎসর যে সাহিত্য-সম্মিলন হয়ে আসছে—হয় তার অভিভাষণগুলির প্রতি তাঁর আগ্রহ নাই, না হয়, আমার যা কাজ সেই আমার পক্ষে ভাল, এই কথাই তাঁর মনের মধ্যে ছিল। একবার ভেবেছিলাম লক্ষ্ণৌ যখন যাওয়াই হলো না, তখন যেখানে যাচ্ছি সেখানেই তাঁর আদেশ পালন করব। কিন্তু নানা কারণে সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত করতে পারলাম না। কিন্তু আজ এই অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর লেখা পড়তে উঠে—আমার কেবলই মনে হচ্ছে, সেই আমার ঢের ভাল ছিল। একজন সাধারণ সাহিত্যসেবকের পক্ষে এতবড় সভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সাহিত্যের ভালমন্দ বিচার করতে যাওয়ার মতো বিড়ম্বনা আর নেই।

বঙ্গসাহিত্যের অনেকগুলি বিভাগ,—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস। সেই সেই বিভাগীয় সভাপতিদের পাণ্ডিত্য অসাধারণ, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ এবং মার্জিত। তাঁদের কাছে আপনারা অনেক নব নব রহস্যের সন্ধান পাবেন, কিন্তু আমি সামান্য একজন গল্প-লেখক। গল্প-লেখার সম্বন্ধেই দু'একটা কথা বলতে পারি, কিন্তু সাহিত্যের দরবারে তার কতটুকু বা মূল্য! কিন্তু সেটুকু মূল্যও আমি আপনাদের নির্বিচারে দিতে বলিনি। কোনদিন বলিনি, আজও বলব না। এ শুধু আমার নিতান্তই নিজের কথা। যে কথা সাহিত্য-সাধনার দশবৎসর কাল আমি নিঃসংশয়ে, অকুণ্ঠিতচিত্তে ধরে আছি।

এই দশ বছরে একটা জিনিস আমি আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে লক্ষ্য করে এসেছি যে, দিনের পর দিন এর পাঠক-সংখ্যা নিরন্তর বেড়ে চলেছে। আর তেমনি অবিশ্রান্ত এই অভিযোগেরও অন্ত নেই যে, দেশের সাহিত্য দিনের পর দিন অধঃপথেই নেমে

চলেছে। প্রথমটা সত্য এবং দ্বিতীয়টা সত্য হ'লে ইহা দুঃখের কথা, ভয়ের কথা—কিন্তু ইহার প্রতিরোধের আর যা উপায়ই থাক, সাহিত্যিকদের কেবল কটুকথার চাবুক মেরে-মেরেই তাঁদের দিয়ে পছন্দমতো ভাল ভাল বই লিখিয়ে নেওয়া যাবে না। মানুষ ত গরু-ঘোড়া নয়! আঘাতের ভয় তার আছে, এ কথা সত্য, কিন্তু অপমান-বোধ বলেও যে তার আর একটা বস্তু আছে, এ কথাও তেমনি সত্য। তার কলম বন্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু ফরমায়েসী বই আদায় করা যায় না। মন্দ বই ভাল নয়, কিন্তু তাকে ঠেকাবার জন্যে সাহিত্য-সৃষ্টির দ্বার রুদ্ধ করে ফেলা সহস্রগুণ অধিক অকল্যাণকর।

কিন্তু দেশের সাহিত্য কি নবীন সাহিত্যিকের হাতে সত্য-সত্যই নীচের দিকে নেমে চলেছে? এ যদি সত্য হয়, আমার নিজের অপরাধও কম নয়, তাই এই কথাটাই আজ আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই। এ কেবল আলোচনার জন্যেই আলোচনা নয়, এই শেষ কয় বৎসরের প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা দেখে আমার মনে হচ্ছে, যেন সাহিত্য-সৃষ্টির উৎস-মুখ ধীরে ধীরে অবরুদ্ধ হয়ে আসছে। সংসারে রাবিশ বই-ই কেবল একমাত্র রাবিশ নয়, সমালোচনার ছলে দায়িত্ববিহীন কটূক্তির রাবিশেও বাণীর মন্দির-পথ একেবারে সমাচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর চারিদিকের সাহিত্যিকমণ্ডলী একদিন বাঙ্গলার সাহিত্যাকাশ উদ্ভাসিত করে রেখেছিলেন। কিন্তু মানুষ চিরজীবী নয়, তাঁদের কাজ শেষ করে স্বর্গীয় হয়েছেন। তাঁদের প্রদর্শিত পথ, তাঁদের নির্দিষ্ট ধারার সঙ্গে নবীন সাহিত্যিকদের অনৈক্য ঘটেছে—ভাষা, ভাব ও আদর্শে। এমন কি, প্রায় সকল বিষয়েই। এইটেই অধঃপথ কিনা, এই কথাটাই আজ ভেবে দেখবার।

আর্ট-এর জন্যই আর্ট, এ কথা আমি পূর্বে কখনও বলিনি, আজও বলিনে। এর যথার্থ তাৎপর্য আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। এটা উপলব্ধির বস্তু, কবির অন্তরের ধন। সংজ্ঞা নির্দেশ করে অপরকে এর স্বরূপ বুঝান যায় না। কিন্তু সাহিত্যের আর একটা দিক আছে, সেটা বুদ্ধি ও বিচারের বস্তু। যুক্তি দিয়ে আর-একজনকে তা বুঝান যায়। আমি এই দিকটাই আজ বিশেষ করে আপনাদের

কাছে উদ্‌ঘাটিত করতে চাই। বিষ্ণুশর্মার দিন থেকে আজও পর্যন্ত আমরা গল্পের মধ্য থেকে কিছু একটা শিক্ষা লাভ করতে চাই। এ প্রায় আমাদের সংস্কারের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। এদিকে কোন ত্রুটি হ'লে আর আমরা সইতে পারিনে। সক্রোধ অভিযোগের বান যখন ডাকে, তখন এইদিককার বাঁধ ভেঙেই তা হুঙ্কার দিয়ে ছোটে। প্রশ্ন হয়, কি পেলাম, কতখানি এবং কোন্ শিক্ষালাভ আমার হ'ল। এই লাভালাভের দিক্‌টাতেই আমি সর্বপ্রথমে দৃষ্টি দিতে চাই।

মানুষ তার সংসারের ভাব নিয়েই ত মানুষ; এবং এই সংসার ও ভাব নিয়েই প্রধানতঃ নবীন সাহিত্য-সেবীর সহিত প্রাচীন-পন্থীর সংঘর্ষ বেধে গেছে। সংসার ও ভাবের বিরুদ্ধে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায় না, তাই নিন্দা ও কটুবাক্যের সূত্রপাতও হয়েছে এইখানে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি। বিধবা-বিবাহ মন্দ, হিন্দুর ইহা মজ্জাগত সংস্কার। গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে বিধবা নায়িকার পুনর্বিবাহ দিয়া কোন সাহিত্যিকেরই সাধ্য নাই—নিষ্ঠাবান হিন্দুর চক্ষে সৌন্দর্য সৃষ্টি করবার। পড়বামাত্রই মন তাঁর তিক্ত বিষাক্ত হয়ে উঠবে। গ্রন্থের অন্যান্য সমস্ত গুণই তাঁর কাছে ব্যর্থ হয়ে যাবে।...

'পল্লী-সমাজ' ব'লে আমার একখানা ছোট বই আছে। তার বিধবা রমা বাল্যবন্ধু রমেশকে ভালবেসেছিল ব'লে আমাকে অনেক তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে। একজন বিশিষ্ট সমালোচক এমন অভিযোগ করেছিলেন যে, এতবড় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে গ্রামে বিধবা আর কেউ থাকবে না। মরণ-বাঁচনের কথা বলা যায় না, প্রত্যেক স্বামীর পক্ষেই ইহা গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আর একটা দিক ত আছে। ইহার প্রশ্রয় দিলে ভাল হয় কি মন্দ হয়, হিন্দুসমাজ স্বর্গে যায় কি রসাতলে যায়, এ মীমাংসার দায়িত্ব আমার আর নাই। রমার মতো নারী ও রমেশের মতো পুরুষ কোন কালে, কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দু-সমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হ'ল এই যে, এতবড় দুটি মহাপ্রাণ নরনারী এ জীবনে বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু হ'য়ে গেল। মানবের হৃদয়-দ্বারে বেদনার এই বার্তাটুকুই যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি ত তার বেশী আ

কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়। রমার ব্যর্থ জীবনের মতো এ রচনা বর্তমানে ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের বিচারশালায় নির্দোষীর এতবড় শাস্তিভোগ একদিন কিছুতেই মঞ্জুর হবে না, এ কথা আমি নিশ্চয় জানি। এ বিশ্বাস না থাকলে সাহিত্যসেবীর কলম সেইখানেই বন্ধ হ'য়ে যেত।···পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়, এই কথাটা একদিন আমি বলেছিলাম। কথাটাকে যৎপরোনাস্তি নোংরা করে তুলে আমার বিরুদ্ধে গালিগালাজের আর সীমা রইল না। মানুষ হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল। অত্যন্ত সতী নারীকে আমি চুরি, জুয়াচুরি, জাল ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দেখেছি এবং ঠিক এর উল্টোটা দেখাও আমার ভাগ্যে ঘটেছে। এ সত্য নীতি-পুস্তকে স্বীকার করার আবশ্যকতা নেই। কিন্তু বুড়ো ছেলেমেয়েকে যদি গল্পচ্ছলে এই নীতিকথা শোণানোর ভার সাহিত্যকে নিতে হয়, তা আমি বলি সাহিত্য না থাকাই ভাল। সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্বে ছিল না, পরেও হয়ত একদিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, এ কথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায়, ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়? ···

আর একটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। ইংরাজিতে Idealistic ও Realistic বলে দুটো বাক্য আছে। সম্প্রতি কেউ কেউ এই অভিযোগ উত্থাপিত করেছেন যে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্য অতিমাত্রায় realistic হ'য়ে চলেছে। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা হয় না। অন্ততঃ উপন্যাস যাকে বলে, সে হয় না। তবে কে কতটা কোন ধার ঘেঁষে চলবে, সে নির্ভর করে সাহিত্যিকের শক্তি ও রুচির উপরে। তবে একটা নালিশ এই করা যেতে পারে যে, পূর্বের মতো রাজারাজড়া এবং জমিদারের দুঃখ-দৈন্য-দ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্যসেবীর মন আর ভরে না। তারা নীচের স্তরে নেমে গেছে। এটা আপসোসের কথা নয়। বরঞ্চ এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুষ-সাহিত্যের মতো যেদিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।

কিন্তু আর না। আপনাদের অনেক সময় নিয়েছি, আর নিতে পারব না। কিন্তু বসবার আগে আর একটা কথা জানাবার আছে। বাঙলার ইতিহাসে এই বিক্রমপুর বিরাট গৌরবের অধিকারী। বিক্রমপুর পণ্ডিতের স্থান, বীরের লীলাক্ষেত্র; সজ্জনের জন্মভূমি। আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ চিত্তরঞ্জন এই দেশেরই মানুষ। মুন্সীগঞ্জে যে মর্যাদা আপনারা আমাকে দিয়েছেন, সে আমি কোনদিন বিস্মৃত হব না। আপনারা আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার গ্রহণ করুন।"

কয়েকদিন পরে মুন্সীগঞ্জ থেকে কোলকাতায় ফিরে এসেই ভেলুকে দেখতে শরৎচন্দ্র ছুটলেন বেলগাছিয়া পশু-চিকিৎসালয়ে। তাকে বাড়িতে নিয়ে এসে নিজে চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু ভেলু ক'দিনের মধ্যেই মারা গেল।

ছেলেমানুষের মতো কান্নায় বুক ভাসিয়ে শরৎচন্দ্র বাজে-শিবপুরের এক প্রতিবেশীর বাগানে তাকে সমাধি দিয়ে, তার সমাধির ওপর চার-লাইনের একটি কবিতা লিখে দিলেন। নাওয়া নেই খাওয়া নেই—শুধু চোখের জল ফেলা আর সমাধির পাশে বসে থাকা। হিরণ্ময়ী দেবী অনেক বোঝালেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র স্ত্রীর কোনো কথাই শুনলেন না। খবর পেয়ে, জলধর সেন মহাশয় ছুটে এলেন। তিনি এসে দেখলেন—সমাধির ধারে বসে শরৎচন্দ্র কাঁদছেন। কাছে এসে জলধর সেন বললেন—একি দাদা, কি সব শুনলুম—

শরৎচন্দ্র ছেলেমানুষের মতো কেঁদে জলধর সেনকে জড়িয়ে ধরে বললেন—দাদা, ভেলু আমার আর নেই! সে আমায় ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে।

শরৎচন্দ্রের এই কান্না দেখে জলধর সেন মহাশয়েরও চোখে জল এলো। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—তাই ব'লে নাওয়া-খাওয়া

ত্যাগ করতে হবে? আমি নিজে তোমাকে খাইয়ে তবে বাড়ি ফিরবো।

ভেলুর প্রতি শরৎচন্দ্রের কিরূপ স্নেহ-মমতা ছিল, নিচের দুখানি চিঠি পড়লেই বোঝা যাবে।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র:

বাজে শিবপুর, হাওড়া
২৮. ৪. ২৫

... শরীরটা তেমন সুস্থ নয়।

ভেলু বেঁচে নেই। গত বৃহস্পতিবারের আগের বৃহস্পতিবারে আমি ঢাকা থেকে সকালে এসে পৌঁছাই। তখনি বেলেগেছে হাসপাতাল থেকে তাকে মোটরে করে বাড়ী আনি। এসেই কিন্তু সে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়ে। ডাক্তারেরা বলেন acute Gastritis। ৬টার সময় তার প্রাণ বার হয়ে গেল। শেষদিন বড় যন্ত্রণা পেয়েই সে গেছে।

বুধবার জোর করে কড়া ওষুধ খাওয়াবার চেষ্টা করি, চামচে দিয়ে মুখে গুঁজে দেবার অনেক চেষ্টা করেও ওষুধ তার পেটে গেল না; কিন্তু রাগের ওপর আমাকে কামড়ালে। সেদিন সমস্ত রাত আমার গলার কাছে মুখ রেখে কি তার কান্না! ভোরবেলায় সে কান্না তার থামলো।

আমার চব্বিশঘণ্টার সঙ্গী, কেবল এ দুনিয়ায় আমাকেই সে চিনেছিল। যখন কামড়ালে এবং সবাই ভয় পেলে তখন রবিবাবুর এই কথাটাই শুধু মনে হতে লাগলো—তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইক অবহেলা! তার আঘাত ছিল; কিন্তু অবহেলা ছিল না। এর পূর্বে এত ব্যথা আমি আর পাইনি।

... ডাক্তার প্রভৃতি বহু বন্ধুবান্ধবেই এখন ধরেছেন চিকিৎসা করাতে। অর্থাৎ পাগলা-কুকুর কামড়ানোর পর যা করা উচিত। উচিত যা তাই চলবে। ২৮টা injection-এর আজ ১০টা injection হয়ে গেল, আরো ১৮টা বাকি—তাও সম্পূর্ণ

হবে। মানুষকে বাঁচাতেই হবে—কারণ your life is too valuable। দেখাই যাক, valuable life-এর শেষটা কি দাঁড়ায়। ইতি—তোমার শরৎ

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র :

২৭শে এপ্রিল, ১৯২৫

... বাড়ীতে নিয়ে এলাম বৃহস্পতিবার, পরের বৃহস্পতিবার সকাল ৬টায় ভেলু মারা গেল। আমার চব্বিশঘণ্টার সঙ্গী আর নেই। সংসারে এতবড় ব্যথার ব্যাপারও যে আছে, এ আমি ঠিক বুঝতাম না। আর একটা জিনিস টের পেলাম চারু, পৃথিবীতে obejectiveটা কিছুই নয়, subjectiveটাই সমস্ত। নইলে একটা কুকুর বই ত নয়! রাজা ভরতের উপাখ্যান কিছুতেই মিথ্যে নয়।

—তোমার শরৎ

বাজে-শিবপুরে কিছুদিন অবস্থান করার পর শরৎচন্দ্র সপরিবারে চলে এলেন সামতাবেড়ের বাড়িতে। তখন বাড়িটি সম্পূর্ণ হয়নি। রূপনারায়ণ নদের ধারেই তাঁর এই বাড়িটি দেখতে ঠিক ছবির মতো। এখানে অনেক বন্ধুবান্ধব প্রায়ই আসতেন। বাজে-শিবপুরের প্রতিবেশী প্রতুল মুখোপাধ্যায়, অনুরূপ চট্টোপাধ্যায়, সন্ন্যাসী সাধুখাঁ, ধ্রুব পাল, বন্ধু সুবোধ রায় মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্রের বৈঠকী আসরে এসে যোগ দিতেন।

শরৎচন্দ্র যেখানে বাড়ি তৈরি করেছিলেন, তার আশপাশে ছিল জঙ্গল। অনেকে বলতেন সেখানে সাপের উপদ্রব আছে। শরৎচন্দ্র শুনে হেসে বলতেন—সে আমি জানি। কিন্তু সাপকে আবার ভয় করার কি আছে?

সামতাবেড়েতে আসার পাঁচ-ছ'মাস পরে বন্ধু সুবোধ রায় ও প্রতুল মুখোপাধ্যায় এসেছেন শরৎচন্দ্রের পল্লীভবনে বেড়াতে।

শরৎচন্দ্র গল্পগুজবে তখন মেতে ছিলেন। এমন সময় একটা চীৎকার শোনা গেল—'সাপ! সাপ!' একজন দৌড়ে এসে শরৎচন্দ্রকে বললে—বাড়ির পিছনদিকে বাঁশঝাড়ের সামনে পাকা পায়খানার সিঁড়ির উপর একটা বড় সাপ দেখা গেছে।

শরৎচন্দ্র বিলম্ব না করে একটা ছড়ি আর পাঁচ-সেলের টর্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। প্রতুলবাবু বাধা দিয়ে বললেন—ওকি পাগলামি করছেন দাদা! এই অন্ধকারে ঐ ঝোপঝাড়ের মধ্যে কেন যাচ্ছেন? আর যদি নিতান্তই যেতে চান, একটা মোটা লাঠি বরং নিয়ে যান।

শরৎচন্দ্র বাধা দিয়ে বললেন—তুমি চুপ করে বোসো তো? তোমায় তো আর সঙ্গে যেতে ডাকছি না।

প্রতুলবাবু হেসে বললেন—ডাকলেও আমি সঙ্গে যেতাম কিনা!

মিনিট পাঁচেক পরেই শরৎচন্দ্র ফিরে এলেন। তাঁর ছড়িতে একটা বড় সাপ ঝুলছে। সাপটাকে সামনের উঠানে রেখে টর্চের আলো ফেলে বললেন—এই ছ্যাখো, তুমি তো ভয়েই অস্থির! সাপকে আবার ভয় কিসের?— তারপর ভালো করে দেখে বললেন—একটা জব্বর গোখরো হে!

এই সাপ-মারার ঘটনা শুনে কাছাকাছি থেকে অনেক লোকজন জড়ো হলো। নানা মন্তব্যে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ শরৎচন্দ্রের প্রিয় কুকুর 'টেবি' (সামতাবেড়ের বাড়ির কুকুর) সাপের কাছে গিয়ে ঘ্রাণ নিতেই, চক্ষের পলকে গোখরো-সাপটা ফণা তুলেই এক ছোবল! টেবি চীৎকার করে লাফ দিল। সকলেই মনে করল ছোবলটা টেবির উপরেই পড়েছে।

সাপটাকে মেরে ফেলে শরৎচন্দ্র বালকের মতো আকুল হয়ে

পড়লেন—টেবিকে কি করে বাঁচানো যায়। কিন্তু কুকুরটিকে পরীক্ষা করে দেখা গেল, তাকে সর্পবর কামড়াতে পারেনি।

শহরের সমস্ত কোলাহল থেকে সরে শরৎচন্দ্র বেশ কিছুদিন এখানে অবস্থান করলেন। গাঁয়ে ঘুরে বেড়ানো—গরীবদের প্রতি সহানুভূতি—এইসব নিয়েই তাঁর দিন কেটে যায়।

মাঝে মাঝে গোবিন্দপুর থেকে তাঁর বড়দিদি অনিলা দেবী ও তাঁর স্বামী পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় আসতেন। তাঁদের সঙ্গে নানা সুখ-দুঃখের কথা কইতেন। এখানে কিছুদিন অবস্থান করবার পর কাজের-মানুষ শরৎচন্দ্রকে আবার ফিরতে হলো বাজে-শিবপুরে।

এদিকে 'পথের দাবী' 'বঙ্গবাণী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। তাই দেখে এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্সের স্বত্বাধিকারী শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয় বাজে-শিবপুরে ছুটে এলেন 'পথের দাবী'র গ্রন্থ-স্বত্ব ক্রয় করতে। শরৎচন্দ্র বললেন—লেখা শেষ হলেই সে-ব্যবস্থা করা যাবে।

কিন্তু সুধীরবাবু সেইদিনই শরৎচন্দ্রকে হাজারটাকার চেক দিয়ে এলেন।

দেখতে দেখতে 'বঙ্গবাণী'তে 'পথের দাবী' ছাপা শেষ হয়ে গেল। শরৎচন্দ্র একদিন লেখার ফাইলগুলি নিয়ে সুধীরবাবুর কাছে দিয়ে এলেন। সুধীরবাবু কিন্তু 'পথের দাবী' সম্পূর্ণ পড়ে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। তিনি বিলম্ব না করে ছুটে এলেন বাজে-শিবপুরে; শরৎচন্দ্রকে বললেন—কিছু অংশ আপনাকে বাদ দিতে হবে, নইলে আমাকে অভিযুক্ত হতে হবে।

শরৎচন্দ্র সুধীরবাবুর কথা শুনে রেগে উঠলেন। তাঁর হাত থেকে

লেখার ফাইলগুলি ছিনিয়ে নিয়ে বললেন—একটি শব্দও বর্জন করা হবে না। আপনার হাজারটাকা যথাসময়েই ফেরত পাবেন।

কিন্তু মুশকিল হলো। শরৎচন্দ্র সেই ফাইলগুলি নিয়ে হরিদাস-বাবুর কাছে এলেন। তিনি সব শুনে বললেন—'পথের দাবী' প্রকাশ করা অসম্ভব। আপনি অন্য কোথাও দেখুন।

শরৎচন্দ্র মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে চলে এলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রদ্বয় রমাপ্রসাদ ও উমাপ্রসাদের নিকট। তাঁরা সব শুনে বললেন—আমরা এ বই ছাপতে রাজী।

কিন্তু 'পথের দাবী' কোনো প্রেস ছাপতে চাইলো না। শেষে রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কটন প্রেসের মালিক সত্যকিঙ্করবাবুর কাছে এলে, তিনিই এই ত্বঃসাহসের কাজে অগ্রসর হওয়ায়, ১৯২৬ সালে 'পথের দাবী' অল্প কয়েকদিনের মধ্যে পুস্তকাকারে প্রকাশ পেল।

বাংলা সরকার 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত করলেন। এমন কি, ধরপাকড়ও শুরু হয়ে গেল এই বই নিয়ে। সরকারের এই জঘন্য নীতি দেখে শরৎচন্দ্র ছুটলেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

রবীন্দ্রনাথকে তিনি বললেন—আপনাকে আমার হয়ে কিছু বলতে হবে, রবিবাবু।

রবীন্দ্রনাথ মৃত্থ হেসে বললেন—এ নিন্দনীয় আন্দোলন থেকে মুক্ত হয়ে থাকুন।

রবীন্দ্রনাথের মুখে এই কথা শুনে শরৎচন্দ্র মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে এলেন।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে যে পত্রখানি লিখেছিলেন তা উদ্ধৃত হলো :

কল্যাণীয়েষু—

তোমার 'পথের দাবী' পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। লেখকের কর্তব্যের হিসাবে সেটা দোষের না হতে পারে—কেননা লেখক যদি ইংরেজ রাজকে গর্হণীয় মনে করেন তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চুপ করে না থাকার যে বিপদ আছে, সেটুকু স্বীকার করাই চাই। ইংরেজ রাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজ রাজকে আমরা নিন্দা করব সেটাতে পৌরুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম—আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েচে তাতে এই দেখলেম—একমাত্র ইংরেজ গভর্নমেণ্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গভর্নমেণ্টই এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না। নিজের জোরে নয়, পরন্তু সেই পরের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনা মাত্র—তাতে ইংরেজ রাজের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়, নিজের প্রতি নয়। রাজশক্তির আছে গায়ের জোর। তার বিরুদ্ধে কর্তব্যের খাতিরে যদি দাঁড়াতেই হয় তাহলে অপরপক্ষে থাকা উচিত চারিত্রিক জীবন। অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর। কিন্তু আমরা সেই চারিত্রিক জোরটাই ইংরেজ রাজের কাছেই দাবী করি, নিজের কাছে নয়; তাতে প্রমাণ হয় যে, মুখে যাই বলি, নিজের অগোচরে ইংরেজকে আমরা পূজা করি—ইংরেজকে গাল দিয়ে কোন শাস্তি প্রত্যাশা না করার দ্বারাই সেই প্রজার অনুষ্ঠান। শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা। অন্য কোনো প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার দ্বারা এটি হত না। আমরা রাজা হলে যে হতই না, সে আমাদের জমিদারের ও ভারতীয় রাজন্যের বহুবিধ ব্যবহারে প্রত্যহই দেখতে পাই। কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলিনে—শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে। যে কোন দেশেই রাজশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেচে সেখানে এমনিই ঘটবে—রাজ-বিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকতে পারে না এই কথাটা নিঃসন্দেহ জেনেই ঘটেচে।

তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত—কিন্তু তোমার মতো লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে। দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই—অপরিণত বয়সের বালক-বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজ রাজ যদি তোমার বই-প্রচার বন্ধ করে না দিত তা হলে এই বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা ও অজ্ঞতা। শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য—আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়। ইতি—২৭শে মাঘ, ১৩৩৩

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'পথের দাবী'র পরেও শরৎচন্দ্রের লেখনী-শক্তি অব্যাহত ছিল। এই সময়ে 'শ্রীকান্ত, তৃতীয় পর্ব' 'ভারতবর্ষে' আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়ে পুস্তকাকারে ১৯২৭ সালে আত্মপ্রকাশ করলো।

এইবার তাঁর কয়েকটি উপন্যাস নাটকাকারে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হতে লাগলো। 'ষোড়শী'ই হলো সর্বপ্রধান নাটক। হাজারে হাজারে দর্শক তাঁর বই দেখবার জন্য নাট্যমঞ্চে ভীড় করে। নটগুরু শিশির-কুমার ভাদুড়ীর অনন্যসাধারণ পরিচালনায় তাঁর নাটক সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে মঞ্চের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করলো। শরৎচন্দ্র স্বয়ং তাঁর বই-এর মঞ্চাভিনয় দেখে এলেন।

বাজে-শিবপুরে অবস্থানকালে শরৎচন্দ্র শিবপুরের সাহিত্য-সেবীদের একটি প্রতিষ্ঠান—সাহিত্য-সংসদের সভাপতি ছিলেন।

পাড়া-প্রতিবেশীদের চাপে পড়েই এই সভাপতির পদ তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও ধ্রুবকুমার পাল। শেষে এই সংসদের পরিচালনার ভার আসে তরুণদের হাতে। তাদের সাহিত্য-নিষ্ঠা ছিল, উদ্যম ছিল,—শরৎ-সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগও ছিল। শরৎচন্দ্রকে মাঝে মাঝে এইসব সাহিত্য-সেবীদের নানা উপদেশ দিতে হতো।

শরৎচন্দ্র তখন খ্যাতির উচ্চ শিখরে। নানা জায়গা থেকে তাঁর সভাপতি হবার ডাক আসে। অথচ এসব তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। এই সময়ে রংপুরে Youth Conference (যুব-সম্মেলন) ১৯২৯ সালে ২৯শে মার্চ আরম্ভ হলো। শরৎচন্দ্রকে এই যুব-সম্মেলনে সভাপতি হতে হলো। ঠিক এই সময়ে মাজুতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের আয়োজন হয়। এখানেও শরৎচন্দ্রকে সাহিত্য-শাখার সভাপতি হতে হয়। কিন্তু সাহিত্য-সভার ডাকের চেয়েও দেশের যুবকদের আহ্বানে সাড়া দেওয়াই তাঁর কাজ হয়েছিল প্রধান। মহাত্মা গান্ধীর নীতি তিনি সমর্থন করেন না। তিরিশ কোটি ভারতবাসীর সর্বাঙ্গ খদ্দরে মুড়ে ছু'হাতে চরকা ঘোরালে, ভারতবর্ষ যে কোনদিন স্বাধীন হতে পারবে না এ-কথা তিনি অসঙ্কোচে সেদিন বলেছিলেন। এই নিয়ে রাজনৈতিক মহলে অনেক আন্দোলন হয়েছিল। তিনি বললেন—"আজ যুবকদের মধ্যে যে অস্থিরতা, যে চাঞ্চল্য ও অসহিষ্ণুতার ভাব দেখা দিয়াছে, তা নবজীবনের নবসৃষ্টির সূচনার লক্ষণ। বৈদেশিক শাসনে আমাদিগকে অস্ত্রহীন ও দুর্বল করিয়াছে সত্য, কিন্তু আমাদের আভ্যন্তরীণ ভেদ-বৈষম্যই আমাদিগকে অধিকতর দুর্বল করিয়াছে এবং প্রকৃত উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। এই হৃদয়হীন সমাজ, প্রেমহীন ধর্ম,

শরৎচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা—স্বামী বেদানন্দ (প্রভাসচন্দ্র)

সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত বিরোধ, আর্থিক বৈষম্য এবং নারীর উপর ব্যবহার—এ সবই আমাদের দুর্দশার কারণ।"

চারিদিকের হট্টগোলের মধ্যে থেকে শরৎচন্দ্র আর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারলেন না। বন্ধুবান্ধবদের আনাগোনা দিনের পর দিন বেড়েই যেতে লাগলো। যাঁরা প্রায়ই আসতেন তাঁদের মধ্যে কবিশেখর কালিদাস রায়, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, কবি নরেন্দ্র দেব ও তাঁর স্ত্রী রাধারাণী দেবী, হরিদাস শাস্ত্রী—তাঁর বইগুলি নিয়ে নানা আলোচনা করতেন। এই ভীড় থেকে দূরে সরে থাকার জন্য শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ের বাড়িতে উঠে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সাহিত্য-সংসদের সভ্যরা স্থির করলেন—শরৎচন্দ্রকে ঘরোয়া ভাবে অভিনন্দন দেবেন। সম্বর্ধনার কথা শুনে শরৎচন্দ্র রাজী হলেন না। বললেন—ওসব বাপু আমি চাইনে। প্রকাশ্য সভায় গিয়ে বসা—গলায় মালা ঝোলানো, প্রশস্তি শোনা, একসঙ্গে ফটো তোলা—ওসব বাপু মোটেই ভালো লাগে না।

অনেক চেষ্টা করে তবে তাঁর মত পাওয়া গেল। ফাল্গুনের এক শুভদিনে বিজয়চন্দ্র মজুমদারকে সভাপতি করে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো।

॥ এগারো ॥

সম্বর্ধনার ঘটা শেষ হ'লে শরৎচন্দ্র সপরিবারে চলে এলেন সামতাবেড়ের নূতন পল্লী-ভবনে। এখানে এসে তাঁর প্রথম কাজ হলো দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দেওয়া রাধাকৃষ্ণ-মূর্তিটির প্রতিষ্ঠা করা।

প্রতিষ্ঠা ক'রে শরৎচন্দ্র মূর্তিটির নিয়মিত পূজা-অর্চনা করতে লাগলেন। তা ছাড়া গ্রামের রাস্তাঘাট নির্মাণ, ছেলে-মেয়েদের স্কুল আর গরীব-দুঃখীদের জন্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় শরৎচন্দ্র ব্যাপৃত হলেন। বাড়ির সম্মুখে শরৎচন্দ্র বড় আকারের তিনটি পুকুরও খনন করালেন।

একদিন সম্পর্কীয় মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এলেন বেড়াতে। শরৎচন্দ্র নীচের বারান্দায় চেয়ারে বসে একখানি বই পড়ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সোজা সামনে এসে দাঁড়াতেই শরৎচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন—সুরেন-মামা যে—এসো, বোসো। তারপর কি খবর ?

সুরেন্দ্রনাথ একটা চেয়ারে বসে বললেন—খবর তোমার। তোমার এই বাড়িটি সত্যিই সুন্দর, শরৎ। ঠিক যেন ছবির মতো।

শরৎচন্দ্র বললেন—এসো মামা, ভিতরে যাই।

অন্দর-মহলে সুরেন্দ্রনাথ এই প্রথম এলেন। প্রকাশচন্দ্র বললেন—কেমন আছো, সুরেন-মামা ? অনেকদিন পরে যে !

মৃদু হাসতে হাসতে সুরেন্দ্রনাথ বাড়িটি ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগলেন। শরৎচন্দ্র এক ফাঁকে চাকর গোপালকে ডেকে বললেন—বাড়িতে বলে দে, সুরেন-মামা এসেছেন। আমার পুকুরের মাছ-ভাত খেয়ে তবে যাবেন।

সুরেন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে সেদিন থাকতে হলো। বাইরের বারান্দায় বসে সুরেন্দ্রনাথ বললেন—আচ্ছা শরৎ, লিখলে তো অনেক। দেশবাসী তোমায় ঠিক চিনতে পেরেছে ?

—না পারুক, তাতে ক্ষতি নেই।

—তোমার 'পথের দাবী' নিয়ে তো বেশ হৈ-চৈ পড়ে গেছে।

শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ির সম্মুখে গ্রন্থকার

—ছ্যাখো, এই নিয়ে আমি রবিবাবুকে বলি কিছু বলতে। কিন্তু—

শরৎচন্দ্রের কথার মাঝে গ্রামের কয়েকটি যুবক এসে দাঁড়ালো। শরৎচন্দ্র তাদের জিজ্ঞাসা করলেন—কী দরকার ?

যুবকরা বললে—আমরা গ্রামে একটা লাইব্রেরি করবো। আপনার সমস্ত বই আমরা চাই।

শরৎচন্দ্র বললেন—আমার বই নিয়ে কি হবে ? অন্ত সাহিত্যিকদের বই আমি দেব।

যুবকেরা বললে—না, আপনার বই-ই আমরা চাই।

সুরেন্দ্রনাথ এই সময়ে বলে উঠলেন—দাও না শরৎ, ওরা যদি তোমার বই পড়তে ভালবাসে তাতে তোমার আপত্তি কেন ?

শরৎচন্দ্র এবার মত পাল্‌টিয়ে বললেন—আচ্ছা, অন্তদিন এসো, দেব আমার বই।

যুবকরা প্রসন্নচিত্তে চলে গেল।

সুরেন্দ্রনাথ এবার একটু হেসেই বললেন—তোমাকে কারা ঠিক ভালবাসে বুঝলাম, শরৎ।

শরৎচন্দ্র বললেন—ছ্যাখো সুরেন, এই গ্রামে এসে আমার অনেক কাজ হয়েছে। সকাল থেকে রাত অবধি আমাকে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হয়।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন—গ্রামের সেবা করা খুবই ভালো। সেই জন্যই তো তোমার সাহিত্যে গ্রাম্য-জীবনের কত ছবি ফুটিয়ে রেখেছ।

—তাই নাকি সুরেন ?

এমনি কত আত্মীয় কত বন্ধুজন মাঝে মাঝে আসতেন। শরৎচন্দ্রের আতিথেয়তায় তাঁরা মুগ্ধ হয়ে ফিরে যেতেন। নিজের

সংসার বলতে তাঁর কিছুই ছিল না। সংসারের বলতে যারা, তারা হলো প্রকাশচন্দ্রের ছেলেমেয়ে—মুকুলমালা ও অমলকুমার (বাঘা)। এরাই হলো শরৎচন্দ্রের প্রাণ।

মধ্যম ভ্রাতা প্রভাসচন্দ্র (স্বামী বেদানন্দ) বৃন্দাবনধামে রামকৃষ্ণ-মঠের শাখার ভার নিয়ে ছিলেন। বহুদিন পরে দাদার সঙ্গে দেখা করতে এলেন এই সামতাবেড়ের বাড়িতে। এইখানেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শরৎচন্দ্র নিজেই হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসা শুরু করলেন। কিন্তু নিয়তি সহসা প্রভাসচন্দ্রের জীবন গ্রাস করতে উদ্যত হলেন। শরৎচন্দ্র গ্রামের একজন বিজ্ঞ চিকিৎসককে দেখালেন। রোগ 'নিউমোনিয়া'। স্নেহের ভাইটিকে সারিয়ে তুলবার জন্য শরৎচন্দ্র প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু প্রভাসচন্দ্র কয়দিনের মধ্যে ইহলোক ত্যাগ করলেন। কান্নায় বুক ভাসিয়ে শরৎচন্দ্র ভ্রাতার চিতাভস্ম নিয়ে তাঁর বাড়ির ঠিক সম্মুখে সমাধি তৈরি করিয়ে দিলেন (১৯৩০ খ্রীঃ)।

প্রভাসচন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ বেলুড়-মঠে পৌঁছুলে, একজন স্বামীজী শরৎচন্দ্রের কাছে এসে বললেন—স্বামী বেদানন্দের ঠিকমতো সৎকার হয়নি। আমি তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে যেতে চাই বেলুড়-মঠে।

শরৎচন্দ্র স্বামীজীর কথা শুনে অবাক হয়ে বললেন—আপনি তার কে? কিসের জন্য তার চিতাভস্ম দিতে যাব? মনে রাখবেন, সে আমার-ই ভাই।

স্বামীজী তবু বললেন—আমাকে চিতাভস্ম নিয়ে যেতেই হবে। সেখানকার আদেশ।

শরৎচন্দ্র কিছু না ব'লে স্বামীজীকে বিদ্রূপ করবার জন্য তাঁর প্রিয় ছাগলকে ডাক দিলেন—'স্বামীজী', 'স্বামীজী'!

শরৎচন্দ্র এই ছাগলটির নাম দিয়েছিলেন 'স্বামীজী'। সে কাছে এলে, বিদ্রূপের সুরেই বলে উঠলেন—বেলুড়-মঠ থেকে তোমাকে এঁরা নিতে এসেছেন।

তারপরই বেলুড়-মঠের স্বামীজীকে বললেন—আপনার গেরুয়া চাদরখানা খুলে ওকে বেঁধে নিয়ে যান। দলে বেশ মিশে যাবে।

এই কথা শুনে স্বামীজী পালিয়ে যান।

শোক-সন্তপ্ত মন নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান। লোকের উপকার করা—এই হলো তাঁর কাজ। কখনো বা পুকুরে ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বসা। আবার কখনো বা ফুলবাগানে মন মাতিয়ে দেওয়া।

একদিন সাহিত্যিক শৈলেশ বিশী বেড়াতে এলেন। শরৎচন্দ্র বাইরে পায়চারী করছিলেন খড়ম পায়ে—খালি গা, হাতে থেলো-হুঁকো।

তাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন—এসো শৈলেশ, এই বটতলায় বসা যাক্।

শৈলেশ বিশী এতক্ষণ প্রভাসচন্দ্রের সমাধির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন—এটা কি?

—প্রভাসের সমাধি।

তারপর বললেন—এদিকে এসো, তোমাকে আমার বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাই।

তারপর বড় বড় তিনটি পুকুর, বাগান, গোরু—আর 'স্বামিজী' াগলটিকেও দেখালেন।

শৈলেশ বিশী আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন—মেলাই যে দেখছি গাছ লাগিয়েছেন—

শরৎচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন—এসব যে আমার হবে, তা আমি কোনদিন ভাবতেও পারিনি।

এই সময়ে এক গরীব শরৎচন্দ্রের কাছে 'দাদাঠাকুর' ব'লে এসে দাঁড়ালো। শরৎচন্দ্র বুঝতে পারলেন—সে কিছু চায়। তিনি ট্যাঁক থেকে কিছু পয়সা বের করে তার হাতে দিলেন। তারপর শৈলেশ বিশীকে বললেন—বুঝলে শৈলেশ? গ্রামে গরীব সবাই, ওদের কিছু দিতে পারলে আমার মনটা ভরে। গ্রামে স্কুল, রাস্তাঘাট এসব না থাকলে কি গ্রাম বাঁচে? দেখি, কতদূর কি করতে পারি।

এম্‌নি করেই শরৎচন্দ্রের জীবন অতিবাহিত হয়। অনেকদিন কিছুই তিনি লেখেননি। অথচ মাসিকপত্রিকার তাগাদায় আবার তাঁকে কলম ধরতে হলো। লিখলেন 'শেষপ্রশ্ন'। 'ভারতবর্ষে' তা একদিন ধারাবাহিকভাবে আত্মপ্রকাশ করলো। তারপর পুস্তকাকারে ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হলো। শরৎচন্দ্রের উপর আর এক দফা অত্যাচার চললো। কেউ-বা বললো বাড়াবাড়ি, কেউ-বা বললো মূর্খ। তা ছাড়া কাগজে এ নিয়ে অনেক সমালোচনা হলো। এ খবর তাঁর কানে এসে পৌঁছালো।

শরৎচন্দ্র নিজেই সে সম্বন্ধে জনৈকা মহিলার (শ্রীমতী ··· সেন) পত্রের উত্তরে ('বিজলী', ৬ষ্ঠ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা) লিখেছেন—

"হ্যাঁ, 'শেষপ্রশ্ন' নিয়ে আন্দোলনের ঢেউ আমার কানে এসে পৌঁছেছে অন্ততঃ, যেগুলি অতিশয় তীব্র এবং কটু সেগুলি যেননা দৈবাৎ আমার চোখ কান এড়িয়ে যায়, যাঁরা অত্যন্ত শুভানুধ্যায়ী তাঁদের সেদিকে প্রখর দৃষ্টি। লেখাগুলি সযত্নে সংগ্রহ করে লাল, নীল, সবুজ, বেগুনী নানা রঙের পেন্সিলের দাগ দিয়ে

তাঁরা ডাকের মাশুল দিয়ে অত্যন্ত সাবধানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এবং পরে আলাদা চিঠি লিখে খবর নিয়েছেন পৌছল কিনা। তাঁদের আগ্রহ, ক্রোধ ও সমবেদনা হৃদয় স্পর্শ করে।

নিজে তুমি কাগজ পাঠাওনি বটে, কিন্তু তাই বলে রাগও কম করোনি। সমালোচকের চরিত্র, রুচি, এমন কি পারিবারিক জীবনকেও কটাক্ষ করেছো। একবার ভেবেও দেখনি যে, শক্ত কথা বলতে পারাটাই সংসারের শক্ত কাজ নয়। মানুষকে অপমান করায় নিজের মর্যাদাই আহত হয় সবচেয়ে বেশী। জীবনে এ যারা ভোলে তারা একটা বড় কথাই ভুলে থাকে। তা ছাড়া এমন তো হতে পারে 'পথের দাবী' এবং 'শেষপ্রশ্ন' এঁর সত্যই খুব খারাপ লেগেছে। পৃথিবীতে সব বই সকলের জন্য হয়, সকলেরই ভাল লাগবে এবং প্রশংসা করতে হবে এমন তো কোন বাঁধা নিয়ম নেই। তবে, সেই কথাটা প্রকাশ করার ভঙ্গীটা ভাল হয়নি, এ আমি মানি। ভাষা অহেতুক রূঢ় এবং হিংস্র হয়ে উঠেছে, এইটেই তো রচনা-রীতির বড় সাধনা। মনের মধ্যে ক্ষোভ ও উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও যে, ভদ্র ব্যক্তির অসংযত ভাষা প্রয়োগ করা চলে না—এই কথাটাই অনেক দিনে অনেক দুঃখে আয়ত্ত করতে হয়। তোমার চিঠির মধ্যে এ ভুল তুমি তার চেয়েও করছো, এত বড় আত্ম-অবমাননা আর নেই।

ভাবে বোধ হয় তুমি অল্পদিন কলেজ ছেড়েচো। লিখেচো তোমার সঙ্গীদেরও এমনি মনোভাব! যদি হয়, সে দুঃখের কথা। এ লেখা যদি তোমার হাতে পড়ে, তাদের দেখিয়ো। শ্লীলতা মেয়েদের বড় ভূষণ; এ সম্পদ কারো জন্যে, কোন কিছুরই জন্যেই তোমাদের ক্ষোয়ানো চলে না।

জানতে চেয়েছো আমি এসকলের জবাব দিইনে কেন? এর উত্তর—আমার ইচ্ছে করে না, কারণ ও আমার কাজ নয়—আত্মরক্ষার ছলেও মানুষের অসম্মান করা আমার ধাতে পোষায় না। দেখোনা লোকে বলে আমি পতিতাদেরও সমর্থন করি। সমর্থন আমি করিনে, শুধু অপমান করতেই মন চায় না। বলি, তারাও মানুষ, তাদেরও নালিশ জানাবার অধিকার আছে; এবং মহাকালের দরবারে এদেরও বিচারের দাবী একদিন তোলা রইলো। অথচ, সংস্কারের অন্ধতায় লোকে

এ কথা কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু এসব আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত কথা। আর না।…

…উপসংহারে তোমাকে একটা কথা বলি। সমাজ-সংস্কারের কোন দুরভিসন্ধি আমার নেই। তাই, বইয়ের মধ্যে আমার মানুষের দুঃখ-বেদনার বিবরণ আছে, সমস্যাও হয়তো আছে কিন্তু সমাধান নেই। ও কাজ অপরের, আমি শুধু গল্প-লেখক, তা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

চিঠিখানি পড়লেই বেশ বোঝা যায় শরৎচন্দ্র খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। ভাবলেন, তাঁকে চিনবার মতো লোক এদেশে খুবই কম। এবং বুঝতে পারলেন, এ সমস্ত দলাদলির মধ্যে না থাকাই ভালো।

দিনের পর দিন দূরে সরে থাকতে দেখে অনেক গুণগ্রাহী বন্ধুবান্ধব সামতাবেড়েতে গিয়ে ভীড় জমাতে শুরু করলেন। অনেকে অনেক কথাই বোঝালেন, কিন্তু নির্ভীক শরৎচন্দ্র বললেন—এ তো আন্দোলন নয়, লেখকের প্রতি অবিচার করা।

একদিন তাঁর ডাক এলো কানপুরে 'প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন'-এর অধিবেশনে যোগদানের জন্য। নির্ভীক শরৎচন্দ্র এইখানে তাঁর সাহিত্য-বিষয়ক মতামত ব্যক্ত করলেন। দেশবাসী চিনতে পারলো বাংলার অপরাজেয় কথা-শিল্পীকে।

দিনের পর দিন যায়। সামতাবেড়েতেই চলে সাহিত্যের নীরব সাধনা। গ্রামের সেবায় মন মাতিয়ে রূপনারায়ণের কোলে বাঁধের কাজে মন বেঁধে শরৎচন্দ্রের জীবন চলে। আসে 'ছবির মা', আসে তুলসী মাইতি,—এদের কাছে নিয়ে, এদের সুখ-দুঃখের ভাগী হয়ে, এদেরই সাথে গল্পগুজব করে দিন কাটিয়ে দেন। আবার কখনো বা খোল-করতাল-সহযোগে জ্ঞানদাসের প্রিয় পদাবলীটি গান—

"ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে রে কালিয়া,
কে তোরে কুবুদ্ধি দিল—
কে-বা সেধেছিল পিরিতি করিতে
মনে যদি এত ছিল।

ধিক্ ধিক্ বন্ধু, লাজ নাহি বাসো
না জানো লেহের লেশ
এক দেশে এলি অনল জ্বালায়ে
জ্বালাইতে আর দেশ।

অগাধ জলের মকর যেমন
সে না জানে মিঠে কি তিঁতো
সুরস পায়েস চিনি পরিহরি
চিটাতে আসক্ত এতো।

জ্ঞানদাসে কয় মনের বেদনে
কহিতে পরাণ ফাটে।
সোনার প্রতিমা ধুলায় লোটায়
কুব্জা বসিল খাটে॥"

এই সময়ে 'শ্রীকান্ত, চতুর্থ পর্ব' প্রকাশিত হলো।

আবার উঠলো পাঠক-চিত্তে নানা কৌতূহল। এ খবরও এসে তাঁর কানে পৌঁছাল একদিন। নির্ভীক শরৎচন্দ্র মনে মনে হাসলেন।

'শ্রীকান্ত' সম্পর্কে জনৈকা প্রবাসী মহিলা-সাহিত্যিক লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রকে পত্র লিখে জানতে চাইলেন—'রাজলক্ষ্মী' কে? কোথায় তাকে পাওয়া যাবে?

শরৎচন্দ্র তার উত্তরে জানান—"রাজলক্ষ্মী কে? কোথায় পাবে? ওসব বানানো মিছে গল্প। 'শ্রীকান্ত' একটা উপন্যাস বই তো নয়।

ওসব মিছে জনরবে কান দিতে নেই। কাহিনীটি কি সত্যি? কার কাহিনী? তুমি বেঁচে থাকো, দীর্ঘজীবী হও, মানুষ হও—বার বার এই আশীর্বাদ করি। ...”

এত আঘাত সয়ে, মানুষের কথার উত্তর দিয়ে, নিজের লেখা নিজেই বিচার করে দেখতেন—নালিশ যারা করে তাদের কথা সত্যি কিনা। শরৎচন্দ্র অপরের লেখাও পড়তেন। সে লেখা শোনাতেন স্ত্রীকে। জলধর সেনের ‘অভাগী’ গল্পটি হিরণ্ময়ী দেবীকে পড়িয়ে শোনালে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন; বলেন—তুমি কী ছাইপাঁশ লেখো! এমন কিছু লিখতে পার না?

শরৎচন্দ্রও জবাব না দিয়ে হেসেছিলেন শুধু।

এই সামতাবেড়ের বাড়িতে হিরণ্ময়ী দেবী অসুস্থ হয়ে পড়েন একবার। গ্রামের দুর্গা নামে এক বালবিধবাকে রাখলেন তাঁর সেবা-শুশ্রূষার জন্যে। শরৎচন্দ্রের নানা কাজ—গ্রামে ছেলেমেয়েদের ইস্কুল নিত্য পরিদর্শন করা, গরীবদের অভাব-অভিযোগ মেটানো প্রভৃতি। অবসর-বিনোদনের জন্য রাখলেন রেডিও। গ্রামের লোকজন এসে সবাই শুনতো। অজ্ঞ লোকেরা বলতো—দাদাঠাকুরের বাড়ির ‘হাওয়ার গান’ ভারি মিষ্টি। এদিকে হিরণ্ময়ী দেবীর অসুখ ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগলো। শরৎচন্দ্র ডাক্তার দেখালেন। নিজের হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসায় আর কুলালো না। ডাক্তার বললেন—ডবল নিউমোনিয়া। শরৎচন্দ্র ভয় পেলেন। না জানি আবার কি হয়! এই সময়ে শরৎচন্দ্রকে পাগলের মতো বলতে শোনা গিয়েছিল—আমি আছি, বড়বৌ নেই—এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি-না।

শরৎচন্দ্র আত্মীয়-স্বজনের চাইতে যাঁকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখতেন, তিনি হলেন বেহালার জমিদার মণীন্দ্রনাথ রায়। তাঁকে চিঠি

লিখলেন—"মণি, বড়বৌ-এর খুব অসুখ। এ যাত্রায় বাঁচবেন কিনা জানি না। যদি পার তো একবার এসো।"

মণীন্দ্রনাথ রায় এলেন সামতাবেড়েতে। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। শরৎচন্দ্র একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে চোখ বুজে আছেন—হাতে নলচে, ধূমপানের যেন ইচ্ছা নেই। দূরে মিটমিট করে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। নিঃশব্দে মণীন্দ্রনাথ কাছে এসে দাঁড়ালেন। পায়ের ধুলো নিতেই শরৎচন্দ্র সম্বিৎ ফিরে পেলেন। —মণি, তুমি আজ যে আসবে, তোমার চিঠি পেয়ে বুঝতে পেরেছি। বড়বৌ-এর খুব বাড়াবাড়ি অসুখ —ডবল নিউমোনিয়া। বোধকরি এবার তাঁকে ধরে রাখতে পারবো না। বুকে পিঠে সর্দি বসে গেছে, জ্বরও খুব বেশী। অচৈতন্য অবস্থাতেই রয়েছেন। এখানকার ডাক্তার দেখছেন।— বলতে বলতে শরৎচন্দ্রের চক্ষুদুটি জলে ভিজে এলো। তারপর বললেন—সবসময়ে প্রার্থনা জানাই, উনি আমার আগেই যেন যান। কারণ, আমি আগে চলে গেলে, বড়বৌ একদিনও বাঁচতে পারবেন না। এ আমি খুব ভালো করেই জানি, মণি!

তারপর মণীন্দ্রনাথ রায়কে নিয়ে শরৎচন্দ্র উপরের ঘরে চলে এলেন।

বড় একখানি তক্তপোশের উপর অচৈতন্য অবস্থায় হিরণ্ময়ী দেবী শুয়ে আছেন। পাশে দুর্গা হাতপাখায় বাতাস করছে।

শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীর মাথার কাছে নীচু হ'য়ে বললেন—বড়বৌ, মণি এসেছে।

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। তারপর কপালে হাত দিয়ে বললেন—এখনো জ্বর ভোগ হচ্ছে।— দুর্গাকে বললেন—দুর্গা, কতক্ষণ আগে জ্বর দেখেছো? ওষুধ ক'বার খাওয়ানো হলো?

দুর্গার কাছে সব জেনেশুনে নিয়ে, মণীন্দ্রনাথকে সঙ্গে ক'রে শরৎচন্দ্র নীচে নেমে এলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই হিরণ্ময়ী দেবী সুস্থ হয়ে উঠলেন। এবার তিনি নিজের জন্য ঠিক নয়, স্বামীর জন্যেই বলেছিলেন—ছাখো, তুমি কাজের মানুষ, গাঁয়ে থেকে বাইরে যাওয়া-আসায় তোমার কষ্ট হয়। তুমি কোলকাতায় একটা বাড়ি করো।

শরৎচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে, বড়বৌ।

যেমন কথা তেমনি কাজ। বাড়ির জন্য জায়গা পছন্দ করতে ইমপ্রুভমেণ্ট-ট্রাস্টের শরণাপন্ন হলেন। বালিগঞ্জের মনোহরপুকুর রোডে (বর্তমানে অশ্বিনী দত্ত রোড) ইমপ্রুভমেণ্ট-ট্রাস্টের কাছ থেকে ইনস্টলমেণ্টে জায়গাও ক্রয় করলেন। পরে ১৯৩৪ সালে শরৎচন্দ্র বাড়ি তৈরি করান। এই বাড়ি-তৈরির কাজে সহায়তা করেন মণীন্দ্রনাথ রায় ও হরেন্দ্রলাল ঘোষ মহাশয়। এই বাড়ি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শরৎচন্দ্র বাজে-শিবপুরের অপরূপ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে থাকতেন। এখান থেকেই তিনি বাড়ি-তৈরির কাজকর্ম তদারক করতে যেতেন।

এই সময়ে তাঁর উপন্যাস 'অনুরাধা, সতী ও পরেশ' প্রকাশিত হয়। এই ১৯৩৪ সালেই 'বিজয়া' নাটক প্রকাশিত হলো। এই সময়েই বাংলার এই শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পীর একপঞ্চাশৎ জন্ম-জয়ন্তী পালনের আয়োজন করলেন শিবপুরের সাহিত্য-সংসদ। সংসদের উদ্যোগী সভ্যবৃন্দ হলেন—কবি সুবোধ রায়, কবি জগবন্ধু মিত্র, শিক্ষাবিদ্ সন্ন্যাসী সাধুখাঁ, সাহিত্য-রসিক প্রবোধলাল মুখোপাধ্যায় ও অপরূপ চট্টোপাধ্যায়। কার্যকরী সমিতির সম্পাদক
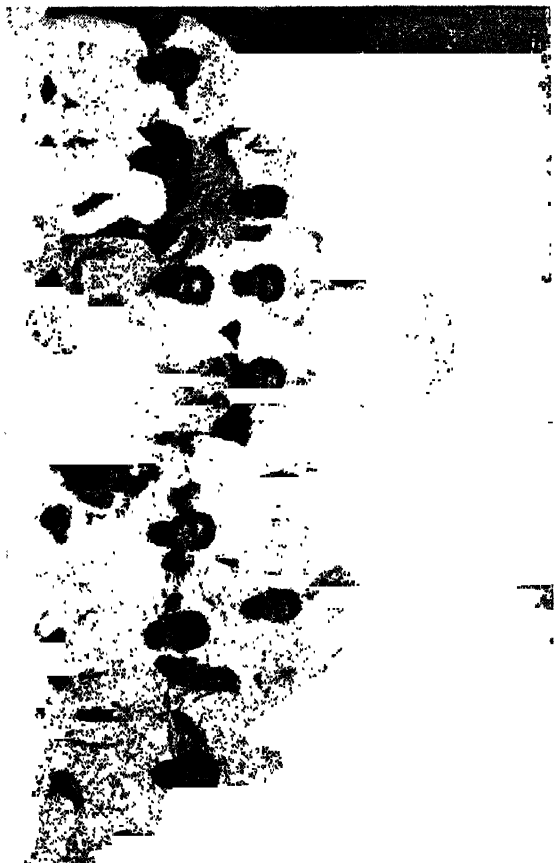
প্রথম শরৎ-সম্বর্ধনা

['শিল্পী-সংস্থা'র সৌজন্যে

অধ্যক্ষ ধ্রুবকুমার পাল, অনুরূপ চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধলাল মুখোপাধ্যায়, গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায়, সন্ন্যাসী সাধুর্খাঁ, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, সুবোধ রায়, মধ্যে মাল্যভূষিত শরৎচন্দ্র

হলেন সুবোধ রায়। এঁরা স্থির করলেন, এ অনুষ্ঠানে শুধু যে হাওড়াবাসী ও শরৎ-অনুরাগী দলই অংশগ্রহণ করবেন তা নয়, সারা বাংলার সারস্বত-সমাজকে নিমন্ত্রণ জানাতে হবে।

যেমন সঙ্কল্প তেমনি কাজ। ১৯৩৪ সালের ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের একপঞ্চাশৎ জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হলো গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। বাংলার খ্যাত-অখ্যাত সাহিত্য-সেবক ও অনুরাগীর দল প্রশস্তি পাঠ করলেন, শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলেন দরদী কথা-শিল্পীকে। 'উপহার' নামক বত্রিশপৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা সভাক্ষেত্রে বিতরিত হলো। এই পুস্তিকায় প্রশস্তি উচ্চারণ করেছেন—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। প্রবন্ধ, কবিতা ও কথিকায় যাঁরা শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, তাঁরা হলেন—যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, মোহিতলাল মজুমদার, রাধারাণী দত্ত (দেবী), সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, গিরিজাকুমার বসু, জগদীশ গুপ্ত, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, হেমচন্দ্র বাগচী, সুধীরচন্দ্র রায়, সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ন্যাসী সাধুখাঁ, জগবন্ধু মিত্র ও সুবোধ রায়।

শিবপুরে অনুষ্ঠিত শরৎচন্দ্রের এই জন্মতিথি এবং শিবপুরের সাহিত্য-সংসদ-প্রবর্তিত অনুষ্ঠানটিকে অনুসরণ করেই শরৎ-জন্ম-জয়ন্তী বাঙালী আজও পালন করে আসছে।

বাজে-শিবপুরে কিছুদিন অবস্থান করে শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ের বাড়িতে ফিরে যাবার সময় সরস্বতী লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা 'বেণু'তে লিখবার জন্য অনুরোধ করতে এলেন 'বেণু'র সম্পাদক। শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভালো ছিল না। তিনি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন ভবিষ্যতে তাঁর কাগজে লেখা দেবেন।

সামতাবেড়েতে ফিরে এসে শরৎচন্দ্র আবার পল্লী-উন্নয়নে মন

দিলেন। ওদিকে তাঁর কোলকাতার গৃহনির্মাণও প্রায় শেষ হয়ে এলো। দেখাশুনা করতে মাঝে মাঝে ছোটভাই প্রকাশচন্দ্রকে পাঠাতেন ; নিজেও যেতেন। শরৎচন্দ্র কোলকাতায় এলে বেহালার জমিদার মণীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের বাড়িতে অতিথি হয়ে থাকতেন।

সামতাবেড়ের বাড়িতে বাজে-শিবপুরের প্রতুল মুখোপাধ্যায় মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। শরৎচন্দ্র এই সুদর্শন ও শিক্ষিত যুবকটির সঙ্গে বালবিধবা দুর্গার বিবাহের প্রস্তাব করলেন। কিছুদিন পরে দুর্গাকে নিয়ে যুবকটি লক্ষ্ণৌ চলে যায়।

ভাগ্যচক্রে হঠাৎ একদিন সেই যুবকটির সঙ্গে দেখা। শরৎচন্দ্র কোলকাতায় আসবেন বলে মণীন্দ্রনাথ রায়কে একখানা চিঠি লেখায়, তিনি ঠিক সময়েই হাওড়া স্টেশনে গাড়ি নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। শরৎচন্দ্র ট্রেন থেকে নেমে মণীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে প্লাটফরম পার হচ্ছিলেন, এমন সময় দুর্গার সেই ভাবী বর দৌড়ে এসে শরৎচন্দ্রের পদধূলি নিল। একটু আড়ালে ডেকে শরৎচন্দ্র যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—দুর্গার বিবাহ হয়ে গেছে ?

যুবকটি বললে—তাকে আমি লক্ষ্ণৌ পাঠিয়ে দিয়েছি। সেখানের পুরুতরা বিধবা-বিবাহ দেবেন না। তাই কালীঘাটে পুরুত জোগাড় করতে এসেছিলাম। সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যাচ্ছি।

শরৎচন্দ্র যুবকটিকে আশীর্বাদ করলেন। যুবকটি বিদায় নিলে মণীন্দ্রনাথ রায় জিজ্ঞাসা করলেন—দাদা, ঐ ছেলেটি কে ?

শরৎচন্দ্র হেসে বললেন—ওহে মণি, ছেলেটি লক্ষ্ণৌতে ভালো চাকরি করে। তুমি তো আমার বাড়িতে দুর্গাকে দেখেছো, তারই সঙ্গে ঐ ছেলেটির বিবাহের প্রস্তাব করেছিলাম। দুর্গা লক্ষ্ণৌ গেছে,

কিন্তু যেমন করে হোক সেখানে একটু কানাঘুষা হচ্ছে। ওখানকার পুরুতেরা বিবাহ দেবেন না। তাই ছেলেটি কালীঘাটে মোটা দক্ষিণা কবুল করে একজন পুরুত জোগাড় করেছে। আজই তিনি ওর সঙ্গে লক্ষ্ণৌ যাচ্ছেন।

কলকাতায় কিছুদিন অবস্থান করে শরৎচন্দ্র সামতাবেড়েতে ফিরে যাবার সময় হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দোকানে এলেন। বহুদিন পরে তাঁর এই আগমনে সবাই আনন্দচিত্তে তাঁকে সম্ভাষণ জানালেন। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ভাগলপুরে ওকালতি ত্যাগ ক'রে কোলকাতায় 'বিচিত্রা' নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেছেন, এ খবরও তিনি এখানে পেলেন। শরৎচন্দ্র এখান থেকেই 'বিচিত্রা' আপিসে ফোন করলেন উপেন্দ্রনাথকে।

উপেন্দ্রনাথ বললেন—তুমি ফোন করছো কোথা থেকে, শরৎ ?

—হরিদাসবাবুর বই-এর দোকান থেকে।

—তুমি আমার 'বিচিত্রা' আপিসে এসো।

—তোমার আপিসটা ঠিক কোথায় ?

—শ্যামবাজারে, ফড়িয়াপুকুরে।

শরৎচন্দ্র 'বিচিত্রা' আপিসে এলেন। উপেন্দ্রনাথের এক কথা—লেখা চাই। নবীন 'বিচিত্রা'র মেরুদণ্ড যেননা ভেঙে যায়।

শরৎচন্দ্র বললেন—বেশ, তোমায় লেখা আমি পাঠিয়ে দেবো যদি সুস্থ থাকি।

সামতাবেড়েতে গিয়ে শরৎচন্দ্র লিখতে শুরু করলেন 'বিপ্রদাস'। লেখার জন্য উপেন্দ্রনাথের ঘন ঘন চিঠি আসতে লাগলো। শরৎচন্দ্র

সঙ্গে সঙ্গেই জানাতেন—"তোমার চিঠি পেয়ে যৎপরোনাস্তি খুশী হয়েছি। এক সংখ্যার মতো হলেই লেখা পাঠিয়ে দেব।—ইতি শরৎ"

শরৎচন্দ্র যখন আপ্‌না থেকে লেখা পাঠালেন না, উপেন্দ্রনাথকে বাধ্য হয়েই সামতাবেড়ের বাড়িতে আসতে হলো।

বাইরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে তখন শরৎচন্দ্র একখানি বই পড়ছিলেন। বারান্দার সম্মুখে উপেন্দ্রনাথ উপস্থিত হতেই, শরৎচন্দ্র বই থেকে মুখ সরিয়ে ক্ষণিক তাকিয়েই আবার বই পড়তে শুরু করলেন। উপেন্দ্রনাথ একটা বেতের চেয়ারে বিমর্ষ হয়ে বসে বললেন—কেমন আছ, শরৎ ?

—এই—আছি—

—আছ তো, তা স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি। কেমন আছ তাই জিজ্ঞাসা করছি।

শরৎচন্দ্র কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললেন—ভাগলপুর থেকে কবে এলে ?

—চার-পাঁচদিন। কিন্তু আমার চিঠির উত্তর দিলেনা কেন ?

—কি আবার উত্তর দেব বল ?

—সেকি ! মানুষ তো চিঠির উত্তর দেয়—

শরৎচন্দ্র ক্ষুব্ধচিত্তে বললেন—সেই কয়লাওয়ালার ছেলের কাগজে আমাকে উপন্যাস লিখতে হবে ?

উপেন্দ্রনাথ বললেন—কয়লাওয়ালা কে ? যোগীন মুখুজ্যে ?

—তা নয় তো কে ?

—কয়লাওয়ালার ছেলে আমার জামাই হয় জানো ?

—তা জানি আর নাই জানি, আমি ওদের কাগজে লেখা দেব না।

উপেন্দ্রনাথ অপমান বোধ করে উঠে দাঁড়ালেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—কোথায় যাচ্ছো?

—বাড়ি।

শরৎচন্দ্র বললেন—বাড়ি মানে?

—বাড়ি মানে, কোলকাতার শ্যামবাজারের বাড়ি।

—খাওয়া-দাওয়া করে যাবে না?

—এই কেতাবওয়ালার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করতে বলছো আমায়?

—তুমি রাগ করে যাচ্ছো, উপীন।

—তা হয়তো করছি, কিন্তু অকারণে করছিনে।

বাড়ির কম্পাউণ্ড ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন উপেন্দ্রনাথ।

শরৎচন্দ্র বললেন—অন্যায় করে যাচ্ছো, উপীন।

—অন্যায় করে যাচ্ছি না, অন্যায় পেয়ে যাচ্ছি। সে বিচার ভবিষ্যতে একদিন হতে পারে হয়তো।

শরৎচন্দ্র বললেন—তাহলে ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে বসে থাকা যাক্।

উপেন্দ্রনাথ চলে গেলেন কোলকাতায়।

'বিচিত্রা' পত্রিকার মালিক যোগীন মুখুজ্যের সঙ্গে বিবাদ থাকায় শরৎচন্দ্র তখনকার মতো লেখা পাঠাননি। 'বিপ্রদাস' প্রথমে 'বেণু'তে প্রকাশিত হতে থাকে; 'বেণু' বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুন শরৎচন্দ্র 'বিপ্রদাস' 'বিচিত্রা'য় প্রকাশ করবার অনুমতি দেন।

'বিপ্রদাস' পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হলো (১৯৩৫ খ্রীঃ)।

এদিকে তাঁর কোলকাতার বাড়িটির নির্মাণ-কার্যও সম্পূর্ণ হয়ে এলো।

স্বাস্থ্য ভালো না থাকায় তিনি কোনো সভা-সমিতিতে যোগদান করতে পারতেন না। অনেকেই এর জন্য বিরূপ হতেন। এদিকে তাঁর ৫৭তম জন্মতিথি উপলক্ষে টাউন-হলে বিরাট সম্বর্ধনার আয়োজন করা হলো। দেশবাসীর ডাকে শরৎচন্দ্রকে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে হলো।

এই উপলক্ষে মহিলারা একখানি পৃথক অভিনন্দন-পত্রে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করলেন ঃ

"পরাধীন বাংলার অধঃপতিত সমাজের অসহায়া অন্তঃপুরচারিণীদের অন্তরের মূক আনন্দ-বেদনাকে তুমি ভাষায় মূর্ত করিয়া ধরিয়াছ। তাহাদের দুর্গত জীবনের সকল সুখ-দুঃখের অনুভূতিগুলিকে নিবিড় সহানুভূতির পরম রসরাগে সাহিত্যে বাস্তবরূপে সত্য করিয়া তুলিয়াছ। তোমার অনাবিষ্ট দৃষ্টি, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা, সুগভীর উপলব্ধি-শক্তি, বিচিত্র মানবচরিত্রের অতুল অভিজ্ঞতা—নিখিল নারী-চিত্তের নিগূঢ় প্রকৃতির গোপনতম সন্ধান লাভ করিয়াছে। হে নারীচরিত্রের নিবিড়-রহস্য-জ্ঞাতা! আমরা তোমার বন্দনা করি।

... আজিকার এই বিশেষদিনে তোমাকে আমরা কেবল এই কথাই জানাইতে আসিয়াছি—তোমার প্রতিভাকে আমরা বরণ করি। তোমাকে আমরা শ্রদ্ধা করি। তোমাকে আমরা ভালবাসি। তোমাকে আমরা আমাদের একান্ত আপনজন বলিয়াই জানি। হে নারীর পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু! আমরা তোমায় বন্দনা করি। ..."

তার উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন—

"সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলেনা কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসেব নিলে না। নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলেনা সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই—এদের বেদনা দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালো আমাকে মানুষে কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখো

'নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও'-র কর্মীবৃন্দসহ শরৎচন্দ্র

কুবিচার, কত দেখেছি নির্বিচারে দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদের নিয়ে। সংসারে সৌন্দর্য-সম্পদে ভরা বসন্ত আসে জানি, আনে শঙ্খে তার কোকিলের গান, আনে প্রস্ফুটিত মল্লিকা-মালতী, জাতি-যূথী, আনে গন্ধব্যাকুল দখিনা-পবন; কিন্তু যে আবেষ্টনে দৃষ্টি আমার আবদ্ধ রয়ে গেলো, তার ভিতরে ওরা দেখা দিল না। ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটলো না। সে দারিদ্র্য আমার লেখার মধ্যে চাইলেই চোখে পড়ে। কিন্তু অন্তরে যাকে পাইনি, শ্রুতিমধুর শব্দরাশির অর্থহীন মালা গেঁথে তাকেই পেয়েছি বলে প্রকাশ করার ধৃষ্টতা আমি করিনি। এমনি আরও অনেক কিছুই—এ জীবনে যাদের তত্ত্ব খুঁজে মেলেনি, স্পর্ধিত অবিনয়ে মর্যাদা তাদের ক্ষুণ্ণ করার অপরাধও আমার নেই। তাই সাহিত্য-সাধনার বিষয়বস্তু ও বক্তব্যও আমার ব্যাপক নয়, তারা সংকীর্ণ স্বল্প-পরিসর-বদ্ধ; তবু এটুকু দাবী করি, অসত্যে অনুরঞ্জিত করে তাদের আজও আমি সত্যভ্রষ্ট করিনি।"

এদিকে নূতন শাসনতন্ত্রে বাংলার হিন্দুদের উপর যে অবিচার করা হয়েছে, শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি তার উপর পড়লো। কোলকাতা টাউন-হলে ১৫ই জুলাই, ১৯৩৬ সালে রবীন্দ্রনাথকে পুরোধা ক'রে শরৎচন্দ্র ঘোষণা করলেন—

"... রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ধর্মবিশ্বাসই কি হয়ে দাঁড়ালো সকলের বড়? আর মানুষ হল ছোট? যে ব্যবস্থা জগতের কোথাও নেই, কোথাও কল্যাণ হয়নি, এই দুর্ভাগা দেশে তাই কি হল—special and peculiar circumstances? আর সে কেউ বোঝে না—নাবালকের trusteeরা ছাড়া? ... নূতন শাসন-ব্যবস্থার আগাগোড়াই মন্দ। সেই অপরিসীম মন্দের মধ্যেও বাংলার হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হল সবচেয়ে বেশী। আইনের পেরেক ঠুকে তাদের ছোট করা হল চিরদিনের মতো! ... তাঁদের বলতে চাই,—অন্যায়, অবিচার—একজনের প্রতি হলেও সে অকল্যাণময়। তাতে শেষ পর্যন্ত না মুসলমানের, না হিন্দুর, না জন্মভূমির—কাহারও মঙ্গল হয় না।"

নির্ভীক শরৎচন্দ্রের সেদিনকার বক্তৃতা শুনে সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

এই ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে ডি.লিট. উপাধিতে ভূষিত করবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। শরৎচন্দ্র সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

ঢাকা-যাত্রার সময়ে শরৎচন্দ্রের সাথী হলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সামতাবেড়ের বাড়ির চাকর—সীতারাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডি.লিট. উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করলেন। এই সম্বর্ধনা-সভায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, যদুনাথ সরকার প্রভৃতি বহু গুণমুগ্ধ ব্যক্তি যোগদান করেন।

এই উপলক্ষে কবি মোহিতলাল মজুমদারের সহিত তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি মোহিতলালকে নিজের জীবনের বহু ঘটনার কথা বলেন।

এই সময়ে অসুস্থ হয়ে কয়েকদিন শরৎচন্দ্র ঢাকায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে অবস্থান করেন, এবং পীড়িত অবস্থাতেই কোলকাতায় ফিরে আসেন।

কোলকাতার বাড়িতে অবস্থানের সময় 'বাতায়ন' পত্রিকার সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল শরৎচন্দ্রকে একদিন বললেন—শরৎদা, এবার একটা মোটরগাড়ি কিনুন।

শরৎচন্দ্র হেসে বললেন—মোটরগাড়ি না কেনাই ভালো।

—সেকি দাদা! আমি ছাড়ছিনে, মোটর আপনাকে কিনতেই হবে।

শেষে একরূপ জোর করেই অবিনাশবাবু একখানি 'মরিস্'

গাড়ি কিনিয়ে দিলেন। আর গাড়ির ড্রাইভার হলো—কালী। অবিনাশবাবুর জানাশুনা একটি লোক।

নূতন গাড়িতে করে শরৎচন্দ্র অমল ও মুকুলমালাকে সঙ্গে নিয়ে সারা কোলকাতায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সন্ধ্যাবেলায় কখনো কখনো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তাঁর নূতন বাসভবনের বাইরের ঘরে বসে অধিক রাত পর্যন্ত গল্পগুজবে কাটিয়ে দিতেন, কখনও বা কবি নরেন্দ্র দেবের বাসভবনে গিয়ে তিনি গল্পগুজব করতেন। শরৎচন্দ্রকে খুব কাছে পেয়ে সাহিত্য-সভার আয়োজন চলতে লাগলো। এই সাহিত্য-সভার আয়োজন হতো কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ের বাসভবনে। 'রসচক্র' এই সভার নাম। শরৎচন্দ্র যুক্তি-তর্ক দিয়ে এখানে অনেক নতুন কথা শোনাতেন।

পরে এখান থেকে 'রসচক্র' নামে একটি বারোয়ারী উপন্যাস প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্রকে দিয়েই উপন্যাসটির লেখা শুরু হয়।

আত্মীয়-স্বজনের ভীড় কোলকাতার বাড়িতে প্রায়ই লেগে থাকতো। মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও মাঝে মাঝে আসতেন।

এই নূতন বাড়ির একটি ঘটনার কথা।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। শরৎচন্দ্র সাহিত্যিক অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে গল্প করছিলেন, এমন সময় এক সুন্দরী তরুণী এসে বললেন—আমি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।

শরৎচন্দ্র নিজের পরিচয় না দিয়ে বললেন—কেন, কী দরকার তাঁর সঙ্গে ?

তরুণীর হাতে একটি খাতা। খাতাটি দেখিয়ে বললে—আমি অটোগ্রাফ নিতে এসেছি।

শরৎচন্দ্র বললেন—অটোগ্রাফ নিয়ে কি হবে ?

তরুণীটি একটু রেগেই বললে—সে-কথা আপনার জেনে লাভ কি? দয়া করে তাঁকে একবার ডেকে দিন।

শরৎচন্দ্র নিজের পরিচয় দিলে, মেয়েটি তাঁর পদধূলি নিয়ে হাসিমুখে বললে—ও আপনি! কী সৌভাগ্য আমার—আপনার সঙ্গে বাক্যালাপ করতে পেরেছি।

শরৎচন্দ্র মৃদু হেসে নিজের পকেট-ওয়াচ খুলে দেখলেন রাত্রি আটটা। বললেন—কোথায় থাক তুমি?

মেয়েটি বললে—এই কাছেই। আমি একাই যেতে পারবো।

শরৎচন্দ্র বললেন—না, তা হয় না।

ড্রাইভার কালীকে গাড়ি বের করতে বললেন। তারপর মেয়েটিকে নিজের গাড়ি করে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এলেন। বললেন—একা বেরুনো ভালো নয়, বুঝলে?

মেয়েটি মৃদু হেসে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলো।

শরৎচন্দ্র কোলকাতার বাড়িটির দেখাশুনার ভার দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ওপর। তাঁর ডাক নাম ছিল 'হোঁদল'। শরৎচন্দ্রের বড়দিদি অনিলা দেবীর পুত্রসন্তান ছিল না, তাঁর মেজো-দেওরের ছেলে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্র খুবই ভালবাসতেন। ইনি শরৎচন্দ্রের কোলকাতার বাড়িতে থেকে হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স আপিসে কাজ করতেন। শরৎচন্দ্রকে তিনি মামা বলেই ডাকতেন। তা ছাড়া মুকুলমালা ও অমলকে পড়াবার (প্রকাশচন্দ্রের পুত্র ও কন্যা) ভার শরৎচন্দ্র এঁকে দিয়েছিলেন। সামতাবেড়ের বাড়িতে যেমন পড়াতেন, কোলকাতার বাড়িতেও তেমনি তাদের পড়াতে হতো।

শরৎচন্দ্রের সর্বশেষ রচনা বারোয়ারী উপন্যাস—'ভালোমন্দ' পুস্তকের সূচনার কিয়দংশ (অপ্রকাশিত)

এইসময়ে 'ভালোমন্দ' নামে বারোয়ারী উপন্যাসের সূচনাটুকু লেখেন। 'বাতায়ন'-সম্পাদক অবিনাশ ঘোষালের অনুরোধে শরৎচন্দ্র 'বাতায়নে' তা প্রকাশ করবার অনুমতি দেন। তার জন্য বন্ধুর কাছ থেকে শরৎচন্দ্র একপয়সায়ও গ্রহণ করলেন না। 'শুভদা' নামে একখানি উপন্যাসও তাঁর প্রকাশিত হলো। এই 'শুভদা' উপন্যাসটি শরৎচন্দ্রের বহু পূর্বেকার রচনা। খঞ্জরপুরে যখন থাকতেন তখন তিনি বইটি লিখেছিলেন। শোনা যায়, 'শুভদা' অনেকে প্রকাশ করতে চাইলেও, শরৎচন্দ্র রাজী হননি। দেবানন্দপুরের ছেলেবেলার বন্ধু সদানন্দর জীবনের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করেই এই উপন্যাসটি লেখা হয়েছিল। তাঁর এবং গ্রামের অন্যান্য ব্যক্তিদের, যাঁদের জীবন তিনি এই উপন্যাসটিতে চিত্রিত করেন, তাঁদের পরলোকগমনের পরই 'শুভদা' প্রকাশ করবার অনুমতি শরৎচন্দ্র দেন।

১৯৩৭ সালের গোড়া থেকে শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকলো। ভাবলেন সামতাবেড়ের বাড়িতে ফিরে যাওয়াই ভালো। এদিকে কোলকাতা বেতার-কেন্দ্র তাঁর জন্ম-বার্ষিকী পালন করবেন। শরৎচন্দ্রকে সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে হলো। বেতার-ভবনে যাবার সময় সাহিত্যিক-বন্ধু অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, কোলকাতা গভর্নমেণ্ট আর্ট-কলেজের অধ্যক্ষ মুকুল দে-কে সঙ্গে নিয়ে শরৎচন্দ্র গেলেন বেতার-কেন্দ্রে। এখানকার অনুষ্ঠানটির নাম ছিল 'শরৎ-শর্বরী'। এই সময়ে নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় 'বেতার জগৎ' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ছিলেন ইন্‌স্পেক্টার। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল। সাদর অভ্যর্থনা তাঁরা জানালেন। এইখানে শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য-সাধনার কথা খুব মর্মস্পর্শী ভাষায় বললেন—

"নিজের সাহিত্য-সাধনার ব্যাপার নিয়ে নিজের মুখে কিছু বলা যায় না। শুধু এইটুকু ইঙ্গিতে বলতে পারি যে, অনেক দুঃখের মধ্যে দিয়ে এই সাধনায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছি। যা লিখেছি তাও সঙ্কোচে দ্বিধায় পরের নামে। তার কোন মূল্য আছে কিনা ভাবতে পারিনি। তারপর দীর্ঘকাল, বোধ হয় ১৫।১৬ বৎসর, সাহিত্য-চর্চার ধার দিয়েও যাইনি। তারপর নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে আবার এই জীবন। আমি আপনাদের মাঝে বেশীদিন থাকি বা না-থাকি, আমার এ কথাটা হয়তো আপনাদের মাঝে মাঝে মনে পড়বে যে, দুঃখের মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্য-সাধনা ধীরে ধীরে বাধা ঠেলে উঠেছিল। ..."

রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের এই জন্মতিথিতে শুভেচ্ছা ও বাণী পাঠালেন—

"এখনো তুমি দেশকে প্রতিদিন নব নব রচনা-বিস্ময়ে নব নব আনন্দ দান করবে এবং সেই উল্লাসে দেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ তোমার জয়ধ্বনি করতে থাকবে। পথে পথে তুমি পাবে প্রীতি, তুমি পাবে সমাদর। পথের দুই পাশে যে-সব নবীন ফুল ঋতুতে ঋতুতে ফুটে উঠবে তারা তোমার; অবশেষে দিনের পশ্চিম কালে সর্বজনহস্তে রচিত হবে তোমার মুকুটের জন্য শেষ বরমাল্য। সেদিন বহুদূরে থাক! আজ দেশের লোক তোমার পথের সঙ্গী, দিনে দিনে তারা তোমার কাছ থেকে পাথেয় দাবী করবে, তাদের সেই চিরন্তন প্রত্যাশা পূর্ণ করতে থাকো, পথের চরমপ্রান্তবর্তী আমি সেই কামনা করি। জনসাধারণ সম্মানের যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, তার মধ্যে সমাপ্তির শান্তিবচন থাকে, তোমার পক্ষে সেটা সঙ্গত নয় এ কথা নিশ্চিত মনে রেখো।

তোমার জন্মদিন উপলক্ষে 'কালের যাত্রা' নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি আমার এ দান তোমার অযোগ্য হয়নি। কালের রথযাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর সার্থক হোক এই আশীর্বাদ সহ তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করি।"

কোলকাতার বাড়িতে শরৎচন্দ্রের বেশীদিন থাকা সম্ভব হলো না।

ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুন তাঁকে ফিরে আসতে হলো সামতাবেড়েতে। এখানকার আবহাওয়ায় কিছুদিনের মধ্যে তিনি একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন। পূর্বেকার মতো গ্রামের সেবায় মন দিলেন। পূজা-আহ্নিকও নিয়মিত করতে লাগলেন। কখনো বা মাছ-ধরার বাতিকে পুকুরে ছিপ নিয়ে বসে থাকতেন। অবসর-বিনোদনের জন্য রেডিও-শোনা, বই-পড়া—এমনি করেই শরৎচন্দ্রের দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগলো। কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্র এই সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শরৎচন্দ্র নিজের দিকটা না ভেবে প্রকাশের স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তাঁকে চেঞ্জে পাঠিয়ে দিলেন।

এই সময়ে কোলকাতায় কোনো এক কাজে আসতে, সামতাবেড়ে থেকে মাঠ ভেঙে ক্রোশ-কয়েক পথ হেঁটে দেউলটিতে ট্রেন ধরতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের সর্দিগর্মি হয়। তিনি কোলকাতা না গিয়ে, হেঁটে বাড়িতে ফিরে আসেন। এর পর থেকে তিনি অসহ্য মাথার-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লেন। হিরণ্ময়ী দেবী ডাক্তার দেখাতে বললেন। শরৎচন্দ্র হেসে বললেন—ও আপ্‌না থেকে সেরে যাবে।

কিন্তু তা হলো না, জ্বর দেখা দিলো। অবশেষে চিকিৎসা করালেন। ডাক্তার বললে—ম্যালেরিয়া। জ্বর কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছাড়লো না। অনেকে পরামর্শ দিলেন চেঞ্জে যেতে। খবর পেয়ে সম্পর্কীয় মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এলেন। সব শুনে তিনি বললেন—চেঞ্জে যাও, শরৎ।

শরৎচন্দ্র বললেন—প্রকাশ চেঞ্জে গেছে। ও না ফিরলে কি করে যাই, মামা। তা ছাড়া যেদিন যাবার সেদিন একেবারেই যাবো।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন—ওসব কথা বলতে নেই, শরৎ। তোমার অনেক কাজ বাকী আছে। তুমি চেঞ্জেই যাও।

শেষ পর্যন্ত মামার পরামর্শ অনুযায়ী শরৎচন্দ্র চেঞ্জে যাওয়া স্থির করলেন। হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেওঘরের 'মালঞ্চ' বাড়িখানি ছেড়ে দিলেন।

প্রকাশচন্দ্র শীঘ্রই ফিরে এলেন। শরৎচন্দ্র গেলেন দেওঘরে এখানে 'ভারতবর্ষের' জন্য 'দেওঘর স্মৃতি' নামে একটি ভ্রমণ-কাহিনী লিখলেন। স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীর জন্যে শরৎচন্দ্র এখানে কিরূপ ভাবনায় দিন কাটাতেন, সে সম্বন্ধে দেওঘর থেকে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে লেখা একখানি পত্র উদ্ধৃত হলো—

'মালঞ্চ'। দেওঘর
সাঁওতাল পরগণা

কল্যাণীয়েষু,

হোঁদল, আজ দশ দিনের মধ্যে বাড়ীর খবর কেবল একখানা চিঠিতে পেয়েছি। অসুস্থ দেহে সকলের জন্যে বড় চিন্তা হয়। তোমার মামীমা তো চিঠি লিখতে জানেন না, সুতরাং তোমরা অনুগ্রহ করে যদি প্রত্যহ না হোক, ২।১ দিন পরে পরেও এক-আধটা পোস্টকার্ড দাও ত কতকটা নিশ্চিন্ত হই। ইতি—২৬শে ফাল্গুন

বড়মামা

কয়েক মাস পরে তিনি সুস্থ হয়ে আবার ফিরে এলেন সামতাবেড়েতে। ফিরে আসার কয়েকদিনের মধ্যে আবার সেই জ্বর সর্দি কাশি দেখা দিল। ডাক্তার আর দেখালেন না। শরীর ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়লো। এই অসুস্থ শরীর নিয়েই ছেলে-মেয়েদের মাসিকপত্রিকা 'শরতের ফুলে' 'লালু' নামে একটি গল্প লিখলেন। 'শেষের পরিচয়' তাঁর অসমাপ্ত হয়েই রইলো (পরে

অবশ্য রাধারাণী দেবী এ উপন্যাসটির শেষ অংশ লিখেছিলেন, এবং এটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে)।

সুরেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের অসুখের সংবাদ পেয়ে আবার এলেন সামতাবেড়েতে। শরৎচন্দ্র দুঃখ করে বললেন—সুরেন, শরীরে আর কিছুই নেই!

—অমন কথা বোলো না, ভালো ডাক্তার দেখালেই সেরে যাবে।

—তুমি সত্যি বলছো সুরেন?

—হ্যাঁ। যদি কলকাতায় গিয়ে বিধানবাবুকে (ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়) দেখাও তো ভালো হয়।

শরৎচন্দ্র রাজী হলেন কোলকাতায় যাবার জন্য।

পরদিন দেউলটি স্টেশনে যাবার জন্য পাল্‌কি এলো। শরৎচন্দ্র বললেন—সুরেন, মস্তবড় ভুল হয়ে গেছে।

—কি হলো আবার?

—তোমার পাল্‌কির কথা বলিনি।

—না, পাল্‌কি ও সাইকেল-রিক্সা চড়ি না।

শরৎচন্দ্র হেসে বললেন—কোলকাতায় গেলে শরীর সারবে কিনা বলা যায় না। এখানে বেশ আছি। বিধানবাবু তো বলবেন 'ম্যালেরিয়া'।

—বেশ, এখন খেয়ে নাও। পরে যা হবার হবে।

এই সময়ে প্রকাশচন্দ্র ঘরে ঢুকে শরৎচন্দ্রকে বললেন—আজই যাচ্ছো দাদা?

শরৎচন্দ্র বললেন—হ্যাঁরে, খোকা। মামা তাই বলছেন।

তারপর বাড়ির এক চাকর গোপালকে তিনি বললেন—কিরে গোপাল, তুই যাবি?

গোপাল চুপ করে থাকে।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন—ওর বৌ নাকি মারা গেছে শুনলাম। ও তোমার কোলকাতার বাড়ি দেখেনি, নিয়ে চল ওকে।

—যাবি তো গোপাল?— শরৎচন্দ্র বললেন।

—যাব, বাবু।

—তাহলে তোর ভাইকে এখানে দিনকতক কাজ করতে বলিস। ফিরবো সেই পরশু।

শরৎচন্দ্র অন্দর-মহলে গেলেন। আহার করতে বসলে, হিরণ্ময়ী দেবী বললেন—হ্যাঁগা, শীগ্‌গির ফিরবে তো?

—বলতে পারি না, সে ওই সুরেন-মামা বলতে পারেন।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন—সব ট্রিটমেণ্ট করে আসতে দেরি হবে, বড়মা।

আহার শেষ করে শরৎচন্দ্র বাইরে বেরিয়ে এসে দেশবন্ধুর দেওয়া গোবিন্দজীকে প্রণাম করলেন। এমন সময় ছুটে এলো তাঁর বড় আদরের মুকুলমালা ও অমলকুমার। তাদের প্রাণভরে আদর করে শরৎচন্দ্র উঠলেন পাল্‌কিতে।

কোলকাতার বাড়িতে তাঁর এই আগমন-বার্তা আগেই হোঁদলকে জানানো হয়েছিল। গাড়ির ড্রাইভার কালী গাড়ি নিয়ে হাওড়া স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল।

পথে সুরেন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্র বললেন—মামা, কই হোঁদল তো স্টেশনে এলো না?

সুরেন্দ্রনাথ বললেন—ও হয়তো বাড়িতেই আছে।

বাড়িতে এসেও শরৎচন্দ্র হোঁদলকে দেখতে পেলেন না। বালিগঞ্জের এই বাড়িতে তাঁকে রাখা হয়েছে ঘরদোর দেখবার জন্য।

হোঁদল বাড়ি ফিরলে, শরৎচন্দ্র তাঁকে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় ছিলি ?

হোঁদল বললেন—কাকার বাড়ি।

ওদিকে সুরেন্দ্রনাথ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে দেখাবার জন্য ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়ের কাছে ছুটলেন।

সব ব্যবস্থা করে বাড়ি ফিরলে শরৎচন্দ্র বললেন—কোথায় গিয়েছিলে, মামা ?

—কুমুদবাবুর কাছে। বিধানবাবুকে দেখানো তো দরকার।

শরৎচন্দ্র বললেন—উহুঁ, ওঁরা বলবেন ম্যালেরিয়া।— ব'লে ডাক দিলেন—কালী, ও কালী !

কালী এলে, শরৎচন্দ্র বললেন—এখন কুমুদবাবুকে পাওয়া যাবে না ?

—না, এখন উনি কলে বেরিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র কি যেন ভাবলেন। পরে কালীকে বললেন—তুমি গাড়িটা ঠিক করে রেখো, আজ বিকালে বাজার করতে যাবো।

ঠিক বিকালবেলায় ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় এলেন শরৎচন্দ্রের বাসায়। এসে বলে গেলেন—রাত সাড়ে আটটায় বিধানবাবু আসবেন, কোথাও যাবেন না যেন।

—আপনি আসবেন না ?

—নিশ্চয়।— ব'লে চলে গেলেন ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়।

ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় চলে গেলে শরৎচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথের হাত-দুটি ধরে বললেন—তোমার সেবার জোরে যদি আমি সেরে উঠি ! এখানে কেই-বা আছে ? বড়বৌ দেশের বাড়িতে রইলো—ও হয়তো অনেক রাগ করছে।

—বড়মা কিছুই রাগ করবেন না।

শরৎচন্দ্র একটু চুপ করে থেকে বললেন—ডাক্তারবাবুরা সেই সাড়ে আটটায় আসবেন। ঘরে মন আর টিকছে না। চল-না মামা, একটু বাইরে ঘুরে আসি।

—কোথায় যাবে?

—মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে।

—গেলেই তো বাজে-খরচ।

শরৎচন্দ্র শুনলেন না কোনো কথা—কালীকে গাড়ি বের করতে ব'লে ওপর থেকে নীচে নেমে এলেন। প্রথমে হগ-মার্কেটে না গিয়ে, শরৎচন্দ্র সোজা চলে এলেন ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়ের বাড়িতে। কুমুদ-শঙ্কর শরৎচন্দ্রের অপ্রত্যাশিত আগমনে একটু অবাক হয়েই ব'লে উঠলেন—এখানে যে এলেন, শরৎবাবু?

—বাড়িতে মন টিকছে না।

কুমুদবাবু হাসলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—কখন আপনারা যাচ্ছেন?

—সেই সাড়ে আটটায়।

—আমি তার আগেই ফিরবো— ব'লে শরৎচন্দ্র গাড়ি করে সোজা চলে এলেন হগ-মার্কেটে। দামী সিগারেট কিনে, একটা ধরিয়ে ঢুকলেন এস. পি. চ্যাটার্জির ফুলের দোকানে।

ঠিক রাত্রি সাড়ে আটটার সময় বাড়ির বাইরে মোটরের হর্ন বেজে উঠলো। সুরেন্দ্রনাথ ও কালী ডাঃ রায় ও ডাঃ কুমুদশঙ্করকে ওপরের ঘরে নিয়ে এলেন। বিধানবাবু শরৎচন্দ্রকে বললেন—আবার কি বাধিয়ে বসলেন, শরৎবাবু?

—ম্যালেরিয়া, না হয় উদুরি।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পেট টিপে পরীক্ষা করে বললেন—'কিংকিংস্'
(অন্ত্রে ক্যানসার)।

শরৎচন্দ্র ঘাবড়ে গেলেন ; সুরেন্দ্রনাথকে বললেন—তার মানে কি মামা ?

—জানি না। দেখি, অভিধানটা খুলে যদি কিছু বোঝা যায়।

অভিধান খুলে সুরেন্দ্রনাথ বললেন—কিংকিংস্ মানে অন্ত্রের রোগ।

—সুরেন, রক্ষে নেই ! আমায় এবার যমের দোরে যেতে হবে।

এমন সময়ে কবি নরেন্দ্র দেব এলেন। শরৎচন্দ্রের অসুখের কথা শুনে তিনি দেখতে এসেছেন। বললেন—ব্যাপার কি, শরৎদা ?

—জান নরেন, কিংকিংস্ মানে কি ?

—না তো—

—আমার অভিধান আছে—তুমিও একবার খুলে ছাখো তো।

দেখবার পর নরেন্দ্র দেব বললেন—অন্ত্রের ব্যাধি। নাড়ি জট পাকিয়ে গেছে।

—তাহলে তো এক্স-রে করা দরকার।

—শুধু তাই নয়, অপারেশনটাও করতে হয়।— সুরেন্দ্রনাথ বললেন।

—তাহলে বাড়ি ফিরতে হয়।— শরৎচন্দ্র ভয় পেয়ে বললেন।

—এটা কি তোমার বাড়ি নয় ?

শরৎচন্দ্র অন্য কথা আর পাড়লেন না। নরেন্দ্র দেব বললেন—এক্স-রে'টা আগে করুন, পরের কথা পরে হবে।

শরৎচন্দ্র বললেন—তাহলে কাল-ই কুমুদবাবুর বাড়িতে যেতে হয়।

—নিশ্চয়। ইমিডিয়েট্‌লি করা দরকার।— নরেন্দ্র দেব কথাটা ব'লে বিদায় নিলেন।

পরদিন চিত্তরঞ্জন-সেবাসদনে গিয়ে শরৎচন্দ্র এক্স-রে করালেন। তাঁর এই সাংঘাতিক ব্যাধির কথা সামতাবেড়েতে পৌঁছালে, হিরণ্ময়ী দেবী প্রকাশচন্দ্রের সঙ্গে কোলকাতার বাড়িতে চলে এলেন।

যত দিন যায়, শরৎচন্দ্রের মনের আনন্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসে। বন্ধুবান্ধব আসে যায়। আয়ু শেষ হয়ে এসেছে এই কথা চিন্তা করে সুরেন্দ্রনাথকে একদিন ডেকে বললেন—আমার উইল-টা এবার করে দাও। তোমাকে স্টেটের এক্জিকিউটার করে যাবো

—সর্বনাশ! তা যদি কর, এখানে একদণ্ড নয়!

শরৎচন্দ্র মুচকি হেসে বললেন—তাহলে উইল করতে সাহায্য কর। তা করবে তো?

শরৎচন্দ্রের কথামতো সুরেন্দ্রনাথ বিজুবাবুকে (উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) ফোন করে বললেন—শরৎ তোমায় ডাকছে। এক্ষুনি এসো। বিশেষ প্রয়োজন আছে।

উমাপ্রসাদবাবু সঙ্গে সঙ্গেই এলেন। উইল করা হলো।

পরদিন কোলকাতার সমস্ত বড় বড় ডাক্তার শরৎচন্দ্রের বাড়িতে এলেন। সবাই জল্পনা-কল্পনা করছেন—কাকে দিয়ে অপারেশন করানো যায়। শরৎচন্দ্র এমন সময় বায়না ধ'রে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে বললেন—যদি অপারেশন করতে হয় তা আপনি করবেন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় হেসে বললেন—তবে শুয়ে পড়ুন, কাজটা সেরে ফেলি— ব'লে ঘরের কোণের শরৎচন্দ্রের কেনা বিলিতী কুড়ুলখানা তুলে নিয়ে তেমনি হেসেই বললেন—শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন, কাজটা সেরে ফেলি—

ঘরসুদ্ধ ডাক্তাররা হো-হো করে হেসে উঠলেন।

অপারেশন সত্যি-সত্যি কাকে দিয়ে করানো যায় সে-কথাটা ডাক্তারেরা ভাবতে লাগলেন। একজন ডাক্তার বললেন—ললিতবাবুকে দিয়ে করানোই ভালো।

অন্যজন বললেন—ওঁর ভিজিট অসম্ভব।

শরৎচন্দ্র বললেন—কত ?

—হাজার-বারোশো।

—তবে থাক্। অপারেশন করার কোনো প্রয়োজন নেই।

ডাক্তাররা বিদায় নিলেন।

একদিন ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় ডাঃ ম্যাকে-কে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। তিনি বললেন—বাড়িতে এ অবস্থায় ট্রিটমেন্ট চলে না।

—তবে উপায় ?— শরৎচন্দ্র বললেন।

—ভালো নার্সিং-হোমে যাওয়া উচিত।

সব ব্যবস্থাই হলো। শরৎচন্দ্র বাড়ি ছেড়ে ইউরোপীয়ান নার্সিং-হোমে চলে এলেন। বেডের ওপর শুয়ে ঘন ঘন দামী সিগারেট খেতে শুরু করলেন। তা দেখে একজন নার্স ছুটে এসে শরৎচন্দ্রের মুখ থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটি কেড়ে নিয়ে মিহিস্বরে বললেন—দিস্ ইজ নট অ্যালাউড হিয়ার।

বিকালবেলায় নার্সিং-হোমে হিরণ্ময়ী দেবী, প্রকাশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ এলেন। আর এলো শরৎচন্দ্রের স্নেহের অমল ও মুকুলমালা তাদের 'জিয়া'কে দেখতে। শরৎচন্দ্র খুশীমনে একটা বই পড়ছিলেন। এই নার্সিং-হোমের বিষয়ে তিনি সুরেন্দ্রনাথকে বললেন—এখানে পোষাবে না আমার।

—কেন বল তো ?

—এরা নেটিভদের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করে না। মনে করে আমরা জানোয়ার। ভদ্দরলোক হচ্ছে কেবল এখানে ওই ম্যাকে-সাহেব। আর সব অভদ্র, পাজি!

সেদিন রাত্রেই সুরেন্দ্রনাথের পরিচিত এক বাঙালী নার্সিং-হোমে শরৎচন্দ্র চলে এলেন। ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়ও দেখতে এলেন। এখানকার পরিবেশ শরৎচন্দ্রকে বেশ খুশী করেছে। কুমুদবাবু বললেন—এখানে সব ট্রিটমেন্ট-ই হবে। ভয় নেই আপনার।

শরৎচন্দ্র বললেন—মরণ-বাঁচনের ভার আপনার ওপর।

কুমুদবাবু হাসতে-হাসতে বিদায় নিলেন।

কিন্তু বাঙালী নার্সিং-হোমে সাহেবী কায়দা-কানুন দেখে শরৎচন্দ্র তৃপ্তি পেলেন না। সুরেন্দ্রনাথ একদিন সকালে দেখা করতে এলে শরৎচন্দ্র বললেন—ওখান থেকে পালিয়ে এলাম, এখানেও সেই সাহেবী কায়দা! এদের দু-দুটো নার্স ইংরেজীতে কথা বলে, ওদের সঙ্গে কথা বলতে আমার ভারী কষ্ট হয়। তুমি একটা বাঙালী নার্স ছাখো—যা লাগে আমি দেব।

শেষ পর্যন্ত বাঙালী নার্স-ই ঠিক করা হলো।

কত লোক যে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে তার ঠিক নেই। তাদের সঙ্গে অনবরত কথা কইতে তাঁর বড় কষ্ট হতো। একদিন এইসব দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হলো নার্সিং-হোমের আদেশ-মতো।

একদিন দেখতে এলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। শরৎচন্দ্রকে পরীক্ষা করে বিধানবাবু আড়ালে সুরেন্দ্রনাথ ও প্রকাশচন্দ্রকে ডেকে বললেন—শরৎবাবুর অপারেশন না করলে, পরশু মারা যাবেন। আপনাদের মত কি?

প্রকাশচন্দ্র শুনেই কেঁদে ফেললেন।

ডাঃ বিধান রায় বললেন—এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই, প্রকাশবাবু। ভালোয়-ভালোয় অপারেশন হ'লে, এতে শরৎবাবুর পক্ষে মঙ্গল।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন—অপারেশন করতে হবে, কিন্তু টাকা আমাদের হাতে নেই। শুনেছি, ললিতবাবু বারো-তেরোশো টাকা চান।

বিধানবাবু বললেন—সে ব্যবস্থা আমি করবো চারশো টাকা দিয়ে— ব'লে তিনি চলে গেলেন।

কিন্তু টাকার চিন্তায় দিশাহারা হয়ে সুরেন্দ্রনাথ ছুটলেন নানা স্থানে। কোথাও টাকা পেলেন না তিনি। অবশেষে 'বাতায়ন' পত্রিকার সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের শরণাপন্ন হতে হলো। তিনি বললেন—আমি চেষ্টা করবো। শরৎবাবুর বইগুলির সিনেমা-রাইট বিক্রি করলে হাজার ছয়েক টাকা হতে পারে।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন—এতে শরৎ ক্ষুণ্ণ হবে। সে-কথা কেমন করে তাকে বলবো?

এর পর সুরেন্দ্রনাথ হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ছুটে গেলেন। হরিদাসবাবু সব কথা শুনে বললেন—বেশ, আমি হাজার-টাকা ধার দিতে পারি প্রকাশচন্দ্রের সই নিয়ে।

সুরেন্দ্রনাথ সেদিনই প্রকাশচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে হরিদাসবাবুর কাছে এসে টাকা নিলেন। তারপর তাঁরা দুজনে ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়ের বাড়িতে হাজির হলেন। কুমুদবাবু অপারেশন করবার প্রায় হাজার-টাকার ফর্দ দিলেন। বললেন—চিত্তরঞ্জন-সেবাসদন থেকেই ইন্স্ট্রুমেণ্ট যাবে।

ভাইয়ের জন্য প্রকাশচন্দ্র রক্ত দিলেন।

কয়েকদিন পরে অপারেশন হলো 'পার্ক নার্সিং-হোমে'। অপারেশন করলেন ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখা গেল

সমস্ত যন্ত্রটা পচে গেছে। সাময়িকভাবে তরল খাদ্য দেবার জন্য একটা রবারের নল লাগিয়ে দেওয়া হলো। টাকা খরচ হলো পাঁচশো। ললিতবাবু সুরেন্দ্রনাথকে বললেন—বৃথা নার্সিং-হোমে রেখে কাজ কি? বাড়ি নিয়ে যান।

—এই অবস্থায়?

—অ্যাম্বুলেন্স ক'রে নিয়ে যাবেন—ভয়ের কারণ নেই।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় সুরেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে বললেন—কাল সকালে তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাবো।

শরৎচন্দ্র মৃদু হাসলেন।

—একটা কথা মনে রেখো, মুখ দিয়ে কিছু খেয়োনা যেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—বুঝিয়ে দাও, কেন খাব না।

—মুখ দিয়ে খেলে বমি হয়। পেটের সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে যাবে।

—তবে তুমি আমায় খাইয়ে দিয়ে যাও।

টিউবে ক'রে আঙুরের রস খাইয়ে দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ বললেন—আবার ন'টা-দশটার সময় আসবো।

—কেন কষ্ট করবে?

—বাঃ, ললিতবাবু সকালে তোমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে ব'লে গেছেন না? এখানে থেকে মিছে খরচপত্র হয়ে যাচ্ছে। একটু সারলে, কুমুদবাবু তোমাকে ইউরোপে নিয়ে যাবেন।

সুরেন্দ্রনাথ বাড়ি ফিরে এলেন।

শরৎচন্দ্রের অসুস্থতার সংবাদ শুনে রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখলেন—"সমগ্র বঙ্গদেশ তোমার নিরাময় সংবাদ শুনিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে।"

পার্ক নার্সিং হোম

১লা মাঘ, শনিবারের রাত। সমস্ত বাড়িটা নিঝুম। সারাদিন পরিশ্রম ক'রে সুরেন্দ্রনাথ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো। রাত ছুটো তখন। সুরেন্দ্রনাথ ফোন ধরলেন—কে ?

—রয়টার। ডাঃ চ্যাটার্জি কেমন আছেন ?

—ভালোই।

হিরণ্ময়ী দেবী দৌড়ে এলেন ; বললেন—কি মামা ?

—ও কিছু নয়। কাগজওয়ালারা জানতে চাইছে।

নার্সিং-হোমে ফোন করলেন সুরেন্দ্রনাথ।

ফোনে জবাব এলো ডাঃ চ্যাটার্জি বমি করছেন।

প্রকাশচন্দ্র ছুটে এলেন। —কি হয়েছে মামা, বলুন না ?

—শরৎ বমি করছে।

সুরেন্দ্রনাথ প্রকাশচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে নার্সিং-হোমে ছুটে গেলেন ; দেখলেন—শরৎচন্দ্র বমি করছেন।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন—একি শরৎ !

—থাকতে পারলাম না সুরেন, মুখ দিয়ে আফিম-গোলা জল খেয়ে ফেলেছি।

ডাঃ সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন। ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় ও ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও এলেন।

২রা মাঘ, রবিবার, ১৯৩৮ সালের পৌষ-পূর্ণিমার সকালে (দশ ঘটিকায়) ঘরছাড়া, ছন্নছাড়া, যাযাবর শিল্পী তাঁর ইহজন্মের পরিক্রমা শেষ করে মুক্তিতীর্থের পথে প্রয়াণ করলেন।

*
* *
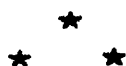
শরৎচন্দ্রের মহাপ্রয়াণে রবীন্দ্রনাথের বাণী

"যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে
দেশের মাটি থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনী-লেখক শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত বেঙ্গল-কেমিক্যালের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আচার্যের কাগজপত্রের মধ্যে তাঁর একপৃষ্ঠা দিনলিপি উদ্ধার করেন। তাতে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে আচার্যের মন্তব্যটি প্রকাশ পেয়েছে :

"ধন্য শরৎচন্দ্র! তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? কোথা হইতে অবতীর্ণ হইলে? বাস্তবিক তোমার মতো একজন লেখকের বড়ই প্রয়োজন ছিল। সামাজিক ব্যাধি ও দুর্নীতি প্রভৃতি অঙ্কিত করিবার জন্য তুমি যে তুলি ধরিয়াছ তাহা অতুলনীয়। তুমি কখনও ধর্মমতের ইতর ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ কর না। অথচ কুপ্রথার উপর কুঠারাঘাত করিতে কুণ্ঠিত নও। তোমার লেখা মর্মস্পর্শী; অন্তস্থল পর্যন্ত প্রবেশ ক'রে character [চরিত্র]-গুলির সঙ্গে এক হইয়া যাই। তোমার আর এক বিশেষত্ব এই যে তাদের সুখ-দুঃখ পাঠকেরই। অনায়াসলব্ধ (facile pen), কোন কষ্টকল্পনা নাই।—character drawn from everyday life [দৈনন্দিন জীবন হইতে চরিত্রগুলি আহৃত]। কিন্তু ভয়ে তোমার বই কাছে রাখি না—পাছে নেশা সম্বরণ করিতে না পারি।"

গভর্নমেন্ট 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত করলে, শরৎচন্দ্র এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার জন্ত রবীন্দ্রনাথকে যে পত্রখানি লিখেছিলেন, সেটা কোনো কারণে পাঠানো হয়নি। শরৎচন্দ্রের এই পত্রটি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে আজও রক্ষিত আছে।

চিঠিখানি প্রকাশিত হলো :

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোস্ট
জেলা হাবড়া

আপনার পত্র পেলাম। বেশ, তাই হোক। বইখানা আমার নিজের বলে একটুখানি দুঃখ হবারই কথা, কিন্তু সে কিছুই নয়। আপনি যা কর্ত্তব্য এবং উচিত বিবেচনা করেছেন তার বিরুদ্ধে আমার অভিমান নেই অভিযোগও নেই। কিন্তু আপনার চিঠির মধ্যে অন্যান্য কথা যা' আছে সে সম্বন্ধে আমার দুই একটা প্রশ্নও আছে, বক্তব্যও আছে। কৈফিয়তের মত যদি শোনায় সে শুধু আপনাকেই দিতে পারি।

আপনি লিখেছেন ইংরাজরাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। ওঠবারই কথা। কিন্তু এ যদি আমি অসত্য প্রচারের মধ্যে দিয়ে করবার চেষ্টা ক'রতাম লেখক হিসাবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুইই ছিল। কিন্তু জ্ঞানতঃ তা আমি করিনি। করলে Politician-দের Propaganda হ'ত, কিন্তু বই হ'ত না। নানা কারণে বাঙলা ভাষায় এ ধরনের বই কেউ লেখে না। আমি যখন লিখি এবং ছাপাই তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। সামান্য সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্ব্বত্রই যখন বিনা বিচারে অবিচারে অথবা বিচারের ভান ক'রে কয়েদ নির্ব্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে তখন আমিই যে অব্যাহতি পাবো, অর্থাৎ, রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা করে

চলবেন এ দুরাশা আমার ছিল না। আজও নেই। তাঁদের হাতে সময়ের টানাটানি নেই, সুতরাং, দু'দিন আগেপাছের জন্ত কিছুই যায় আসেনা। এ আমি জানি, এবং জানার হেতুও আছে। কিন্তু এ যাক্। এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বাঙলাদেশের গ্রন্থকার হিসাবে গ্রন্থের মধ্যে যদি মিথ্যার আশ্রয় না দিয়ে থাকি, এবং তৎসত্ত্বেও যদি রাজরোষে শাস্তি ভোগ করতে হয় ত করতেই হবে—তা' মুখ বুজেই করি বা অশ্রুপাত করেই করি, কিন্তু প্রতিবাদ করা কি প্রয়োজন নয়? প্রতিবাদেরও দণ্ড আছে, এবং মনে করি তারও পুনরায় প্রতিবাদ হওয়া আবশুক। নইলে, গায়ের জোরকেই প্রকারান্তরে ন্যায্য বলে স্বীকার করা হয়। এইজন্তেই প্রতিবাদ চেয়েছিলাম। শাস্তির কথাও ভাবিনি এবং প্রতিবাদের জোরেই যে এ বই আবার ছাপা হবে এ সম্ভাবনার কল্পনাও করিনি।

চুরি-ডাকাতির অপরাধে যদি জেল হয় তার জন্তে হাইকোর্টে আপিল করা চলে, কিন্তু আবেদন যদি অগ্রাহ্যই হয়, তখন দু'বছর না হয়ে তিন বছর হ'ল কেন এ নিয়ে বিলাপ করা সাজে না। রাজবন্দীরা জেলের মধ্যে দুধ ছানা মাখম পায়না ব'লে কিম্বা মুসলমান কয়েদীরা মোহরমের তাজিয়ার পয়সা পাচ্চে, আমরা দুর্গোৎসবের খরচ পাইনা কেন এই বলে চিঠি লিখে কাগজে কাগজে রোদন করায় আমি লজ্জা বোধ করি, কিন্তু মোটা ভাতের বদলে যদি jail authorityরা ঘাসের ব্যবস্থা করে, তখন হয়ত তাদের লাঠির চোটে তা চিবোতে পারি, কিন্তু ঘাসের ড্যালা কণ্ঠরোধ না করা পর্য্যন্ত অন্যায় বলে প্রতিবাদ করাও আমি কর্ত্তব্য মনে করি।

কিন্তু বইখানা আমার একার লেখা, সুতরাং দায়িত্বও একার। যা' বলা উচিত মনে করি, তা বলতে পেরেছি কিনা এইটেই আসল কথা। নইলে ইংরাজ সরকারের ক্ষমাশীলতার প্রতি আমার কোন নির্ভরতা ছিল না। আমার সমস্ত সাহিত্য-সেবাটাই এই ধরণের। যা উচিত মনে করেছি তাই লিখে গেছি।

আপনি লিখেছেন আমাদের দেশের রাজারা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের

অন্যান্য রাজশক্তির কারও ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের মত সহিষ্ণুতা নেই। এ কথা অস্বীকার করবার অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু এ আমার প্রশ্নই নয়। আমার প্রশ্ন ইংরাজ রাজশক্তির এই বই বাজেয়াপ্ত করবার justification যদি থাকে, পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে protest করার justification'ও তেমনি আছে।

আমার প্রতি আপনি এই অবিচার করেছেন যে, আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি এবং সেই ফাঁকে গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাস্তবিক তা' নয়। দেশের লোক যদি প্রতিবাদ না করে, আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সে হৈ-চৈ করে নয়, আর একখানা বই লিখে।

আপনি নিজে বহুদিন যাবৎ দেশের কাজে লিপ্ত আছেন, দেশের বাহিরের অভিজ্ঞতাও আপনার অত্যন্ত বেশী, আপনি যদি শুধু আমাকে এইটুকু আদেশ দিতেন যে এ বই প্রচারে দেশের সত্যকার মঙ্গল নেই, সেই আমার সান্ত্বনা হোত। মানুষের ভুল হয়, আমারও ভুল হয়েছে মনে করতাম।

আমি কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব নিয়ে এ চিঠি আপনাকে লিখিনি, যা মনে এসেছে তাই অকপটে আপনাকে জানালাম। মনের মধ্যে যদি কোন ময়লা আমার থাকতো আমি চুপ করেই যেতাম। আমি সত্যকার রাস্তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাই সমস্ত ছেড়েছুড়ে নির্ব্বাসনে বসে আছি। অর্থে সামর্থ্যে সময় যে কত গেছে সে কাউকে জানাবার নয়। দিনও ফুরিয়ে এলো, এখন সত্যিকার কিছু একটা করবার ভারি ইচ্ছে হয়।

উত্তেজনা অথবা অজ্ঞতা বশতঃ এ পত্রের ভাষা যদি কোথাও রূঢ় হয়ে থাকে আমাকে মার্জ্জনা করবেন। আপনার অনেক ভক্তের মাঝে আমিও একজন, সুতরাং কথায় বা আচরণে আপনাকে লেশমাত্র ব্যথা দেবার কথা আমি ভাবতেও পারিনে। ইতি—২রা ফাল্গুন, ১৩৩৩

সেবক

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তথ্য-পঞ্জী

ছেলেবেলার গল্প—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—সংখ্যা ৫২
শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী
শরৎ-পরিচয়
শরৎচন্দ্রের রচনাবলী
} ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র—গিরীন্দ্রনাথ সরকার

ব্রহ্ম-প্রবাসে শরৎচন্দ্র—যোগেন্দ্রনাথ সরকার

শরৎ-প্রতিভা—সতীশচন্দ্র দাস

শরৎ পরিচয়—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

স্মৃতিকথা—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

যাঁদের দেখেছি (প্রথম পর্ব)—হেমেন্দ্রকুমার রায়

বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন-প্রশ্ন—শৈলেশ বিশী

শরৎচন্দ্র—নরেন্দ্র দেব

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন—শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়

দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র—দ্বিজেন্দ্রলাল দত্ত মুন্সী (ভারতবর্ষ, ১৩৪৪)

শরৎ-স্মৃতি সংখ্যা (ভারতবর্ষ, ১৩৪৪)

শরৎ-স্মৃতি সংখ্যা (বাতায়ন, ১৩৪৪)

'জন্মদিনের উপহার'—পুস্তিকা (১৩৩৪, ৩১শে ভাদ্র)

শরৎচন্দ্র—গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (কল্লোল, ১৩৩৩)

শরৎ-স্মৃতি সংখ্যা (মাসিক বসুমতী, ১৩৪৪)

স্মৃতিকণা (শরৎচন্দ্র)—যোগেশচন্দ্র মজুমদার (যুগযাত্রী, ১৩৬৪)

শরৎ-জীবনের টুকিটাকি—অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় (মাসিক বসুমতী, ১৩৬০)

হিরণ্ময়ী দেবী (শরৎচন্দ্রের সহধর্মিণী)—মণীন্দ্রনাথ রায় (মাসিক বসুমতী, ১৩৬১)

শরৎচন্দ্র—সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (মাসিক বসুমতী, ১৩৬১)

শরৎচন্দ্র—সুবোধ রায় ('শিল্পী-সংস্থা'র উদ্যোগে—শরৎ-সাহিত্য সম্মেলন পুস্তিকা, ১৩৬৪)

প্রথম শরৎ-সম্বর্ধনা—রামপদ মুখোপাধ্যায় (ঐ)